



# বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ



মনকালীন

কালের ঘূর্ণিবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে।  
পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের  
পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস  
করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে  
গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছৌয়া  
লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদশত বছর ধরে  
চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ  
ধারায় রয়েছে বিরাজমান মানবজাতির জন্য  
নির্দেশিকা হিসেবে নায়িল হওয়া ইসলামের  
বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী  
জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই  
বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পোঁছে দেওয়ার  
লক্ষ্য ‘সমকালীন প্রকাশন’-এর পথচলা।

# বেলা ফুরাবার আগে

অরিফ আজাদ

বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০২০

প্রথমস্থ

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ

নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে

প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

একমাত্র পরিবেশক

চৰ্চা প্রকাশ

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ | ফোন : ০১৬১১৮৬৪৬৮৮

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 287.00 (Paperback), Tk. 330.00 (Hardcover), US \$ 15.00 only.

ISBN: 978-984-94844-0-0

 সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০ | ফোন : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ  
সবকিছু কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

এবার ভিন্ন কিছু হোক  
উদ্ভ্রান্ত উদাসীন সময়ের পাটাতন থেকে  
নোঙ্গর করা যাক নতুন এক সময়ের বুকে  
মরীচিকাময় সৃষ্টির নাগপাশ ছেড়ে  
ফিরে আসা যাক জীবনের নতুন অনুচ্ছেদে  
হতাশা হতোদ্যম আর হঠকারিতার বলয় ভেঙে  
এবার গায়ে লাগুক মুস্তির শীতল পরশ।

এবার ঘূম ভাঙুক  
চোখ মেলে দেখা হোক বাইরে অপেক্ষমাণ  
নতুন দিনের পৃথিবী।  
নতুন ভোরের সোনারঙ্গ রোদে  
বেড়ে ফেলা যাক একজীবনের সমস্ত ক্লান্তি।

একটা জীবন অবলীলায় অবহেলায় কেটে যাবে  
ভুল আর ভ্রান্তির বেড়াজালে  
একটা জীবন আমগ ডুবে রবে  
এমনটা হতে দেওয়া যায় না।  
জীবনের গতিপথ ভুলে  
একটা জীবন ভীষণ বেপরোয়া হয়ে  
ভুল স্নোতে ভুল পথে বাঁক নেবে  
এমনটা হতে দেওয়া যায় না।

এবার ভিন্ন কিছু হোক  
জাগরণের এই জাগ্রত জোয়ারে  
এবার নতুন করে লেখা হোক জীবনের জ্যামিতি  
বেলা ফুরাবার আগে  
আজ তবে ফেরা হোক নীড়ে...



## প্রকাশকের কথা

অস্মীকার করার জো নেই, বর্তমানে আমাদের চারপাশে নতুন একটি জাগরণ শুরু হয়েছে—তরুণদের বিশাল একটি অংশ এখন দ্বীন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে চায়। প্রাত্যহিক জীবনে তারা হয়ে উঠতে চায় আদর্শ মুসলিম। জাগরণের এই জোয়ারকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে না পারলে তা ভিন্নদিকে, ভিন্নখাতে মোড় নেবে নিঃসন্দেহে। সময়ের সূচনাটা সুখকর হলেও এখনকার তরুণদের নিত্যদিন, এমনকি প্রতিটি মুহূর্তে মুখোমুখি হতে হয় পাহাড়সম এক জাহেলি জঙ্গালের। চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকা পদস্থলনের সকল পদধ্বনি যেন আমাদের কানের কাছে অবিরাম বেজে চলে। দ্বীন মেনে চলতে চাইলেও, আধুনিক জাহিলিয়াতের এই অদৃশ্য, অস্পৃশ্য শৃঙ্খলে আজ যেন আমরা বন্দি। চারপাশে কেবল মিথ্যা আর মোহের ছড়াছড়ি। জঙ্গালে ভরা এই বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আঘাত ও আঘাতের উন্নয়নের সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠে না। ফলে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ভেসে যেতে হয় স্নোতের সাথে, ধূংসের পথে।

আঘোন্নয়নের যাত্রায় যে সকল বাধা-বিপত্তি আছে, তা নিয়ে যুগ যুগ ধরে কাজ করেছেন মহামনীবীগণ। শৃঙ্খল ভেঙে কীভাবে নিজেদের মুক্ত করতে পারব, তার যুগপৎ নির্দেশনা আমরা পেয়ে এসেছি কুরআন, হাদিস ও সালাফে-সালিহিনের বইগুলোতে। এসব নিয়ে যেমন পূর্বে কাজ হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, ইন শা আল্লাহ। এখনকার তরুণদের পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার এই যে ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে আরিফ আজাদের বেলা ফুরাবার আগে বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে আমাদের বিশ্বাস। লেখক আরিফ আজাদ এখানে তার জীবন থেকে,

অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকে তুলে এনেছেন কিন্তু সমস্যা ও সমাধানের কথা। সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন যুগের মহামারি সমস্যাগুলোকেই আর সমাধানের সবটুকু জুড়ে রেখেছেন কুরআন, হাদিস ও সালাফে-সালিহিনদের জীবনকে।

তরুণদের দ্বারা দেখার পথে হারাম রিলেশানশিপ একটা বড় ধরনের বাধা। ফজরের সালাতে জাগতে না পারা, বিপদে ধৈর্য হারিয়ে অস্থির হয়ে ওঠা, জাহাজেতে সালাত আদায়ে অনীহা, চোখের ঘিন, তথাকথিত সুরের পেছনে জীবন পর করে দেওয়া-সহ নানান সমস্যা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন এই বইতে। মোটাদাগে, এগুলোই আমাদের বিচুরির কারণ। তিনি সমস্যাকে তুলে ধরে, সেগুলোর সমাধান ধরে এগিয়েছেন। বইটিতে তিনি যে কেবল সমস্যা ধরে ধরে কথা বলেছেন তা নয়, তিনি কথা বলেছেন সম্ভাবনা নিয়েও আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অনিত্য সম্ভাবনাকে তিনি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সর্বাঙ্গিকভাবে।

বইটি মোটাদাগে গদ্দের একটি বই, তবে খটমটে থারার গদ্দা নয়। বর্ণনার শুরুতে তিনি কথনো হয়তো কেনো ঘটনা টেনেছেন কিংবা কেনো গঁরুর অবতারণা করতে করতে তুকে পড়েছেন মূল বিষয়ো। ফলে, পাঠক এই গদ্দের সাথে সাথে একটা গঁরুরও আছেজ পাবেন, আশা করি। লেখার মাঝে পাঠকদের মজিয়ে রাখার ব্যাপারে সেখক আরিফ আজন্দের যে মুনশিয়ানা, তার নতুন আরেক মাঝা আমরা সেখতে পাই এ বইটি।

লেখক বলেছেন, মোটাদাগে তরুণদের সামনে রেখে বইটি সেখা হলেও, বইটি মূলত আমাদের সকলের জন্যই। আমাদের বিস্মিত আশা, তুলের শনুতে তুলে থাকা অন্তর আর হৃদয়প্রদীপকে একটু জালিয়ে দিতেই তার এই প্রচেষ্টা। আমরা, সমকালীন পরিবার, লেখকের এই মহাত্মী চিন্তা, মহৎ উদ্দোগের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত। লেখকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং যদের জন্য সেখক তার চিন্তাগুলোকে মল্লাবিদ্ধ করেছেন, তাদের সকলের জন্যও শুভকামনা। আজাই তার চিন্তাগুলোকে মল্লাবিদ্ধ করেছেন, তাদের সকলের জন্যও শুভকামনা। আজাই সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা বেন আমাদের তুলগুলো মাফ করে, আমাদের ভালো কাজগুলোকে আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

প্রকাশক  
সমকালীন প্রকাশন



### লেখকের কথা

‘সাজিদ সিনিজ’ লেখার পর থেকে, প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন মানুষ আমাকে ইনবক্সে, ইমেইলে বিভিন্ন বার্তা পাঠান। সেই বার্তাগুলো ভরতি থাকে ভালোবাসা, দুআ আর আশাবাদে। আমি গৌর হই, আঙ্গুত হই, আনন্দিত হই। মানুষের ভালোবাসার যে এক অঙ্গ শক্তি আছে, তা আমি এই কয়েক বছরে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি, আল-হামদু লিল্লাহ। জীবনের একটা ইচ্ছা ছিল সাংবাদিক বানাননি, লেখক বানিয়েছেন। মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার, মানুষের কামে সৌহাগনোর যে পথ তিনি আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তার শুরুরিয়া একজীবনে শেব করা যাবে না।

তরুণরা সৃপ নিয়ে আমাকে পলেন, ‘ভাইয়া, আমি সাজিদ হতে চাই। কীভাবে সাজিদ হওয়া যাবে আমাকে পরামর্শ দিন।’ এমন প্রশ্ন আর আবদারের কাছে আমি মাঝে মাঝে পরামৃশ হই। তবিঃ, কী পরামর্শই দেবো? সাজিদ হওয়ার জন্য তাকে বলব অনেক অনেক বই পড়তে? অনেক বেশি জানতে? কিন্তু, পরম্পরণে ভাবি, সাজিদ কি সত্যি এ রকম? আমি কি সাজিদকে এভাবে চেয়েছি কথনো? আমার মানসপটে সাজিদের যে বৃপ্তরেখা, সে সাজিদ আসলে কেমন?

পরে ভবলায়, তারা যেহেতু সাজিদ হতে চায়, সাজিদ তৈরি করার একটা প্রকল্প হাতে নিতে অসুবিধে নেই কিন্তু। সাজিদের বিতর্ক আর বক্তব্যের দুনিয়ার সাথে তারা পরিচিত, কিন্তু সাজিদের একান্ত বাস্তিগত জীবন, যে জীবনে সাজিদ ভীষণ অন্য রকম, প্রস্তাবনা, সেই সৃপ ও সাহসের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে এ বইটিকে।

বইটিকে সজিদ তৈরির প্রথম খসড়া বললেও, মূলত বইয়ের কথাগুলো হয়েছি, হতে পারে সেগুলো দৃশ্য-অদৃশ্য, নিজের সাথে নিজের, কিংবা নিজের সাথে অন্য দ্বার নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কথা বলেছি অমিত সন্ধিমান ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা, অতি সামান্য পাঠাশোন এবং অতি অপরিপক্ষ আমরা মানুষ এবং মানুষমাত্রেই ভুল করতে সিদ্ধহস্ত, তাই এ বইতে ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভুলগুলার সমস্ত দায়ভার আমার। আর এ বইতে যা কিছু ভালো এবং কল্যাণকর, তার প্রশংসা একমাত্র আলাহ সুবহানাল্লু ওয়া তাআলার।

পাঠকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, এই বইটি যদি আপনার সামান্য উপকারে আসে, যদি এই বই আপনাকে সামান্য পরিমাণে ভাবনার খোরাকি দেয়, তাহলে দয়া করে বইটিকে আপনার নিকট রেখে দেবেন না। আপনার প্রিয় মানুষটি, যার মধ্যেও আপনি চান যে, এই ভাবনার উদয় হোক, তার বরাবর বইটি হস্তান্তর করে দেবেন। আর অবশ্যই, আপনার সালাতে, মুনাজাতে এই অধম বাদ্দাকে ঘরের রাখবেন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিলাহ।

আরিফ আজাদ

arifazad.bd@outlook.com



## সূচিপত্র

শুরুর আগে	১৩
মন খারাপের দিনে	১৯
আমার এত দৃঢ় কেন?	৩০
বলো, শুধ কোথা পাই	৪১
জীবনের ইন্দুর-মৌড় কাহিনি	৫০
চোখের রোগ	৫৮
আমরা তো স্বেক বন্ধু কেবল	৬৪
চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়	৭৯
বেলা ফুরাবার আগে	৮৫
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে	৯৬
বসন্ত এসে গেছে	১০৮
সালাতে আমার মন বসে না	১১৫
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব...	১২৬
যুধ মানে শত্রু-শত্রু খেলা	১৩১
মেঘের ওপার বাড়ি	১৪১

আমি হব সকাল বেলার পাখি

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

চলো বদলাই

১৫০

১৬০

১৭৮



শুরুর আগে

### শুরুর আগে

প্রিয় নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সাহাবিদের চোখের মণি। তাকে এক মুহূর্তের জন্ম দৃষ্টির অঙ্গরাল করা সাহাবিদের জন্য ছিল সীতিমতো বিচ্ছেদের ব্যাপর। নবিজির উপরিষিতি তাদের হৃদয়কে প্রয়োগ করে তুলত। তাদের ধ্যানধারণা, তাদের যাপিত ঝীবনের সকল অনুষঙ্গ আবর্তিত হতো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বিগুণ। ধূ-ধূ ময়ূরভূষিতে পথহারা পথিকের বুক মেমন এক ফৌটা পানির জন্য ছটফট করতে থাকে, সাহাবিদের কাছে নবিজির সঙ্গ ছিল টিক সে রকম। দূর্বল, অমৃত সমান পানির মতন। নবিজিকে তারা চোখে হারাতেন। তিনি ছিলেন তাদের কাছে প্রাপ্তের অধিক প্রিয়। যে মানুষটিকে এক পলক না দেখলে সাহাবিদা অস্থির হয়ে উঠতেন, বাকুল হয়ে পড়তেন, যার মুহূর্তকাল অনুপস্থিতি সকলকে নিশেহণ্যা করে তুলত, একমিন সেই মানুষটিই যখন দুনিয়ার পঠ চুকিয়ে বিদেয় নিলেন, দুনিয়ার ঝীবন ছেড়ে পাড়ি জমালেন অনন্ত অসীম ঝীবনের পথে, সাহাবিদের মনের অবস্থা তখন কেমন হয়েছিল? ‘প্রিয়তম মানুষটির সাথে দুনিয়ায় আর দেখা হবে না, একসাথে বসে গল্প করা হবে না, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢেলে ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ’ বলে সম্মেধন করা যাবে না, তার ভাকে ‘লাক্বাইক’ বলে হাজির হওয়া হবে না’—এমন দৃশ্যাগুলো কলনা করা কি সাহাবিদের জন্ম খুব সহজ ছিল? ছিল না। নবিজিকে হারিয়ে সাহাবিদের হৃদয়ে যে বিচ্ছেদের বাড় উঠেছিল, সেই বাড়ের খানিকটা আমরা বুঝতে পারি উমার রামিয়াপ্পার আনন্দুর ঐতিহাসিক সেই ঘটনা থেকে।

নবিজি সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালামের মৃত্যুর দিন উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ একেবাবে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। ‘নবিজির মৃত্যু হতে পারে’—এই ব্যাপারটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তিনি হাতে তাবলেন, আলাহ কর্তৃক প্রেরিত একজন রাসূল, যাকে আলাহ সুবহান্নাহু ওয়া তাআলা বাছাই করেছেন গোটা মানবজাতির জন্যে, যার ওপর নামিল হয়েছে অসমানি প্রথম আল-কুরআন, মহান আলাহ সুবহান্নাহু ওয়া তাআলা যার সাথে সাত অসমানের ওপরে সাক্ষাৎ করেছেন, তার কীভাবে মৃত্যু হতে পারে? উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ তখন অধিক শোকে পাথর। ‘মুহাম্মদ সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালাম ও একজন মানুষ। মানুষ হিসেবে তার মৃত্যু হওয়াটাই স্মার্তবিক। আলাহ সুবহান্নাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টি কোনো বস্তুকেই অমরত দান করেননি’—এই ধূর সত্য থেকে তার মন তখন খনিক সময়ের জন্য বিস্তৃত হলো। নবিজির প্রয়াণ দিবসে এই কথাগলো বোঝার মতন অবস্থা উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের ছিল না। শোকে মুহাম্মদ অবস্থায় তিনি গর্জে উঠেন। বললেন, ‘যে বলবে মুহাম্মদ সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালামের মৃত্যু হয়েছে, তাকেই আমি হত্যা করব।’<sup>[১]</sup>

ডিড ঠেলে এগিয়ে এলেন আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ। তিনি নবিজি সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালামের মুখমঙ্গল থেকে চাদরটা সরিয়ে, তার শুভোজ্জ্বল চেহারায় দুটো চমু খেলেন। এরপর উপস্থিতি জনতার ঢলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘অবশ্যই মুহাম্মদ সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালাম মৃত্যুবরণ করেছেন।’<sup>[২]</sup> আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের এমন সাদাসিধে সরল বক্তব্যে উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের মনের যাতন্ত্র যেন আরও বিশুণ্ব বেড়ে গেল। নবিজির প্রয়াণে যে শোকের সাগর জন্ম নিয়েছে হৃদয়ে, সেই সাগর যেন আরও অশান্ত, আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ বলে উঠলেন, ‘না। কখনোই না। মুরাফিকরা চিরতরে নিশ্চেষে না হওয়া পর্যন্ত মুহাম্মদ সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালামের মৃত্যু হতে পারে না।’<sup>[৩]</sup>

উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দকে এমন বিশৃঙ্খল হতে দেখে আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ বললেন, ‘যারা মুহাম্মদ সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালামের ইবাদত করত, তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মদ সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালাম মারা গেছেন। আর যারা আলাহ

সুবহান্নাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করে, তারা জেনে রাখুক যে, আলাহ চিরঞ্জীব, চিরস্তন।’<sup>[৪]</sup> এরপর তিনি সুরা আলে ইমরানের সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّشْلَ أَئِنَّ مَاتَ أَوْ فَلَلْ انفَلَتْهُ عَلَى أَغْنَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَفْبِيْهِ فَلَنْ يَضْرُبَ اللَّهُ بِهِنَا وَمَنْ يَخْرُجِيَ اللَّهُ أَشْكِرِينَ

আর মুহাম্মদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছেন। যদি মুহাম্মদ মারা যান কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে কি তোমরা আলাহর রাস্তা থেকে পলায়ন করবে? (জেনে রাখো) যে বাস্তি আলাহর রাস্তা থেকে পলায়ন করে, সে আলাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আলাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞের প্রতিদান প্রদান করবেন।<sup>[৫]</sup>

আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের মুখে এই আয়াত শুনে মুহাত্তেই স্তম্ভিত হয়ে যান উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ। তিনি বললেন, ‘মনে হলো এই আয়াত আজই প্রথম শুনলাম।’<sup>[৬]</sup>

উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের মতন একজন বিশিষ্ট সাহাবিণ অঞ্জ কিছু সময়ের জন্য বিশৃঙ্খল হয়েছিলেন সেদিন। শোকের অভিশয়ে তিনি ভুলতে বসেছিলেন, মুহাম্মদ সাজান্নাহু আলাইহি ওয়া সালাম ও মৃত্যুবরণ করতে পারেন। একজন নবি, প্রেরিত রাসূল; অসমানি কিতাবের ধারক-বাহক। জগতে পদচিহ্ন রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এমন মানুষেরও মৃত্যু হতে পারে?—ভাবনার এমন দেটানায়, বিশৃঙ্খলির এমন যোরে নিমজ্জিত ছিলেন উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ। আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের মুখ থেকে কুরআনের একটি আয়াত শুনেই সেদিন তার এই যোর ভঙ্গল। বুরতে পারলেন, অতি শোকে এক মহাসত্ত্ব, এক মহাবস্তুতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তিনি। এমন নয় যে, এই আয়াত এর আগে উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ শোনেননি। ইতঃপূর্বে অনেক অনেক বাব তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। অনেক মানুষকে তিনি এই আয়াত পড়ে শুনিয়েছেন, শিখিয়েছেন। তারপরও তিনি বললেন, ‘মনে হলো এই আয়াত আমি আজই প্রথম শুনলাম।’ এই যে আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের একটি

[১] আর রায়িকুল মাখতুম, ৫৩৫-৫৩৬; বাংলা

[২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৪

[৩] আর রায়িকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ৫৩৫; বাংলা

[৪] তারিখুল ইবনি সাদ, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১১৪;

[৫] তারিখুল ইবনি সাদ, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১১৯;

ছেটি রিমাইভার, একটি ছেটি নাসিহা, এতেই উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের বিষ্ণুত অস্তর জেগে উঠেছিল সেদিন। যে মহাসত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন তিনি, আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের একটা ছেটি কথা সেদিন তাকে টেনে নিয়ে এলো পরম বাস্তবতায়। তার অস্তর উপলব্ধি করল সত্যাকামে। উপস্থিত সকল সাহাবি ও বুরাকেন যে, নবি মুহাম্মাদ সাজাজ্জাহু আলাইহি ওয়া সালামেরও মৃত্যু হতে পারে। যদি সেদিন আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ উমার রায়িয়াজ্জাহু আনন্দের এই ভুল না আতঙ্গেন, তাহলে মুসলিম শিখিয়ে শিরকের মতো একটা পাপ হতে শেকড় গেড়ে বস্ত।)

এই ঘটনা বকার উদ্দেশ্য হলো এই—একটি নাসিহা, একটি রিমাইভার, একটি উপদেশ মাঝে মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের জীবনে। বিস্মিতির অতল তলে তলিয়ে যাওয়া আমাদের হৃদয়গুলোকে জিগিয়ে তুলতে এ রকম নাসিহার খুব নেকি দরকার মনে করি। একটি আয়ত কিংবা হাদিস অথবা একটি বাক্য ও বদলে দিতে পারে আমাদের জীবন। হৃদয়ে মেলে দিতে পারে ভাবনার ডালপালা। বিস্মিত অস্তরকে নতুন করে জীবাতে, মরচে ধূরা ঈমানকে ঝালাই করতে, আবাধ্যতার আশকার থেকে আমাদের তুলে আনতে অনেক সময় একটি লাইনও যথেষ্ট হতে পারে।

জীবনের উদ্যম ফিরে পেতে, মহান রবের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য এ রকম রিমাইভারের বিকল্প নেই। সেই রিমাইভারের উৎস হতে পারে কোনো সত্যিকার আলাইওয়ালা ব্যক্তির সাহচর্য, হতে পারে ভালো কোনো অলিম্পের লেকচার, পিতিশ, কোনো ভালো স্কলারের সেখা আর্টিকেল কিংবা ভালো কোনো দীনি পরামর্শমূলক বই। এই উৎসগুলো আমাদের ঈমানকে ঝালাই করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসবের সাথে জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে পারলে পথ হারাবার আশঙ্কা ক্ষীণ হয়ে আসে। একজন সাহাবির ঘটনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মনে করাই যতক্ষণ তিনি নবিজি সাজাজ্জাহু আলাইহি ওয়া সালামের সাহচর্যে থাকতেন, ততক্ষণ তার মনে হতো যেন তিনি জামাতের বাণিজ্য হৈটে বেড়াচ্ছেন। মনে হতো জামাতের সৌন্দর্য, জামাতিদের বিচরণ, কলকল নহরের ধ্বনি—সবকিছুই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। নবিজির কাছাকাছি থাকেন তার অস্তর সারাক্ষণ্ণ আলাহুর ভয়ে কাগতে থাকে। হৃদয় টইটুর থাকে ঈমানে। কিন্তু যখনই তিনি নবিজির সাহচর্য ছেড়ে নিজের ঘরে যেতেন, তখনই যেন সবকিছু থেকে ছিটকে পড়তেন। স্তৰী-সন্তান-সংসারের

ভাবনায় ভুবে যেতেন। এই বাপারটা তাকে খুব শীঘ্ৰ দিত। ভাবতেন, নবিজির সাহচর্য ছেড়ে আসলেই বুঝি তিনি মুনাফিক হচ্ছেন। না হয় তার কাছ থেকে বিদ্যমানেওয়ামাত্র কেনই-বা তার মনে হয় যে, তিনি দুনিয়ার ভাবনায় ভুবে গোছেন? স্তৰী-সন্তান-সংসার কেনই-বা তার কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে ওঠে? কেন তিনি আবশ্য হয়ে পড়েন দুনিয়ার শেকেরে? এই ক্ষিপ্তগুলো যখন তার হৃদয়পটে উল্লয় হতো, তখন তিনি আবোরে কাঁচিত শুরু করতেন। এত বেশি কাঁচতেন যে, মনে হতো তার খুব প্রিয় কোনো মানুষ বুঝি ভৃত্যবরণ করেছে। যেন কোনো এক নিদপুর্ণ বিজ্ঞেদৰ্য্যাথায় তিনি কাঁচার একদিন আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ তাকে কাঁচিত দেখে কামার করণ জানতে চাইলেন। ওই সাহাবি বললেন, ‘আমি যখন নবিজির সাহচর্যে থাকি, তখন মনে হয় আমি যেন জামাতে হৈটে বেড়াচ্ছি। আমার হৃদয় তখন দিয়াত, নূর আব ঈমানের জোয়ারে টইটুর থাকে। কিন্তু যখনই দেখে বিবি, মনে হয় যেন দীন থেকে ছিটকে পড়েছি; দুনিয়াকে আপনি করে নিয়েছি; মুনাফিক হয়ে গেছি। নবিজির সাথে থাকলে এক রকম লাগে, তাকে হেডে এলো আনা রকম। আমি জানি না, কেন আমার এমন হয়! কেন আমি দুই সময়ে দু-রকম অনুভূতি পাই।’

তখন আবু বকর রায়িয়াজ্জাহু আনন্দ বললেন, ‘তোমার মতো আমার সাথেও টিক একই ঘটনা ঘটে। নবিজির পাশে যখন থাকি, মনে হয়, এই তো দেখতে পাইছি জামাত! এই তো সবুজ মিনার। ওই যে টৈলটেলে সুজ পানির বারনা! সবুজ গালিচার মতন দিয়ানিষ্ঠত মঠ! কিন্তু যখনই নবিজির সাহচর্যের বাইরে আসি, যখন নিজের পরিবার-পরিজনদের অসমে উপস্থিত ইহ, মনে হয় এই বুঝি ছিটকে পড়লাম জামাতের পথ থেকে। এই বুঝি বিপথে চলে গেলাম। বিশ্বাস হয়ে গেলাম। তোমার মতো টিক একই সমস্যায় আমি ও নিষ্পত্তি। চলো, আমরা বাস্ত নবিজির কাছে যিয়ে আমাদের সমস্যার কথা জানাই।’।

সাহাবিরা নবিজির পাশাপাশি যখন থাকতেন, তখন একটা জাগরণের মধ্যে সময় কঠিত তাদের। ঈমানের আলোচনা, আমলের আলোচনা। জামাতের বাহারি বর্ণনা, আহামাদের ভয়, তা থেকে পরিজ্ঞানের উপায় ইত্যাদি আলোচনায় মঞ্জে থাকতেন তার। নবিজির সঙ্গ তাগ করামাই তাদের মনে হতো, এই বুঝি তারা দীন থেকে ছিটকে পড়লেন। এই বুঝি আবার ভূবে দিলেন দুনিয়ায়। নবিজির সঙ্গে থাকলে তারা এক রকম থাকতেন, নবিজির সঙ্গ তাগ করলেই অনুভব করতেন অন-

[১] এই ধারনাটি IOU প্রেরে একটি আঁচকেলে পাওয়া।

[২] আমি ত্বরিমিদি : ২৫১৪, হাসিস্টি সহিত

রকম অনুভূতি। নাসিহা তথ্য রিমাইভারের গুরুত্বটা এখানেই। যখন আমরা কোনো ভালো ইসলামি বই পড়ি, আমলের বই পড়ি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটা দেশে কাজ করে। ইচ্ছ করে আমল করার, বললে যাওয়ার। নতুন করে সবকিছু সজিয়ে নেওয়ার। কিন্তু, যখনই আমরা আবার দুনিয়ার অনুষঙ্গে মিশে যাই, আমাদের সেই উদ্দাম ফুরিয়ে যায়। যখনই এ রকম অবস্থা হবে, তখনই আমাদের উচিত—ইমানের আলোচনা হয় কিংবা ইমানের আলোচনা আছে এমন বিষয়বস্তুতে ফিরে আসা যা আমাদের জন্য রিমাইভার হিশেবে কাজ করবে। এই বইটিকে আমি এ রকম একটি রিমাইভার হিশেবে দাঁড় করাতে চেয়েছি। অন্তত আমার জন্য।

এই বইতে আমি তরুণদের সমস্যাগুলোকে প্রাথম্য দিয়েছি সবচেয়ে বেশি। মোটামোটে বলা চলে, এটা তরুণদের উদ্দেশ্যেই লেখা। একজন তরুণ হিশেবে আমি যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হই কিংবা হয়েছি সেগুলো নিয়েই আমি আগামে চেয়েছি এখানে। নিজে একজন তরুণ হওয়াতে তরুণদের মনস্তত্ত্ব বৈকাঠা আমার জন্য দুর্বহ ছিল না অবশ্যই। নিজের যাপিত জীবনের অধ্যায়ে একজন তরুণ যে সমস্যাগুলোর ভেতর দিয়ে যায়, জীবনের অলিতে-গলিতে সে যে প্রতিবন্ধকতা, যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়, সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু নাসিহা তুলে ধরেছি মাত্র। এই নাসিহাগুলো সবার আগে আমার নিজের জন্য। আমি এও জানি, আমার মতন হাজারো যুবকের এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যদি এই বই তাদের সামান্য উপকারে আসে, যদি কোনো তৃষ্ণার্ত হৃদয় খুঁজে পায় একপশলা বৃক্ষ, অধূকারাজ্ঞ পথের কোনো এক পথিক যদি খুঁজে পায় এক টুকরো আলো, তবে আমার এই কাজ সাৰ্থক।

তরুণদের নিয়ে কাজ করার সুপ্ত আমার অনেক দিনের। এই তরুণরাই তো আমাদের উম্মাহর শক্তি। পিছিল পথ মাড়িয়ে আমাদের তরুণরা যত বেশি জীবনের সঠিক গত্তবের দিকে ফিরে আসবে, এই উম্মাহর বিজয় তত বেশি তুরায়িত হবে। জীবনের আদি এবং আসল উদ্দেশ্যকে তারা যখন চিনতে শিখবে, তখন তাদের ভেতর থেকেই উঠে আসবে নতুন যুগের হামিয়া, খালিদ, আলি এবং উমারের দল। তাদের নিয়ে সুপ্ত দেখতে এবং সুপ্ত দেখাতেই আমার এই ছোট প্রয়াস, যে প্রয়াসের সবটুকুজুড়ে আছে তাৰুণ্য। নিজেকে নতুনভাবে চিনতে, নতুন আজ্ঞাকে আবিষ্কার করতে এবার চলুন আমরা ভেতরে প্রবেশ করি...



## মন খারাপের দিনে

খুব মন খারাপ? হৃদয়ের অন্দরমহলে ভাঙনের জোয়ার? চারপাশের পুরিবাটাকে বিস্মিল আর বিরক্তিকর লাগছে? মনে হচ্ছে, আপন মানুষগুলো দূরে সদে যাচ্ছে? হারিয়ে যাচ্ছে প্রিয়জন, প্রিয়মান্য? কিংবা অ্যাচিত, অন্যায় সমালোচনায় ঝক্তবিক্ষিত অস্ত্র? নিম্নকের নিম্নায় হৃদয়ের গভীরে গভীর দৃঢ়বোধের প্লাবন? তাহলে চলুন আমরা ঘূরে আসি অন্য একটা জগত থেকে।

বলছিলাম সেই সময়কার কথা যখন পৃথিবীতে রাজকু করছিল সবচাইতে নিকৃষ্ট, নির্দিষ্ট, নরপিশাচ শসক ফিরাউন। সম্ভবত, পৃথিবী আর কখনেই তার মতন ছিটীয়া কোনো জালিয় শসককে অবসেকন করবে না। তার অত্যাচার আর নির্যাতনের মাঝা ছিল অতি ভয়ংকর। হবেই-বা না কেন? নিজেকে সে ‘খোদা’ দাবি করত। খোদার শান, মান আর মর্যাদার আসনে কল্পনা করে সে নিজেকে জগতের একজন্তু অধিগতি ধরে নিত। তার এই মিথ্যে দাবির সাথে যাই ছিল অস্তিত্ব, তাদের কপালে ভুটত—মৃত্যু! সেই মৃত্যুগুলো কোনো সাধারণ মৃত্যু ছিল না। কাউকে আজ্ঞনে পুঁতিয়ে মারত, কাউকে পানিতে চুবিয়ে মারত। যেন মৃত্যুর বাহারি আয়োজনে ভরপুর থাকত তার সংসদ!

ফিরাউন ধরে ধরে বনি ইসরাইলের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত। ফিরাউন জানত, তাকে বধ করার জন্য এই বনি ইসরাইলের মধ্যেই সত্য ইলাহের একজন সত্য নবি প্রেরিত হবে। সে ভাবত, বনি ইসরাইলের ঘরে জন্ম নেওয়া সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করতে পারলেই তার পথের কাঁটা সাফ করে ফেলা যাবে।

এই নিষ্ঠের, নির্দয় জালিমের হাত থেকে নিজের সন্তানকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠল  
শিশু মুসার মায়ের অস্তর। ঢেকের সামনে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের নির্মম মৃত্যুদৃশ্য  
অবস্থাকে করা দুনিয়ার কেনো বাবা-মায়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। কীভাবে বাঁচাবেন  
পুত্রকে তিনি? কীভাবে তাকে আড়াল করবেন জালিম বাহিনীর নাগপাশ থেকে?  
অস্থির চঙ্গলা হয়ে পড়লেন তিনি। মুসার মায়ের হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা আজ্ঞাহ  
কাছে গোপন থাকল না। তিনি শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে একটা বাক্সে তরে  
নন্দিতে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য মুসার মাকে নির্দেশ দিলেন। ব্যাপারটা কুরআনে  
এসেছে। আজ্ঞাহ সুবহানাল্লু ওয়া তাআলা বলছেন—

وَرَحِيْنَا إِلَيْنَا إِلَمْ مُوسى أَنْ أَزْبَعْيَهُ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ قَلْبَهُ فِي النَّهَرِ

আর আমি মুসার মায়ের নিকট এই মর্মে নির্দেশ পাঠলাম যে, তুমি তাকে  
দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে তখন  
তাকে নন্দিতে নিষ্কেপ করবে।<sup>[১]</sup>

চিন্তা করুন। একদিকে ফিরাউন বাহিনীর হাত থেকে সন্তানকে প্রাণে বাঁচাতে মায়ের  
অস্তর মরিয়া। অন্যদিকে বলা হচ্ছে, শিশুটাকে যেন বাক্সেন্ডি করে নন্দীর পানিতে  
ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আপাতদ্বিতীয়ে আমাদের মনে হতে পারে, এ যেন মৃত্যুর  
আগেই মৃত্যাকে বরণ করে নেওয়া। ডাঙ্গার বাধের ভয়ে জলের কুমিরের সামনে  
সন্তানকে ঠেলে দেওয়ার মতন ব্যাপার। আমার এবং আপনার মনে যে ভাবনার উদয়  
হচ্ছে তা কি মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনেও উদয় হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে  
তবে, তার মনের সেই ভৌতি, সেই ভয়, সেই সন্দেহ তখনই দূর হয়ে গেল, যখন  
তিনি আজ্ঞাহর কাছ থেকে আশার বাণী শুনতে পেলেন। সুমহান আজ্ঞাহ বললেন—

وَلَا تَخْفِي وَلَا تَخْزِنِي إِنِّي رَادُّ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمَرْسَلِينَ

আর একদম ভয় করবে না এবং চিন্তাও করবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমার  
সন্তানকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাস্তাদের অন্তর্ভুক্ত করব।<sup>[২]</sup>

[১] সুরা কাসাস, আয়াত : ০৭

[২] সুরা কাসাস, আয়াত : ০৭

ওই জায়গায় আমি কিংবা আপনি হলে যে ভয় এবং যে ভৌতি আমাদের অস্তরকে  
আটেপুঁষ্ট ধরত, একই ভয় মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনেও ঝুঁকে  
বসেছিল। তবে তিনি হতোলাম হয়ে যাননি। আশা ছেড়ে দেননি। তিনি চোখমুখ  
বৰ্ব করে এমন এক সন্তান ওপর ভরসা করেছিলেন যার দেওয়া আশা কখনো  
মিথ্যে হয় না। যিনি কখনোই প্রতিশুভ্র ভজ্ঞ করেন না। এরপর ফজারজ কী  
হলো তা আমরা সকলেই জানি। মুসা আলাইহিস সালামকে আজ্ঞাহ সুবহানাল্লু ওয়া  
তাআলা রক্ষা করেছিলেন। কেবল রক্ষাই করেননি, যে শক্তি হনে হয়ে তাকে হত্যা  
করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে ছিল, সেই শক্তির অন্দরমহলেই শিশু মুসা আলাইহিস  
সালামকে আজ্ঞাহ তাআলা বড় করে তুলেছিলেন। এই পরিকল্পনা কার? কে এমন  
নিখুঁত পরিকল্পনা করার ক্ষমতা রাখেন? তিনি সুমহান আজ্ঞাহ।

وَمَغْرِبَةً وَمَسْكَرَةً اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

তারা চক্রান্ত করে আর আজ্ঞাহ কৌশল করেন। নিশ্চয় আজ্ঞাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল।<sup>[৩]</sup>

আমরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনাও ঘরণ করতে পারি। শিশু ইউসুফ  
ছিলেন পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। ইউসুফের প্রতি  
পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এই অবগন্যীয় ভালোবাসাকে কোনোভাবে মেনে  
নিতে পারেনি তার অন্য সহোদরেরা। হিংসার বশবর্তী হয়ে, খেলার নাম করে তারা  
ছেট্ট ইউসুফকে ফেলে দেয় এক অধিকার কৃপের মধ্যে।

পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে এসে তারা খুব সুন্দর কাহিনি ছেড়ে বসল।  
বলল, ‘বাবা, খেলার মাঠ থেকে ইউসুফকে বাধ খেয়ে ফেলেছে।’ ইয়াকুব আলাইহিস  
সালাম জনতেন, তার ছেলেরা তার কাছে এসে মিথ্যে বাধা বলছে। তিনি এটাও  
জনতেন, তারা নিশ্চিত ইউসুফের কোনো ক্ষতি করে বলেছে। এতৎস্তুতেও তিনি  
কেনো প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না। প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে হারানোর বেদনায় মাথা  
চাপড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন না। এমনকি ছেলেদের তিনি কোনো কষ্ট কথা, কোনো  
হৃষকি-ধূমকি পর্যন্তও দিলেন না। তিনি কী বলেছিলেন জানেন? কুরআনে এসেছে—

فَصَبَرْ جَيْلٌ وَاللَّهُ أَشْعَانَ عَلَى مَا تَصْبِفُونَ

[৩] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৮

সুতরাং, আমার করণীয় হচ্ছে সুন্দর এবং সুস্থিরভাবে ধৈর্যধারণ করা।  
আর তোমরা আমার কাছে যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহই ইস্লেন  
আমার একমাত্র সাহায্যদাত।<sup>[১]</sup>

আল্লাহর ওপর ভরসার পাদ কতটা উচুতে থাকলে এমন মুহূর্তে একজন ব্যক্তি  
কথা বলতে পারে? এভাবে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিতে পারে? আর সেই ধৈর্যে  
বিনিয়োগ কর্তৃ বিশাল ছিল তা তো আমরা জানি। ইউনুক আলাইহিস সালামের  
প্ররবর্তীকালে আল্লাহ সুবহানারু ওয়া তাআলা মিশরে অবিটিত করেন রাজন বিশ্বস্ত  
লোক হিশেবে। যে ভাইগুলো তার সাথে শত্রুতা করে একদিন তাকে কপে ফেলে  
দিয়েছিল, তাদেরকেই তিনি তার পায়ের কাছে এনে ফেলেছিলেন। তিনি ইয়াকুব  
আলাইহিস সালামের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়তম পুত্র ইউনুককে, আর ইউনুক  
আলাইহিস সালামের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়তম পিতাকে। সুবহানারু! কচ  
সুন্দর আল্লাহর ভূত্তে দেওয়া মেলবন্ধন! কত চমৎকারই—না বিপদে ধৈর্যধারণের ফস!

সুতরাং, দুনিয়াবি কন্টগুলোতে, ‘না পাওয়া’ ও ‘হারিয়ে ফেলা’ গুলোতে একজন  
মুমিন কখনোই হতাশ হবে না। চরম বিপদের মুহূর্তে, উভয় সংকটের সময়ে মুসা  
আলাইহিস সালামের মাতা আল্লাহর দেওয়া ফয়সালাই মাথা পেতে শহুগ করেছিলেন  
এবং অশেক্ষা করেছিলেন আল্লাহর কৃত ওয়াদার ফলভাবের জন্ম। পুরু হারানোর  
শোকের দিনেও নবি ইয়াকুব আলাইহিস সালাম দেখিয়েছেন ধৈর্যের চরম পরাকরণ।  
আল্লাহ তাদের কাউকেই হতাশ করেননি। আস্তরিক সবর এবং আল্লাহর ওপর  
তাওয়াকুল তথা ভরসা করার জন্য আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিয়োগ প্রদান করেছে।  
মুসা আলাইহিস সালামের মাতার যিনি রব, তিনি আপনারও রব। যিনি ইয়াকুব  
আলাইহিস সালামের প্রতিপালক, তিনি আপনারও প্রতিপালক। মুসার মাতা যার  
ওপরে ভরসা করেছিলেন, আপনিও তাঁর ওপরে ভরসা করুন। ইয়াকুব আলাইহিস  
সালামের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু যেখানে, আপনি ও ঠিক সেই জায়গায় আপনার সমস্ত  
আশা আর ভরসাকে সমর্পণ করুন। যিনি মুসার মাতার অঙ্গরকে প্রশাস্ত করতে পারেন,  
তিনি কি আপনার ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়া হৃদয়ে প্রশাস্তির ফল্পন্ধরা বইয়ে দিতে  
পারেন না? যিনি মুসা আলাইহিস সালামকে তার চরম শত্রুর ঘরের মধ্যে বড় করে  
তুলতে পারেন, তিনি কি চাইলে আপনার দুঃখ, আপনার ব্যথা উপশম করে নিতে

পারেন না? যে মহান রব মুসুর মাতার আব ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভরসার  
প্রতীক হয়েছিলেন, আস্থার প্রতীক হয়েছিলেন, সেই রবকে আপনিও আপনার সকল  
আশাভরসার প্রতীক বানিয়ে মেলুন। জীবনের সমস্ত দুর্যোগে কেবল তাঁর ওপরই  
ভরসা করুন। দেখবেন আপনার জীবন এক অন্য রকম প্রশাস্তিতে ভরে গেছে।

মানুষ হিশেবে আপনার অবশ্যই জানা উচিত—এই দুনিয়া আপনার জন্ম কখনোই  
নির্মল আর নির্বাঞ্ছিট হবে না। জীবনের একটা পরম বাস্তবতা হলো জীবন কখনোই  
রেল লাইনের মতো সমান্তরাল হয় না। এই জীবন হলো দুঃখ-ক্রেশ-কষ্ট দিয়ে গাড়।  
দুনিয়ার সবাইকে আপনি কখনোই আপনার বশ হিশেবে পাবেন না। সবচাইতে  
পরিষ্ক, সবচাইতে তাকওয়াবান বাস্তি মুহাম্মাদ সালামারু আলাইহিস ওয়া সালামও তাঁর  
চরপাশের সবাইকে কখনোই বশ হিশেবে পাননি। তিনি ছিলেন ‘আল-আমিন’  
তথা বিশ্বত। সবার কাছে নায় এবং আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠা লোকটিরও  
সমালোচক ছিল। নিম্নুক ছিল। কৃৎসা-রটনাকারী ছিল। মানুষের সমালোচনার ত্রিতীয়  
নবিজি সালামারু আলাইহিস ওয়া সালামকেও বিশ্ব করতে যাচ্ছেন। নবিজি যখন  
সমালোচকদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত, যখন তার হৃদয় ভারী হয়ে উঠেছিল মানুষের কঢ়  
কথা আর কঢ় বাক্যে, তখন আল্লাহ সুবহানারু ওয়া তাআলা বললেন—

﴿لَقَدْ لَفِدَ أَنَّكُ بَصِيرٌ صَدَقْتَ مَا تَبَلَّوْلُونَ ﴾ فَسْطَعْ بَعْدَ رِيَّكَ وَكَنْ حَنْ السَّاجِدِينَ

অরু আমি তো জানি তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর ক্ষতবিক্ষত  
হয়। সুতরাং, আপনি আপনার রবের প্রশংসন্য তাসবিহ পাঠ করুন আর  
অস্তর্কৃত হোন সিজদাকারীদের।<sup>[১]</sup>

সুয়াং নবিজিকে যেখানে সমালোচনার ভেতর দিয়ে গেতে হয়েছে, সেখানে আপনি  
বা আমি কীভাবে ধরে নিতে পারি যে, আমাদের সমালোচক থাকবে না? নিম্নুক  
থাকবে না? আমাদের পেছনে কৃৎসা-রটনাকারী থাকবে না? বশত গৌচি হলো  
জীবন! এর জবাবে আমাদের প্রতিউত্তর কী হবে? আল্লাহ নিখিয়ে দিছেন, তাসবিহ  
পাঠ এবং সালাত আবদ্য। এতেই রয়েছে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গরকে দুঃখ সরানোর  
উপশম। তয়হৃদয় পুনর্নির্মাণের মাঝীয়ত। নবিজি আল্লাহর বাতলে দেওয়া উপায়েই

[১] সুরা ইউনুক, আয়াত : ১৭-১৮

ହୁନ୍ତକେ ପ୍ରଶାସ୍ତ କରେଛେ। ମାନ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସମାଜୋଚନାମ୍ବଯଖନ ତାର ହୁନ୍ତା ବେଦନାର ଭାରେ ଲୁହିଁସ ପଡ଼ତ, ତଥାନ ତିନି ବିଲାଳ ରାଯିଯାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦକେ ସାଲାତେର ଜ୍ଞାନ ଡାକ୍ତରେନ୍ ଆର ବଲତେନ୍, ବିଲାଳ, ସାଲାତେର ମଧ୍ୟମେ ଆମଦେବ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଶାସ୍ତ ହେବାନ୍ତି।

যখন কেউ আপনার নামে কৃষ্ণা রঞ্জিতে, অনর্থক আপনার নামে সমালোচনা করবে, তখন আপনি দৈর্ঘ্যহার হবেন না। হতবিশ্বল হয়ে পড়বেন না। সবর করবেন। এই সবরের ফল সুন্দর। আয়িশা বায়িয়াজাহু আনন্দের খাপারে দেওয়া মুন্তকিবদে আপনাদের কথা কি মনে আছে? একবার এক সকরের সময়ে তিনি কাছেজ্জল থেকে একটু পিছিয়ে পড়েন। তিনি যে কাছেজ্জল থেকে ছিটকে পড়েছেন সেটা কেউ বুবাতে পারেনি। এরপর, জনশূন্য সেই প্রান্তে তিনি ঠিক কী করবেন এমন ভাবনার দেশালচে সময় যেতে লাগিল। একসময় তিনি স্থানটিয়ে দুমিয়ে পড়েন। পরে, সাফওয়ান ইন্বু সুলামি ওই পথ অতিক্রম করার সময় আয়িশা বায়িয়াজাহু আনন্দকে দেখতে পান এবং তাকে সাথে নিয়ে পন্দৰায় কাছেজ্জল যোগ দেন।

এই ঘটনাকে নিয়ে কৃত্তি রেডিয়ো মুনাফিকদের সর্দার আঙ্গুলাই ইবনু উবাই সে প্রশ্ন তোলে আয়িশা রায়িয়াজাহু আনহার পরিত্ব চিরিত নিয়ে। শুনতে অবাক লাগলেও সত্য, মুনাফিকদের এই কৃত্তি, এই সমালোচনা এবং তিরস্কার রাসমুজাহি সাজাজাহু আলাইই ওয়া সামান এবং আয়িশা রায়িয়াজাহু আনহার মাঝে সমাখ্যিক দূরত্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নবরিজি বুকাতে পারহিসেন না, সমালোচকদের তিনি কী জবাব দেবেন। কীভাবেই-বা প্রমাণ করবেন যে, আয়িশা একজন সতীসার্বী নারী তাছাড়া, আধুনিক ইবনু উবাই যা প্রচার করে বেঢ়াচ্ছে, তার সত্য-মিথ্যার ব্যাপারেও তিনি সম্ভিহান। তিনি কেবল আজাহর ওপর ভরসা করলেন। এমন দেটানা পরিপূর্ণভাবে, এমন বিপরী সময়ে তিনি এক মহামাহিম আজাহর ওপর তাওয়াকুল করেছেন আয়িশা রায়িয়াজাহু আনহার ও তা-ই করেনেন। কানও সাথে কোনো বিরোধ করেননি কোথাও উচ্চবাচ্য করেননি। চোখের জল ফেলে কেবল আজাহর কাছে নিজের সমস্ত অভিযোগ, সমস্ত বাসনা সোপন্দ করেছেন। আজাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি মুহাম্মদ সাজাজাহু আলাইই ওয়া সামান কিংবা আয়িশা রায়িয়াজাহু আনহারকে নিরাশ করেছেন? হতাশ করেছেন? মুনাফিকদের বিরুদ্ধে, সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে, কৃত্তি-রেডালাকারীদের বিরুদ্ধে সাময়িক করেননি? অবশ্যই করেছেন। ওহি নামিয়

କରେ ଆଜ୍ଞାହ ମୁହାନାଟୁ ଓୟା ତାଆଳା ଆମିଶା ରାସିଯାମାଟୁ ଆନହାର ଚଲିତ୍ରେର ବ୍ୟାପାରେ  
ମୁନାଫିକଦେର ସକଳ ସତ୍ୟକ୍ରମେ ନ୍ୟାୟକେ ନ୍ୟାୟ କରେ ଦିଯେଛେଣ । କୁରାଜେନ ଆଜ୍ଞାହ ବଜାହେ—

إِنَّ الَّذِينَ حَاجُوا بِالْأَعْلَمِ كُفَّرٌ بِهُنَّا

নিশ্চয় যারা এই অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একাতি মন।

এটা যে একটি অপৰাদনা, কুস্তি এবং ডিয়াগ্নোস্টিস, সেটা আজার সুব্রহ্মণ্য ওয়া তাআলিম প্রতি করেই জানিবেন সিয়েছেন। ভাবা বৈধ তো আজার তার মুমিন বাস্তিদের সাহায্য করে থাকেন। কথনে প্রশ্ন সাহায্য, ‘আবার কথনে-ৰা’ অস্পষ্ট সাহায্য।

জীবনে আপনিও আপনার চারপাশে একটি দল পাবেন যারা সর্বো আপনার  
সমালোচনায় মুখ্য থাকবে। গভীর পর্যবেক্ষণের জন্য আপনার ভালো কাজটির খুলু  
বের করবে। আপনার তুচ্ছত্ব কাজটিকে ফলাও করে প্রচার করে দেবাবে যাবে।  
আপনাকে মানসিকভাবে ভেঙে দেওয়া যাব। যাতে আপনি হতাশ হয়ে পড়েন  
আপনার মন যাতে বিহিন্ন ও হটে। এ সবকিছুই তারা আপনার প্রতি হিসে, দীর্ঘ আর  
ঝিঙাংশীর শব্দকষ্ট হয়ে করে থাকে; কাবল, আপনার অবস্থান তারের শীঘ্র দেয়।  
আপনার গ্রহণযোগ্যতা তাদের মনে বিষয় ফলার মতো আগত করে। আপনাকে  
আপনার অবস্থান থেকে নামিয়ে আনার চিন্তায় তারা সদা লিঙ্গের থাকে—কীভাবে  
অনন্দে চোখে আপনাকে খাটো করা যায়, কীভাবে অনন্দের মনে আপনার  
ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বনে দেওয়া যাব।

এদের ব্যাপারে কথনেই হতাশ হবেন না। এদের কথায় মন থাপাপ করবেন না ভেঙে পড়বেন না। হতোলাপ হবেন না। এদের কথা কিংবা স্বত্ত্বয়ে বিপ্রস্তুতে প্রতিক্রিয়া দেখবেন না। শুধু সবর করবেন। আজাহার ওপর তরসী করে তাদের ফটো করে দেশেন। নিজের এবং তাদের দিয়াতিরের জন্ম আজাহার কাছে প্রার্থনা করবেন। বাস! আপনার কাছে বেকল ওটকুরুই। এ রকম অবাস্তুর সমালোচনার পদ্ধতি হলু নিজের সাথে কথা বলুন। ভেবে দেশুন তো, আপনার ইঞ্জিন আর নিয়ন্ত অপনার কাছে পরিশুষ্প মনে হয় কি না? যদি অস্তরের ভেতর থেকে এই কথা প্রতিক্রিয়া নিন হ্যায়, ‘আমি ডো এই কাজ আজাহারের মাঝি খুনি সুনে আজাহার কাজেই আগুণে’। আজাহার

[୧] ମୁନ୍ତର ଆବି ଦାଉଦ : ୪୯୪୫, ହାରିସଟି ଶହିର

নিশ্চিন্ত মনে আপনার পরবর্তী কাজে মনোযোগ দিন। এ রকম বিশুদ্ধ নিয়ন্ত্রের কারণে ভুল কাঞ্চটার জন্যও আপনার আমলনামায় হয়তো সাওয়াব যোগ হয়ে গেছে।

মন খারাপের দিনগুলোতে আজ্ঞাহর সাথে বেশি কথা বলুন—কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে, সালাতের সিজদার মধ্যে। আজ্ঞাহকে বলুন তিনি যেন আপনার অশান্ত মনটাকে প্রশান্ত করে দেন। তাঁকে অনুময়-বিনয় করে বলুন, বুকের মধ্যে কাল্টোবেশাথী বড় আপনার মনের উচ্চোস্তাকে তচ্ছন্দ করে দিচ্ছে, সেই কাল্টোবেশাথী তিনি যেন থামিয়ে দেন। সেখানে যেন রহমতের বারিধারা প্রাপ্তির হ্য। একটিবার নিজের জীবনে কুরআনকে জয়গা করে দিন। দেখবেন, জীবনের গতিপথ কীভাবে পাঠে যায়। কুরআনের সারনির্যাসকে একবার নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেই দেখুন না। দেখবেন আপনার জীবনটা অন্য রকম এক শীতলতায় ভয়ে উঠেছে। দুনিয়ার মানুষ যে অস্তর ভেঙে দেয়, আজ্ঞাই শুবহানাকু ওয়া তাআলা সেই অস্তর ভালোবাসার প্রসেপে জোড়া লাগিয়ে দেন।

আপনার মনে হচ্ছে, আপনি বার্ষ হয়ে গেছেন, তাই না? মনে হচ্ছে, প্রহিলিতা আপনার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। জীবনের কেনো মানে খুঁজে না পেয়ে হতাশয় নিমজ্জিত আপনার তরুণন, এই তো? কুরআন খুঁজুন। দেখুন আপনার রব আপনার জন্যাই বলছেন—

فَلَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنَةِ

অবশ্যই বিশ্বাসীরা সফল হয়েছে।<sup>(১)</sup>

আপনি একজন মুমিন। একজন বিশ্বাসী। একজন তাকওয়াবান। আপনি তো হতাশ হতে পারেন না। আজ্ঞাহর দয়া থেকে, তাঁর কৃপণ, ভালোবাসা এবং রহমতের মে বারিধারা আপনার ওপর বর্ষিত হচ্ছে, তা থেকে আপনি কীভাবে নিরাশ হবেন? দুনিয়াবি বার্থতা, অসফলতায় আপনার কী আসে যায়, বলুন? আজ্ঞাহর ওপর যারা ভরসা করে, নির্ভর করে, তারা হতাপ হয় না। দুনিয়ার বার্থতা তাদের আবাস নেবে না। তারা বরং অপেক্ষার প্রহর মৌনে মহাসাফলের। সেই সাফল্যের, যার প্রতিশৃঙ্খল দিয়েছেন সুয়াং রাতুবল আলামিন। আপনার দৃদ্ধ যথন আজ্ঞাহর ওপর ভরসায় টিটুসুর, তখন সিজদায় যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মতো করে বলুন—

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ০১

وَلَمْ أَكُنْ بِذِيْغَبَقْ رَبْ شَفَقْ

হে আমার রব! আমি তো কখনো তোমাকে ঢেকে ব্যর্থ হইনি।<sup>(১)</sup>

আপনার জীবনে অনেক দুঃখ আসতে পারে। আপনি মুখোমুখি হতে পারেন নামান বাঞ্ছাঙ্কুর বাড়ের। কোনো কোনো বাড়ো হাওয়া এমে আপনার জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়ে যাবে। অঙ্গুট সুরে মহান রবকে যথন বলেন, ‘মালিক! আমাৰ জীবনে এত কষ্ট কেন?’ তিনি তখন বলেন—

إِنَّمَّا مَعَنِيَ لِغَبَقْ رَبْ شَفَقْ

নিশ্চয় কঠের সাথেই রয়েছে সুস্থিত।<sup>(২)</sup>

এমন কঠিনতর বিপদে আশেপাশে কাউকে পাছেন না। এমনকি অব্যবহারে আপন ছাঁটাও মিলিয়ে যায়। আপনার এতদিনের সুব্রহ্ম, প্রিয় বলু, ত্রিয় সুজনদের কেউই এই দুর্দিনে আপনার পাশে নেই। নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অন্তুল দরিয়ায় একটি ডুবডুবু নৌকার আপনি একাই যাচ্ছি। এই নৌকা যেকোনো মুহূর্তেই তলিয়ে যাবে। এমন সময়ে আপনি যখন আশাহত হয়ে রবের কাছে ফরিয়াদ করে বলেন, ‘মাবুদ! আজকে আমাকে সাহায্য করার মতন কেউই নেই।’ তখন আপনার রব বলেন—

وَكَانَ حَلَالًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

মুমিনদের সাহায্য করা আমাৰ দায়িত্ব।<sup>(৩)</sup>

প্রিয়জনেরা বিছেদ ঘটিয়ে দূরে চলে গেছে। জীবন নামক চোরাবালির সাথে আপনি আৰ কোনোভাবেই পেরে উঠছেন না। খুব অসহায়বেশ করছেন। মনে হচ্ছে, আপনি একুনি ডুবে যাবেন দুঃখের অতল গহরে। হারিয়ে যাবেন চিরতরো। তখন

[১] সুরা মাইহাম, আয়াত : ০৪

[২] সুরা ঈন্দ্ৰিয়া, আয়াত : ০৬

[৩] সুরা বুম, আয়াত : ৪৭

যদি মুখ ফুটে বলেন, ‘আ঳াহ! আমার পাশে আজ কেউই আর অবশিষ্ট নেই।’  
তখন আপনার ডাক শুনে আ঳াহ বলেন—

لَا تَحْمِلْنَا إِلَيْنَا أَسْتَعْ وَأَرْزِي

ভয় পেয়ো না! আমি তোমাদের সাথেই আছি। আমি সব শুনি এবং দেখি।<sup>[১]</sup>

পাপে জর্জরিত হয়ে আছে জীবন। চোখ মেললেই চারদিকে কেবল অধ্যকারের  
ঘনঘটা দেখতে পান। কল্পিত হন্দয় নিয়ে যখনই আ঳াহর দরবারে দাঁড়িয়ে বলেন,  
‘আমি যে এত পাপ করেছি, আ঳াহ কি সত্যিই আমাকে ক্ষমা করবেন?’ তখনই  
আপনার রব জবাব দেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَوَافِينَ

নিশ্চয় আ঳াহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।<sup>[২]</sup>

এভাবেই আ঳াহ সুবহানারু ওয়া তাআলা প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি মুহূর্তে আপনার  
পাশে থাকেন। আ঳াহর কলামকে, তাঁর বাণীকে জীবনে ধারণ করুন। আ঳াহকে  
জীবনে বধু বানিয়ে নিন। বিশ্বাস করুন, বধু হিশেবে তাঁর চেয়ে উন্নত, তাঁর চেয়ে  
প্রতিশুতিশীল, তাঁর চেয়ে মহান আর কেউ হতেই পারে না। নিজের জীবনের  
অধ্যকার প্রকাষ্ঠে আলোর রেখা প্রবেশ করতে দিন। অধ্যকারকে আলো দ্বারা  
দৃঢ়ীভূত করুন। আপনার যে পঢ়িবী এতদিন এক ঘনঘোর আঁধারে নিমজ্জিত ছিল তা  
উঙ্গাসিত হবে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপে। নতুন এক রঙে। মন খারাপের দিনগুলোতে  
আ঳াহকে আপনার সঙ্গী বানান, দেখবেন সে মুহূর্তগুলো সব আচমকা আপনার  
জীবনের সেরা মুহূর্তে পরিগত হয়ে গেছে। তাই যে দুঃখগুলোর কথা কাটিকে  
আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে অহরহ, হারানোর যে বেদনা আপনাকে কুরে কুরে  
থাচ্ছে, যে অন্ধিরতা আপনাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না, যে ভগ্নহৃদয় আপনাকে ভেঙে

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৪৬

খানখান করে দিচ্ছে, সে সমস্ত মন খারাপের গঞ্জে কেবল বলুন, ‘হ্যাসবুনারাকু ওয়া  
নি ‘মাল ওয়াকিল।’ আমার জন্য আমার আ঳াহই যথেষ্ট। বিশ্বাস করুন, আপনার  
সমস্ত মনখারাপের উপশেমের জন্য কেবল এটুকুই যথেষ্ট। আ঳াহ যার অভিভাবক,  
কপালে তার দুচিন্তার ভাঁজ থাকতেই পারে না।



## আমার এত দুঃখ কেন?

[ক]

মাঝে মাঝে ভীষণ কষ্ট লাগে। বুকের ভেতরে বসা বাঁধে দুঃখের কালো ছেথ। অবিভায় বৃত্তিরাধার মতো বিষঘাত এসে আছড়ে পড়ে মনের উটোনে। আবশ্যিকের হিমালয় ফেন তার সমস্ত ঔর্ণৰ্থ নিয়ে ভেঙে পড়তে চায় বুকের ওপর। জগৎসংসার তখন বিষাঙ্গ লাগে।

মাঝে মাঝে প্রচল দুঃখবোধে ভেঙে পড়ি আমরা। হয়তো হঠাত করে হারিয়ে বসি কোনো প্রিয় মানুষকে। খুব আশা করে থাকি এবারের পৌরো শীতে মায়ের হাতে বানানো খোয়া ওঠা ভাপা পিঠা খাব বলে। কিন্তু পৌরো আসার আগেই মা হয়তো দুনিয়ার পাঠ ঢুকিয়ে ওপারে পাড়ি জিমিয়েছেন। অথবা, আস্তে আস্তে করে জমানো টাকা, যে টাকা দিয়ে বাবাকে দৈদে উপহার দিয়ে চমকে দেবো ভেবেছিলাম, দুদ আসার আগেই হয়তো বাবা চলে গেছেন রবের সাঙ্গাতে।

এমনও হতে পারে, ভালো বেতনের কোনো চাকরি হঠাত করেই চলে গেল। অথবা, আমার এক বন্ধু আমার সমান যোগ্যতা নিয়ে জীবনে সাই সাই করে উন্মতি করছে, কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছি না। আমার বন্ধু আমার সমান খাটি-খাটুনি করে খুব ভালো রেজান্ট করছে, কিন্তু আমি পারছি না।

পারিবারিক অথবা দাম্পত্য জীবনটাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। ব্যবসায় সোকসনি হচ্ছে। খেতে নষ্ট হচ্ছে ফসল। উর্বরতা হারাচ্ছে আবাদি জমি। মরে যাচ্ছে গবাদি

পশু। বনায় ভেসে গেছে একমাত্র আশ্রয়। অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তিলে তিলে জমানো সম্পদ। মাথার ওপর বেড়েই চলেছে বাবের বেন্দু। আবার, এমনও হতে পারে, কাছের মানুষগুলো আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটিও আজ আর ফিরে তাকাচ্ছে না। বাড়ছে দূরত্ব। ভেঙে যাচ্ছে সম্পর্কের বন্ধন।

এখন নানান রকম জীবন সমস্যার মুখোমুখি করবেলি আমরা সকলেই হয়ে থাকি। আমরা ভেঙে পড়ি। ভেতরে ভেতরে গুড়িয়ে যাই। আশাহত হই। বিষঘাতের বিষবাক্ষে ছিয়ে যায় আমাদের হস্যকোণ। কিন্তু আমাদের সাথে কেন এমনটা হয়?

[খ]

আমরা সকলেই ‘পরীক্ষা’ শব্দটির সাথে পরিচিত। সুন্দ, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিস্থলে আমরা পরীক্ষা দিই। পরীক্ষায় পাশের জন্য আমরা দিনরাত পড়াশুন করি। নেট করি। নিয়মিত ক্লাস করি। দুনিয়ার জীবনটাও আজাহার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ঠিক সে রকম একটা পরীক্ষা। আজাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্মাই। আমরা স্তীর অনুস্ত বাস্তা কি না তা যাচাইয়ের জন্য। নাহ, আজাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই এই যাচাই-বাহাইয়ের ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি আলিমুল গায়েব। হত-ভবিষ্য সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে কে কে তাঁর অনুগত আর কে কে তাঁর অবাধ্য। চাইলেই তিনি আমাদের দুনিয়াতে না পাঠিয়ে সরাসরি আমাদের বৃহৎ তথা আজ্ঞাগুলোকে হয় জারাতে আর না হয় জাহাজামে দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমনটি করেননি। কারণ, তিনি আমাদের কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ নিতে চাননি। কী রকম প্রশ্ন? কিয়ামতের মাঠে যাতে আমরা অভিযোগ করে বলতে না পারি। ‘আপনি আমাদের তো পরীক্ষাই করেননি। পরীক্ষা হাজার আমাদের জাহাজামে পাঠিয়েছেন। অথচ আমার পরীক্ষা নিলে আজকে আমি জাহাজামের বদলে জাহাতে থাকতে পারতাম।’

দুনিয়াকে আজাহ তাআলা বানিয়েছেন বিশাল একটা পরীক্ষাকেন্দ্র। আজাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলছেন—

رَبِّنَا لَنَحْنُ نَعْلَمْ بِنَفْسِنَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالْجَهَنَّمِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْمُتَزَرِّعَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং (তোমাদের) জানমাল ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।<sup>[১]</sup>

আল্লাহ সুবহানান্নু ওয়া তাআলা আমাদের পরীক্ষা করবেন ভয়তীতি দিয়ে। কখনো কি এমন হয়েছে যে, আপনি বাসে করে কোথাও যাচ্ছেন এবং সেই বাসটা হাঁটা করে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পড়ল? সেই দুর্ঘটনায় মারা গেছে আপনার পাশের যাত্রী, কিন্তু আপনার তেমন কোনো ক্ষতিই হয়নি। হয়েছে এ রকম?

দূরের যাত্রার বিরক্তি কাটাতে একটু আগেও দুজনে পাশাপাশি দিবি খোশগাল করছিলেন। কিন্তু কয়েক মিনিটের ব্যবধানেই আপনার পাশের সেই সহযাত্রী এখন মৃত আর আপনি জীবিত রয়ে গেলেন। এই দুর্ঘটনায় কিন্তু আপনারও মৃত্যু হতে পারত। পাশের সহযাত্রীর মতো আপনি কিন্তু লাশে পরিণত হতে পারতেন। আপনার নামের পাশে ‘আহত’ শব্দের বদলে শোভা পেতে ‘নিহত’ শব্দটি। কিন্তু আল্লাহ সুবহানান্নু ওয়া তাআলা আপনাকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। চাকুর এই ভয়ানক দৃশ্য অবস্থাকে করিয়ে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে চান যে, আপনি এই দৃশ্য থেকে শিক্ষা নেন কি না। তাঁর শোকের আদায় করেন কি না। তাঁর অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসেন কি না। তিনি দেখতে চান, এই মৃত্যুর দৃশ্যটা আপনার হৃদয়ে কতটা প্রভাব ফেলে। আপনার বোধেদয় ঘটে কি না। এ রকম বিভিন্নকাময় দৃশ্য দেখে আপনি মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে পড়েন কি না—সেটাই হলো আপনার জন্য পরীক্ষা।

জীবনে এমন আরও বহু ঘটনার সম্মৌখীনি আপনি হতে পারেন। লভনে যাওয়ার জন্য আপনি বুধবার সকালের বিমানের টিকেট চেয়েছেন, কিন্তু পেয়েছেন বুধবার বিকেলের। সকালের টিকেট না পাওয়ায় আপনার প্রচণ্ড মন খারাপ। হতে পারে সকালের টিকেট না পাওয়ায় লভনে কোনো একটা পর্যাপ্ত আপনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। হতে পারে ম্যানচেস্টার শহরের কোনো এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আপনি মিস করবেন। অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু সকালের টিকেট না পাওয়াতে একরাশ দুঃখ আর মন খারাপ নিয়ে টিকে খুলে যখন দেখতে পেলেন লভনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সকালের নির্ধারিত সেই ফ্লাইট ক্র্যাশ করেছে এবং নিহত হয়েছে বিমানের সকল যাত্রী, তখন কেমন লাগবে

আপনার বলুন তো? মিস হয়ে যাওয়া ম্যানচেস্টারের ওই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান কি আপনার প্রাপ্তের চেয়েও মূল্যবান? সকালের ফ্লাইট মিস হয়ে যাওয়ায় আপনার কি তখনে মন খারাপ থাকবে? আফসোস হবে?

মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজেকে সবসময় নির্ভুলতার আসন্নে দেখতে পছন্দ করে। সে মনে করে তাঁর জীবনের সব ভালোবাস, ঠিক-বেঠিক বোবার ব্যাপারে সেই যথেষ্ট। নিজের জন্য পছন্দ করা জিনিসটা কীভাবে তাঁর জন্য হুমকিস্বৃপ্ত হতে পারে সেটা মানুষ ভাবতে পারে না যে, সেটা সে অপছন্দ করে, সেটা কীভাবে তাঁর জন্য জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠতে পারে। মানুষ এটা কখনোই বুঝতে পারবে না। এটা জানেন কেবল আল্লাহ সুবহানান্নু ওয়া তাআলা। কারণ, তিনিই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। এজনেই তিনি বলেছেন—

عَنِ اَنْتَ شَفَّعُوا شَبَّيْنَا وَهُوَ خَيْرٌ لَّنْ وَغَنِيَ اَنْ تَحْبِبُنَا وَفَوْقَ شَرِّنَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْشَمْ لَا تَعْلَمُونَ

হয়তো তোমরা যা অপছন্দ করো তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর তোমরা যা পছন্দ করো, সেটা হতে পারে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ সুবহানান্নু ওয়া তাআলা। কিন্তু তোমরা জানো না।<sup>[২]</sup>

আল্লাহ সুবহানান্নু ওয়া তাআলা দেখতে চান, এ রকম নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আপনাকে বাঁচানোর পরেও আপনি পরের বার ম্যানচেস্টার শহরের মদের বারে যান কি না। তিনি দেখতে চান, রাত হলেই আপনি তাঁর অবাধ্যতায় গা ভাসিয়ে কোনো নাইট ফ্লাবে নিয়ে ফুর্তিতে মেটে ওঠেন কি না। এই যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আপনার মধ্যে একটা ভয় ধরিয়ে দেওয়া, সেটাই আল্লাহর পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান এই ভয় আপনাকে কোন দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর পথে না শয়তানের গম্ভীর!

আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করবেন ক্ষুধা-অনাহারের মাধ্যমে। এই উদাহরণের যথার্থতা উপলব্ধি করার জন্য রাস্তার একজন ভিক্ষুকের দিকে তাকান। অথবা সেই অভয়ীন লোকটার দিকে যে অগ্রলক দৃষ্টিতে আপনার বার্গার খাওয়ার দৃশ্যটি

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৬

অবলোকন করে। খুব বেশি দূরেও যেতে হবে না—মায়ানমার থেকে আসা লক্ষ শরণার্থীদের কথা ভাবুন তো। কতটা মানবেতর তাদের জীবন! তাদের ওপর লক্ষ শরণার্থীদের কথা ভাবুন তো। কতটা মানবেতর তাদের জীবন!

এই যে অভ্যাস, এই যে ক্ষুধার যন্ত্রণা, হতে পারে এটা তাদের জন্য পরীক্ষা।

বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়াটা একজন ক্ষুকের জন্য পরীক্ষা হতে পারে। আগুন লেগে ফ্যান্টির পুড়ে যাওয়াটা একজন বাবসাহীর জন্য পরীক্ষা হতে পারে। মা-বাবা, স্তৰী-সন্তৰী কিংবা কাছের কেউ মারা যাওয়া-সহ নানানভাবে আঙ্গাহ শুবহানাত্তু ওয়া পারে আঙ্গাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষাসমূহ।

### [গ]

ছেটবেলায় হাতে দেলে চু মেরে আস্তাম কামারের দেকানে। দেখতাম লোহাকে কীভাবে কড়া আগুনে পুড়িয়ে সিটানে হাতো। তয় পেতাম। মনে হতো, এই লোহাগুলোকে যে এভাবে পোড়াচ্ছ, এগুলো তো ছাই হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে বুবলাম যে লোহাকে এভাবে পোড়ানে আসলে ছাই হয় না; বরং লোহা আরও মজবুত এবং ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে। আগুনের ‘পোড়ানো’ ধৰ্ম আর লোহার ‘বস্তু’ ধৰ্ম মাথায় নিয়ে আগুন এবং লোহার মধ্যকার এই যোগসূত্র বুবাতে আমার অনেক দিন লেগেছিল।

‘পরীক্ষা’ হিশেবে জীবনের এই যে নানামূল্যী সমস্যা ও সংকট, এগুলো হলো আগুনের মতো। আর বান্দাকে তুলনা করা যায় লোহার সাথে। আগুন আর লোহার সম্পর্ক যেমন পুড়িয়ে নিঃশেষ বা ধ্বংস করে ফেলা নয়, বরং সুদর ও উপকৰী কিছু তৈরি করা, আঙ্গাহর পক্ষ থেকে আসা এই পরীক্ষাগুলোও বান্দার জন্য খারাপ কিছু নয়, বরং বান্দাকে পরিশুম্ব করে তোলাই আঙ্গাহর ইচ্ছা। আঙ্গাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরই বেশি পরীক্ষা করেন। আঙ্গাহ যদি চান যে তাঁর কোনো বান্দা শুরু আর শুভ্রতার স্পর্শে পরিত্র হয়ে উঠুক, তখন তিনি সেই বান্দার বেশি বেশি পরীক্ষা নেন।

নবি-রাসূলদের জীবনের দিকে তাকানেই আমরা এর সত্যতা দেখতে পাই। সত্যবৃত্ত আঙ্গাহ তাআলা এমন কোনো নবি-রাসূল দুনিয়ায় প্রেরণ করেননি, যাকে কঠিন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হ্যানি। শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে তো শত্রুর ভয়ে বাঁকে তার দরিয়ায় নিষ্কেপ করতে হয়েছিল। বড় হয়ে ওঠার পরেও কি তাকে কম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হ্যানি? ফিরাউনের মুখোমুখি হওয়া থেকে শুরু করে গভীর সংকট মাথায় নিয়ে লোহিত সাগর পার হওয়া। আহ! কতই-না সংকটগুলু মুকুর্ত ছিল সেগুলো!

নবি আইয়ুব আলাইহিস সালাম। শেষ বয়সে এসে আঙ্গাহর পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে গেলেন। দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে একে একে হারাতে লাগলেন ধনসম্পদ, জমিজমা সবকিছু। এমনকি, নিজের ছেলেমেয়ে, আবীয়সজুন সকলে তার এই দুরব্যথা দেখে তার কাছ থেকে দ্বে সরে গিয়েছিল। তাকে ছেড়ে যাননি কেবল তার পুত্রান্তরী স্ত্রী। চিন্তা করুন, আপনার ভীষণ বিপদের সময়ে, ঘোরতর সংকটে আপনার সবচেয়ে শিয় মানুষগুলো যদি আপনাকে ছেড়ে চলে যায়, কেবল লাগবে আপনার? এজন্যেই দুনিয়ার সম্পর্কগুলোতে এমনভাবে জড়াতে নেই যা আবিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। দুনিয়ারি সম্পর্কের মোৰে যদি আপনি আবিরাতকে কম গুরুত দেন, তাহলে আপনার বিপদের দিন থাকবে এই সম্পর্কগুলো ধীরে ধীরে দ্বে সরে যাবে, তখন কিছু দুনিয়াটাই আপনার কাছে বিস্তু লাগবে। আব্যহত্তা করতে মন চাইবে।

এ রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। অগ্নিক্রে নিষ্কেপ করা হয়েছিল তাকে। নৃহ আলাইহিস সালামের ওপরে তার কণ্ঠের অভ্যাচর এবং অবাধ্যতার মাত্রা এতই ভ্যাবহ হয়ে উঠেছিল যে, তাদের হাত থেকে নৃহ আলাইহিস সালামকে বাঁচানোর জন্যে পুরো কণ্ঠমকেই আঙ্গাহ তাআলা বন্যার পানিতে তলিয়ে দিয়েছিলেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনের দিকেই তাকান। খুব ছেটবেলায় ভাইয়েরা শত্রুতা করে তাকে কৃপে নিষ্কেপ করে। এরপর মিশ্রের রাজাৰ কাছে সিয়েও বাবে বাবে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। কারাগারে পর্যন্ত নিষিষ্ঠ হয়েছিলেন।

শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে ইস্মা আলাইহিস সালামকে তো আঙ্গাহ শুবহানাত্তু ওয়া তাআলা আসমানেই তুলে নিয়েছেন। আর সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ সালামাত্তু আলাইহি ওয়া সালাম। আঙ্গাহর কতই-না উত্তম বান্দা আর রাসূল ছিলেন তিনি! জ্যের চিকিৎসার বাবাকে হারিয়েছেন। দুনিয়াকে বুবাতে শেখার আগে হারিয়েছেন গর্ভধারিণী মাকে। যে প্রিয়তম চাতার কাছে অঞ্চল পোয়েছিলেন, একসময় তিনিও একা করে চলে যান। চোখের সামনে সন্তানদের মৃত্যু, প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু—জীবনের চিত্রান্তে হারাবার আর বাকি থাকলেই-বা কী? ধীনের দাওয়াত শুরু করার পরে তায়েববাসীর নির্ভজ আবাত, নিজ কণ্ঠ দ্বারা দেশছাড়া-সহ এহেন অভ্যাচর নেই যা তার ওপরে আরোপ করা হয়নি।

[১] তাফসির ইবনু আবি হাতিম: ১৪৫৬২; ফাতহতুল বারি, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৪২১; সহিহ ইবনু বিবান : ২৮৯৮; সিলসিলাত্তুল আহাদি সিস সহিয়াহ : ১৭

এই যে নবি-রাসূলদের জীবনে আরোপিত সমস্যা, নেমে আসা বিপদ, নিষ্ঠিত হওয়া সংকট—এসব কেন ছিল? তারা তো নিষ্পাপ ছিলেন। কেনো পাপ, কেনো অন্যায় তাদের স্পৰ্শ করতে পারত না। তারপরও কেন তাদের জীবন ছিল দুর্ভোগময়? কেন তাদের মুখ্যমুখি হতে হয়েছে সবচেয়ে কঠিন সব পরীক্ষার? এগুলো এজনেই যে আজ্ঞাহ তাদেরও পরীক্ষা করেছেন। বিপদের মধ্যে, সংকটের সামনে তারা আজ্ঞাহর ওপর কথানি ভরসা করেন তা-ই ছিল দেখার বিষয়।

আমাদের শেখানোর জনাই আজ্ঞাহ সুবহানাখু ওয়া তাআলা নবি-রাসূলদের জীবন থেকে এই ঘটনাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কঠিন, দুর্ভোগ-দুর্যোগ আর সংকটের সময়ে তারা আজ্ঞাহকে বীভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই কুরআনুক কারিমে এই ঘটনাগুলোকে তিনি স্থান দিয়েছেন।

আমাদের জীবনেও এ রকম নানান পরীক্ষা নেমে আসতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে। জীবনের এ রকম মুহূর্তগুলোকে আজ্ঞাহর পরীক্ষা হিশেবে বরণ করে নেওয়াই হলো একজন প্রকৃত মুন্মনের কাজ।

[৩]

আমরা জেনে গেছি কেন আমাদের জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে। কেন চারপাশ থেকে বিপদ আমাদের আটেপ্টেট ধরে। কেন ঝুঁট করে আমরা প্রিয়জন, প্রিয়মুখ হারিয়ে ফেলি। কেন হতাশা প্রাপ করে ফেলে আমাদের অন্তর। এই জীবন হলো পরীক্ষাক্ষেত্র আর আমরা সবাই হলাম পরীক্ষার্থী।

তাহলে জীবন যখন এ রকম দুঃখ আর কটের ভাবে নুহিয়ে পড়বে, যখন হৃদয় আকাশে ভর করবে কালাবোশের ঘনকালো মেঘ, যখন হতাশার অর্ধকারে ডুবে যাবে আমাদের তনুমন, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

আপনার যখন বড় কেনো রোগ হবে, চারপাশ থেকে যখন কেবল হতাশা আর নিরাশার বালী শুনতে পাবেন, যখন শূলাতা ভর করবে আপনার দেহমনে, তখন আইয়ুব আলাইহিস সালামের ঘটনা মনে করবেন। মরণব্যাধি শরীর নিয়েও আজ্ঞাহর স্মরণ থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্য গাঢ়িল হননি। যখন আজ্ঞার আজ্ঞায়রাও তাকে ছেড়ে চলে গেল, তিনি হতাশ হননি। এমন মুহূর্তে তিনি কেবল আজ্ঞাহর কাছেই সাহায্য চেয়েছেন। বলেছেন—

أَنِّي مُسْتَغْبَطٌ بِالصَّرْرٍ وَأَنِّي أَرْجُمُ الرَّاجِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক, দুঃখক্রেশ আমাকে স্পর্শ করেছে। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু!\*)

খেয়াল করুন, আইয়ুব আলাইহিস সালামের কথার মধ্যে কিন্তু কেনো অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই। নেই কেনো আভাস্তরিত। কেবল আছে বিনয় আর ভরসার অনন্য সময়। তিনি বলেননি, ‘হে আজ্ঞাহ, আমি কট পাইছি। আমার কট কমিয়ে দিন।’ তিনি বলতে পারতেন, ‘মাবুদ! রোগের কারণে আমি দীনের দাওয়াত দিতে পারছি না। আমাকে আপনি আরোগ্য দিন।’ তিনি এ রকম বলেননি। তিনি কেবল আজ্ঞাহর সেই গুণের দ্বারা তাঁর প্রশংসন করেছেন, যে গুণের উরেখ কুরআনের একেবারে প্রথম সুরাতেই আমরা দেখতে পাই। আইয়ুব আলাইহিস সালাম বলেছেন, ‘আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ আজ্ঞাহর সিয়াত তথা গুণের মধ্যে অন্যতম গুণ হচ্ছে—আজ্ঞাহ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তার চাইতে বড় দয়ালু আসমান-জিনে আর কেউ নেই। সূরা ফাতিহার শুরুতেই আমরা এই ঘোষণা দিয়ে থাকি। আমরা বলি, ‘আর রাহমানির রাহিম’ অর্থাৎ ‘যিনি হলেন পরম করুণাময় আর অসীম দয়ালু।’

আইয়ুব আলাইহিস সালাম অভিযোগ না করে বরং আবদার করেছেন। একজন দস তার মালিকের কাছে যে সুরে আবদার করে, যে সুরে অনুসূয়া-বিনয় করে, নবি আইয়ুব আলাইহিস সালামও ঠিক একইভাবে তার মালিক আজ্ঞাহ সুবহানাখু ওয়া তাআলার কাছে আবদার করেছেন। সে আবদারে ভালোবাসা ছিল, ভরসা ছিল। নির্ভরতা ছিল।

আইয়ুব আলাইহিস সালামের এই আকৃল ফরিয়াদের পরে আজ্ঞাহ সুবহানাখু ওয়া তাআলা তার দুআ করুল করে নিলেন। তার দুঃখ মুছে দিলেন। রোগ সারিয়ে দিলেন। আজ্ঞাহ বললেন—

فَاسْتَجْبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا عَمَّا يَعْمَلُ مِنْ شَرٍ

অতঃপর, আমি তার আহানে সাড়া দিলাম এবং তার সব দুঃখকট দূর করে দিলাম।\*)

[১] সূরা আধিয়া, আয়াত : ৮৩

[২] সূরা আধিয়া, আয়াত : ৮৪

যে আজ্ঞাহ আইনুব আলাইহিস সালামকে আরোগ্য দিয়েছেন, তিনি কি আশাক্ষেত্রে  
আরোগ্য দিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। কেবল আপনার অস্তরটাকে আইনু-  
আজ্ঞাহর প্রতি ওই নির্ভরতা রাখুন, যে নির্ভরতা আইনুব আলাইহিস সালাম  
অস্তরে ছিল। এরপর আজ্ঞাহর কাছে আকুল ফরিয়াদ করুন। মন খুলে আপনার কথা  
আপনার রকমে শেওনা।

বড় কোনো বিপদে পড়ে গেলে একদম হতাশ হবেন না। ভেঙে পড়বেন না। আপনার  
ওপর আরোপিত বিপদ নিশ্চয়ই ইউনুস আলাইহিস সালামের বিপদের চেয়ে সুরক্ষিত।  
সুরক্ষণ করুন ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা। সুরক্ষের মাঝ যখন তাকে শিলে ঢেকে,  
কেমন সংকটাপন্ন হিল সেই মুহূর্তগুলো? চারদিকে কেবল অধিকার আর অধিকার। এই  
ড্রামের ভেতরে চাপা পড়েছেই যেখানে আমাদের দম বৰ হয়ে আসবে, সেখানে এই  
মাছের পেটে তিনি বৈচে থাকলেন কীভাবে? কে তাকে বাটিয়ে রাখলেন? আজ্ঞাহ জান  
কার ক্ষমতা আছে মাছের পেটে নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্ম আরিজেন পায়ে।

আপনি কি জানেন এ রকম বিপদে পড়ে নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম কেমন প্রতিক্রিয়া  
দেখিয়েছিলেন? তিনি কি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন? ভেঙে পড়েছিলেন? নিশ্চিত মৃত্যু  
জেনে হাত-পা গঁটিয়ে বসে ছিলেন? তিনি কি আজ্ঞাহকে বলেছেন, ‘আজ্ঞাহ, আমার  
তো নবি হিশেবে পাঠিয়েছেন আপনি। আমি তো আশানাই কাজ করি। তাহে আম  
ওপরে কেন এই বিপদ নেমে এলো? কেন এত কঠিন শাস্তি আমার জন্ম?’

নাহ। তার প্রতিক্রিয়া এ রকম ছিল না। মাছের পেটে বন্দি হওয়ার পরেও তিনি এক  
মুহূর্তের জন্ম আজ্ঞাহর ওপর থেকে ভরসা হারাননি। ভেঙে পড়েননি। আশা হচ্ছে  
দেননি। তিনি খুব সুন্দর পথায় আজ্ঞাহর ওপর ভরসা করেছিলেন। মাছের পেটে  
বন্দি হওয়ার পরে তিনি যে দুআটি পড়েছিলেন, সেটাকে আজ্ঞাহ তাআসা কুরআনে  
স্থান দিয়েছেন। সেই দুআ কমবেশি আমরা সবলেই জানি।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ الظَّالِمِينَ

লা ইলাহা ইলা আনতা সুবহানাকা ইমি কুলু মিনায-হাসিমীন।

বেশ অস্তুত রকম সুন্দর এই দুআটি! সাধারণত বিপদে পড়লে আমরা খুব দার্শন  
যাই, নার্ভাস হয়ে পড়ি। হংসন্দন বেড়ে যায়, দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ি। অথচ ইউনুস

আলাইহিস সালামের বিপদের তুলনায় আমাদের বিপদ তো কিছুই না। সমুদ্রের  
রাঙ্কস মাঝের প্রেটের ভেতরে তলে যাওয়ার মতন সংকট পর্যবেক্ষণে আর কী হতে  
পারে। এমন অবস্থায় প্রতিত হয়েও আজ্ঞাহর নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম যে  
বৈর আর ঈমানের প্রমাণ দিয়েছেন তা অবিশ্বাস্য।

এ রকম ঘোরত বিপদের সময়েও তিনি একত্বাদের আজ্ঞান ডুলে যাননি। তিনি  
বলেছেন, ‘লা ইলাহা ইলা আনতা’—আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।  
কঠিন বিপদ। চারদিকে ঘনকালো অধিকার। কোথাও আলোর লেশমাত্র নেই। এমন  
অবস্থাতেও তিনি বললেন, ‘ওগো মাবুল! তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই,  
যে আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে। কারও ক্ষমতা নেই আমাকে এখান  
থেকে বাঁচিয়ে নেওয়ার।’

সুন্দর মধ্যে এই কথাটা বলে শুন্তেই তিনি ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীক্ষিত্বাই প্রদান  
করেছেন। জগতের সকল অসুত মাবুল, অসত্য ইলাহার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে  
ব্যক্তিগত কথা। নিকবকালো অধিকারের মধ্যে নিজের হাত নিজেকে দেখতে  
পাচ্ছেন না। মৃত্যু একেবারে সম্ভিক্ত। এমন অবস্থাতেও তিনি আজ্ঞাহর গুণগান  
গেয়ে বলেছেন, ‘হে আমার রব! আপনি তো পবিত্র।’

কোনো বিপদে পড়লে আমরা তো ফরয সালাতটুকু পর্যন্ত কায়া করে ফেলি।  
আজ্ঞাহর গুণগান গাওয়া তো দ্রুরের কথা। কিন্তু দেখুন, এমন ঘোরত বিপদেও নবি  
ইউনুস আলাইহিস সালাম আজ্ঞাহ সুবহানান্ত ওয়া তাআলার প্রশংসা, তাঁর স্তুতি,  
তাঁর ধিকির করতে ভোলেননি।

এর পরের অংশে আজ্ঞাহর নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম বলেছেন, ইমি কুস্তু  
মিনায-হাসিমীন। অর্থাৎ নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।

বিপদে পড়লে আমরা সাধারণত হাঁ-হুতাশ করি। বিলাপ করি আর বলি, ‘কী এমন  
অপরাধ করেছি যে, আজ্ঞাহ আমার সাথে এমনটা করছেন? কেন আমাকে এভাবে  
কঠ দিচ্ছেন? Why always me? Why?’

অথচ, আজ্ঞাহর নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের সে রকম কেনো অভিযোগ, অনুযোগ বা আপত্তি ছিল না। তিনি অভিযোগের সুরে বলেননি, ‘ওগো আজ্ঞাহ, কেন আপনি আমাকে এ রকম কঠিন বিপদে নিপত্তি করলেন? কী ছিল আজ্ঞাহ অপরাধ?’ বরং তিনি বলেছেন, ‘হে আমার প্রতিপালক, আপনি হলেন পবিত্র! আর আমি হলাম জালিম। আমিই অন্যায় করেছি। সব দোষ আমার’।<sup>[১]</sup>

তিনি দোষ স্মীকার করলেন। নিজের অন্যায় মাথা পেতে নিলেন। তবে তার আগে আজ্ঞাহ সুবহান্ন ওয়া তাআলাকে সকল দোষ, সকল ত্রুটি আর সকল আত্মির উপর ঘোষণা করলেন। প্রতিউত্তরে আজ্ঞাহ বললেন—

فَسَخَّنَا لَهُ رَبِيعَتْهُ مِنَ الْحَمْ رَجَلَكَ نَجِيَ الْمُرْمَنِينَ

অতঃপর আমি তার সেই আহানে শাড়া দিলাম এবং তাকে দুঃস্থিতা থেকে মুক্তি দিলাম। এভাবেই আমি মুমিনদের রক্ষা করি।<sup>[২]</sup>

বিপদে পড়লে আমাদের উচিত ধৈর্যধারণ করা। আজ্ঞাহর প্রতি অভিযোগ না এমন নিজের ভুল স্মীকার করা। এরপর সর্বোক্তুম উপায়ে আজ্ঞাহর কাছে দুআ করা।

কুরআনে নবি-রাসুলদের এ রকম আরও বেশ কিছু দুআ আছে যেখানে তাদের সর্বোচ্চ ধৈর্য, তাকওয়া আর ঝীমানের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপদের সময় তারা কথনো ভেঙে পড়তেন না। নিরাশ হতেন না। জীবনে বিপদ আপনের সম্মুখীন হলে আমাদেরও উচিত ভেঙে না পড়া। আজ্ঞাহর ওপর তাওয়াকুল করা। বেশি বেশি আজ্ঞাহকে স্মরণ করা। কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া। বিশ্বাস করা যে, আজ্ঞাহ অবশ্যই আমাদের দুআ শোনেন এবং তিনি অবশ্যই আমাদের রক্ষা করবেন।



## বলো, সুখ কোথা পাই

[ক]

সুখ কী?—এই প্রশ্নটা মানুষের সুপ্রাচীনকালের। সুখের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে কতগুলি মুখের তথ্য আর তত্ত্ব মানুষ যুগে যুগে দাঁড় করিয়েছে তার কেনো ইয়ন্তা নেই। রকমের তথ্য আর তত্ত্ব মানুষ যুগে যুগে দাঁড় করিয়েছে তার কেনো ইয়ন্তা নেই। কখনো সুখকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য মানুষ কখনো আশ্রয় নিয়েছে, দর্শনের, কখনো বিজ্ঞানের। কখনো সে বন্ধুবদের চৰকচিকাময় বিলাসিতাকেই মনে করেছে সুখের অন্তর্নিহিত রহস্য। আবার কেবল একটু একটার মাঝে নিজেকে সৈপে দেওয়ার মহোর দ্বারে নিয়েছে সুখ। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সুখ আসলে কী?

আধুনিক বিজ্ঞান যখন তরতুর করে এগিয়ে যাচ্ছে, রহস্যাবৃত জিনিসগুলো যখন মানুষ জ্ঞেন নিজে একের পর এক, যখন শহরগুলো ভরে উঠছে ইট-পাথরের ইয়াগতে, যখন বন-জঙ্গল উধাও হয়ে কল-কারখানায় ছেয়ে যাচ্ছে বিরাম ভূমি, তখন একদল লোক এসে আমাদের জানাল—সুখ আসলে ভোগে। এই দুনিয়াকে উপভোগ করার মধ্যেই আছে সুখ। যার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, যশ-খ্যাতি আছে, আছে আমোদ-ফুর্তির জন্য বর্ণিত সকল আয়োজনের সামর্থ্য—জগতে সে-ই হলো সুর্খি। তারা হ্যামিলনের বাণিজ্যকের মতো আমাদের এমন পার্থিব সুবের দিকে আহিন করতে লাগল। তাদের বাণিজ্য মধ্যে সুরে দুলে উঠল আমাদের মন। তারা আমাদের নোঝাতে সক্ষম হলো যে, এই জীবনটাই শেষ। মৃতুই সবকিছুর সমাপ্তি। এরপর আর কিছু নেই, কিছু না। কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। সুতরাং, এই জীবনকে যে যত বেশি উপভোগ করতে পারবে, সে তত বেশি সুবী মান্য।

[১] ধারণাটি শাহিদ উমার সুলাইয়ানের *In the darkest night* স্কেচের থেকে পাওয়া।

[২] সুরা আধিয়া, আয়াত : ৮৮

আমরা শুনলাম। এবপর সুধী মানুষ হবার জন্য নেমে পড়লাম একটা কৃতি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা বড় হবার প্রতিযোগিতা। কাকে ছড়িয়ে কে বড় হব। কাকে ছপিয়ে কে এগিয়ে যাব। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হচ্ছে কাড়ি কাড়ি টাকায় আমাদের বাংক ভরতি থাকতে হবে। আমর নিষ্ঠ পাতি থাকতে হবে, বাতি থাকতে হবে। আমাকে তৈরিক সুখ দেওয়ার জন্য একল সুন্দরী অব দ্য টাউন', পত্রিকার 'টক অব দ্য ডে'। আমাকে নিয়ে ফিচার হবে, প্রদর্শন রমশী থাকতে হবে। যশ-খাতি তো অবশ্যই থাকা চাই। মিডিয়াতে আম 'টক হবে। আমাকে একনজর দেখার জন্য, আমার একটা অটোগ্রাফের জন্য মানুষ দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকবে, তবেই-না আমি সুধী মানুষ।

কর্পোরেট দুনিয়ায় খ্যাতি সরবিক্ষু। যার খ্যাতি নেই, সে সুধী নয়। সুধী হতে হলে তাকে খ্যাতি অর্জন করতে হবে। কিছুদিন আগে একটা গুঁজন চাউর হয়েছিল জোরশোরেই। হলিউডের এক অভিনেত্রী তার যৌন হয়রানির বিবৃত্যে সোচার হয়। অভিনয় ঝগড়ে 'খাতির' জন্য তাকে পর্দার পেছনের এবং সামানের পুরুষদের বিছানায় সজা দিতে হয়েছে। হতে হয়েছে অনেকগুলো পুরুষের উপভোগের বস্তু। খাতির তাড়না আর মোহে অব এই অভিনেত্রী হামিলনের সেই বৎশীরাদকদের সুরে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছিল। ভেটেছিল, এবং বুঝি সুখ। এতেই বুবি জীবনের সকল প্রাপ্তি। সেই প্রাপ্তি আর মুখ্যভাবের অশ্রয় বিলিয়েছে নিজের সর্বস্ব। হয়েছে পুরুষদের বিছানার সামগ্রী। যখন তার হৃষি ফিরল, যখন বুঝতে পারল যে, এটা আসলে সুখ নয়, মরাচিকা—তখন সে সোচার হলো, প্রতিবাদ জানাল। টুইটারে লিখল—'If you've been sexually harassed or assaulted, write 'me too' as a reply to this tweet'. সেখা গেল, এই টুইটারের প্রতিউত্তরে হাজার হাজার টুইট আসতে লাগল। সুপ্রিম বিলিউড আর হলিউডের হাজার হাজার অভিনেত্রী সেই টুইটের সাথে একাত্মতা দোকান করে 'Me Too' লিখে প্রতিবাদ জানাল। অর্ধাং তারাও তাদের সেই 'সুখের' দুনিয়ায় কোনো-না-কোনভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার। যেই খ্যাতি আর দুনিয়ায় কোনো-না-কোনভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার। যেই খ্যাতি আর সুখের জন্য মেয়েগুলো নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিল পার্থিবতা লাভের মধ্যে, সেই সুখ অর্জন করতে গিয়ে নিজেকে বিকিয়ে বসা সেই অভিনেত্রীর বুরোজি, চোখ ধীমানো এই কর্পোরেট দুনিয়া আসলে আস্ত একথণ্ড নরক।

মিডিয়া আমাদের সামনে যাদেরকে সুধী হিসেবে উপস্থাপন করে, মাঝে মাঝে আমরা তাদের কিছু করুণ পরিণতির গর্জ শুনি। লিনকিন পার্কের সেই বিখ্যাত গায়কের কথা মনে আছে? অসম্ভব খাতিতে রাঙ্গলো ছিল যার ক্যারিয়ার কী পদানি লোকের জীবনে? টাকা, প্লামার, চাকচিক্যাম জীবন! সবকিছু! তবু কেন তাকে আবৃহত্যা করতে হলো? এই তো সেনিয়ন শুনলাম পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কমিউনি প্লো 'রিয়াকেল'-এর সঞ্চালন মীর আবৃহত্যা করতে চেয়েছেন। একবার কিংবা দুবার ন্যা, এই পর্যন্ত চার-চারবার নাকি আবৃহত্যনের পথে পা বাঢ়িয়েছিলেন মীর। জী অৱত, তাই না? বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদের যা দিয়ে সুধী করতে চায়, যা ন্যা। জী অৱত, তাই না? বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদের যা দিয়ে সুধী করতে চায়, যা ন্যা। নাতে সুধী হতে বলে তার সবচাই তো এদের আছে। তবু এরা কেন যেন সুধী নয়। এদের জীবনের কোথাও সেন অসুধী হবার ভীষণ অসুখ।

কয়েকদিন আগে বিলিউডের এক উত্তি নার্সিকার ঘটনায় সুখের ছিল সোশ্যাল মিডিয়া অভিনয় জীবনের শুরুতেই তাক লাগিয়ে দেওয়া এই নায়িকা জানিয়েছেন তিনি ভালো নেই। তার খ্যাতি, বিস্তৈত্বের কিংবা কর্পোরেট সুখতার কোনো অভাব নেই। তবু কোথাও সেন তিনি শাস্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। সবকিছু থেকেও তার মনে হয় দেন কোথাও আসলে কিছু নেই।

লিনকিন পার্কের সেই গায়ক, মীরাকেলে মীর কিংবা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খ্যাতি লাভ করা সেই নায়িকা—তারা কি আদো সুধী? আদো কি তারা তৃষ্ণ? সন্তুষ্ট? আদতে সুখের মূল হচ্ছে সন্তুষ্টি। পরিভৃত্পি। আপনি যখন কোনো কিছু পেয়ে সন্তুষ্ট হবেন না, তৃষ্ণ হবেন না, তখন আপনার মধ্যে একধরনের অস্থিরতা কাজ করবে। যা পেয়েছেন তারচেয়ে বেশি কীভাবে অর্জন করা যায়—সেই নেশা আপনাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়াবে। আপনি ঘুমের মধ্যেও অস্থির থাকবেন। ঘুম ভাঙলেই আপনার খ্যাতি আর অর্জনের পেছনে সোডাতে মন চাইবে। সুখ তাহলে কোথায়?

খালি টাকা আর খ্যাতিই যদি সুখের নিয়ামক হতো, ফেইসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ হতো পৃথিবীর সেরা পাঁচজন সুধী মানুষের একজন। সবচেয়ে কম বয়সে বিলিউডের বনে যাওয়া মার্ক জাকারবার্গ বি অসলেই সুধী? তার রয়েছে অসম্ভব রকম খ্যাতি আর বিস্ত। তবে তাতেই যে সে সন্তুষ্ট তা কিন্তু নয়। অন্য আর এই অর্জনও অর্জন, আরও পাওয়ার জন্য যা করা দরকার এই ধরনের লোকগুলো

তার সবটাই করতে পারে। জাকারবার্সও করে। এই তো সেদিন জাকারবার্সও মার্কিন আদালতের মুখোয়াবি হতে হলো। তার বিশ্বস্ত অভিযোগ উচ্চে সে নথি আমেরিকার গত নির্বাচনের সময় মার্কিন ইউজিনের তথ্য কাস করেছে সে নথি খার্ড পার্টির কাছে। এই কাসটির জন্য সে নিশ্চয়ই বিশাল অক্ষেত্রে বাতেল পেয়েছে। কিন্তু, দিনশেষে কী মিল ভাবে? ভঙ্গিমা! আর মুখোয়াবি হতে হচ্ছে সে নথি। এই যে লোভ, এই যে আরও পাওয়া, আরও বড় হওয়ার এক অস্থির প্রতিযোগিতা, এটা মানুষকে নেতৃত্বাত্মক পক্ষে করে দেয়। সে যখন লোত আর লালসার ঘূঢ়ে ঘূঢ়ে যায়, ভালোমন্দের তফাঁ নির্ধয় করা তার পক্ষে আর সহজ হয় না।

[গ]

কর্পোরেট দুনিয়ার কঠিত সুখের পেছনে ছাঁটতে শিয়ে হতোদাম হয়ে যাওয়া মানুষের এ রকম আরও অনেক গল্প নেলো থেকে শেখাব বিষয় হলো এই—সুখ আসলে শারীরিক নয়, আধিক। আজ্ঞার পরিপূর্ণিমা হলো সুখের কারণ। আমাদের না পারি, তাহলে আমাদের সুখী হওয়াটা একটা নিষ্ক অভিনয় মাত্র। সুখ নয়।

সুখের ব্যাপারে কুরআনের আলাদা ভাষ্য রয়েছে। কুরআন সুখকে অর্থ, বিষ হিসেবে দুনিয়ার চাকচিক দ্বারা সাজায়িত করেনি; বরং কুরআন সুখ বলতে বুঝিয়েছে আল্লাহর নিকট নিজেকে একস্ত সৈপে দেওয়াকে। সুখ মানে হলো অস্তরের প্রশান্তি। অস্তরের স্থিরতা। অস্তর যখন প্রশান্ত, প্রফুল্ল থাকে, তখন একজন মানুষ সুস্থি হয়। যদি অস্তর বিয়াদপ্রস্ত থাকে, অস্তরে যদি তর করে দুর্ঘের কালো সেৱ, তাহলে একজন মানুষের জীবনটা দুঃখ, কর্ট আর হতাশায় পর্যবেক্ষিত হয়। আরবিতে ‘সাকিন’ মানে হলো অস্তরের প্রশান্তি। কুরআনের যত জায়গায় এই ‘সাকিন’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সবসবে আমরা ভয়াবহ বিপদ, দুর্বোগ কিংবা দুর্ভোগের ঘনঘটা দেখতে পাই। তবে, সাথে সাথে দেখতে পাই আল্লাহর ওপর ভরসা, তার কাছে নিবেদিত, সমর্পিত কিছু আনন্দের নির্দশন। কুরআন বুঝিয়েছে এটাই সুখ। কুরআনের ভাষ্য এটাই অস্তরের প্রশান্তি।

নিবিজি সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন, আর আল্লাহ তার হৃদয়ে তেলে দিয়েছেন প্রশান্তির ফলধারা। সেই প্রশান্তির সামনে দুনিয়ার যেকোনো বিপদ নথি, তুচ্ছ। জীবনের এই যে দুঃসময়, দুর্বোগ আর দুর্ভোগের মৃহুৎ, এই মৃহুৎসূলোতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সৈপে দেওয়ার মাঝেই রয়েছে পরিপূর্ণ তৃষ্ণি। সুখ প্রশান্তি। আজকাল মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছেড়ে এমন সব বিদ্যমান সুখের সম্মানে ব্যস্ত, যেখানে আদতে মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নেই।

বলো, সুখ কোথা পাই

তাজ করছে একদল কুরাইশ বাহিনী। হাঁটতে হাঁটতে নবিজি সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম এবং আবু বকর রায়িয়ালাহু আলাইহি একটা গৃহের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। ওদিকে, কুরাইশ বাহিনীও একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে তারা এস্তাই নিকটবর্তী হয়ে নিয়েছিল যে, কোনো কুরাইশ সৈন্য যদি নিজের পায়ের দিকে তাকাত, তাহলেই নবিজি সালালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম এবং আবু বকর রায়িয়ালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বকর রায়িয়ালাহু আলাইহি ওয়া সালাম নবিজির সাথি আবু পড়ে যাতেন। অবস্থা এমন বেগতিক দেখে ঘৰবড়ে গেলেন নবিজির সাথি আবু বকর রায়িয়ালাহু আলাইহি ওয়া সালাম। ‘চিঙ্গ করো না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন!’

শুধু একেবারে নাকের ডগায়। একটু এদিক-সেদিক হলে ধূরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা শতভাগ। আর ধূরা পড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু। এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আবু বকর রায়িয়ালাহু আলাইহি যেখানে অস্থির-অশাস্ত্র, সেখানে নবিজি সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম পরম নিঞ্জরত্যা বললেন, ‘চিঙ্গ করো না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।’ আল্লাহর ওপর এই যে নিঞ্জরতা, এই যে তাওয়াকুল, কুরআন এটাকেই ‘সুখ’, এটাকেই ‘অস্তরের প্রশান্তি’ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ, ওয়া তাজালা এই ঘটনাকে ক্ষেত্র করে কুরআনে বলেছেন—

إذْ هُنَّا فِي الْفَارِدِ يَنْهَاوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَنْعَلُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

বখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি শুহুর অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, ‘তুমি চিঙ্গ করো না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।’  
অতঃপর আল্লাহ তার অস্তরে প্রশান্তি দান করলেন।<sup>(১)</sup>

নবিজি সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন, আর আল্লাহ তার হৃদয়ে তেলে দিয়েছেন প্রশান্তির ফলধারা। সেই প্রশান্তির সামনে দুনিয়ার যেকোনো বিপদ নথি, তুচ্ছ। জীবনের এই যে দুঃসময়, দুর্বোগ আর দুর্ভোগের মৃহুৎ, এই মৃহুৎসূলোতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সৈপে দেওয়ার মাঝেই রয়েছে পরিপূর্ণ তৃষ্ণি। সুখ প্রশান্তি। আজকাল মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছেড়ে এমন সব বিদ্যমান সুখের সম্মানে ব্যস্ত, যেখানে আদতে মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নেই।

(১) সূরা তাবুক, আয়াত : ৪০

[ঘ]

সুখ কীসে—এই প্রকটা মানব-ইতিহাসের আদিমতম প্রশংসনোর একটা। মানব তা সমাজবিদ এই প্রশংসের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং বিজালী, দর্শনিক, ফিল্মের আমাদের সেই বক্তব্যদী দুনিয়ার দিকে তেকে চলেন নিরন্তর। বিষ্ণু, সবচাই শুনে দুনিয়াই যদি সুখের আকড়া হবে, কেন আমরা সেই দুনিয়ার কৃষ্ণ আর্তিকার শুনে প্রতিনিয়ত? কেন সেই দুনিয়া থেকে চাপা কামার শুরু আমাদের কানে এসে বাজে কেন সেই দুনিয়ার সবচেয়ে সুরী মানুষগুলো বেছে নেয় আজ্ঞানের পথ?

আগেই বলেছি, বক্তব্যদী দুনিয়ার চোখ ধীধানো এসব আয়োজনে সুখ নেই। এয়েল পেছনে দৌড়ানো। সুখ আসলে কোথায়—এই প্রশংসের সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে ঘোষিক উত্তরটা এসেছে আজ্ঞাহর রাসূল সালিমাছান্ন আলইহি ওয়া সালামের কানে থেকে। তিনি বলেছেন—

মানুষের শরীরে এমন একটি মাংসপিণ্ড আছে যেটা সুস্থ থাকলে মানুষের সরীরে সুস্থ থাকে। আবার যেটা অসুস্থ হলে মানুষের সরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর তা হলো অস্তর।<sup>[১]</sup>

কেন সেই মাংসপিণ্ড? সেটা হলো অস্তর। অস্তর যদি সুস্থ থাকে, সতেজ থাকে, তাতে যদি ভর না করে কোনো আভাপ্রবণনা, তাহলে সেই মানুষটা সুরী। আবার যার হয় আজ্ঞাপ্রবণনায় লিপ্ত, সে যতই সুরী হওয়ার ভাব করুক, সেটা দিনশেষে ক্ষেত্র অভিযান।

বিখ্যাত ‘Yes!’ Magazine একবার সুরী হওয়ার কিছু বিজ্ঞানভিক উপর নিয়ে ফিচার করেছিল। সুরী হওয়ার জন্য তারা যে কয়েকটা উপর্যোগ কারণ চিহ্নিত করেছিল তার মধ্যে একটা হলো—তুলনা এভিয়ে চলা। অর্থাৎ একজন দিনদিন ধৰ্ম থেকে ধৰ্মী হচ্ছে বলেই যে আমাকেও ধৰ্মী হতে হবে, এ রকম মানসিকতা এভিয়ে চলা। বরঝ নিজেকে নিয়ে, নিজের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

[১] সহিত বৃথাপি : ৫২; সহিত মুদ্রণ : ১৫৯৯

বলো, সুখ কোথা পাই

কৃত্যান্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের বক টিক সেই পথই বাঠালে দিয়েছেন যা আজকের দর্শনিকেরা সুরী হওয়ার জন্য নিয়ামক বানাচ্ছেন।  
আজ্ঞাহ সুবহানাছু ওয়া তাআলা বলছেন—

وَلَا تَنْدَنْ عَيْنِكَ إِلَى مَا تَمْغَفِلُّ بِهِ أَرْوَاحًا بِمَمْلُوكٍ تَعْزِيزُ الْحَيَاةِ الْأَنْفَاثِ<sup>بِهِ</sup> بِعِزْمٍ يُرْبِقُ رَبَقَةَ حَرَقَةٍ وَلَرَقَةً

কখনোই সে-সমস্ত বস্তুর দিকে তাকাবেন না, যা আমি তাদের (দুনিয়াপূর্জানীদের) উপভোগের জন্য দিয়েছি। এসব দিয়ে আমি তাদের পরীক্ষা করি। বস্তুত, আপনার প্রতিপালকের দেওয়া বিষয়কই হলো সবচেয়ে

উত্তম ও সবচেয়ে বেশি স্থানী।<sup>[২]</sup>

আজকের দুনিয়ায় অসুরী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত এই দুনিয়াপূর্জাই। যানুর সম্পদের মোহে নিভোর। তার প্রতিবেশী দিনের পর দিন সম্পদের পাহাড় বানাছে বলে তাকেও মেভাবে হেব সম্পদশালী হতে হবে। তার কলিগের টয়োটা গ্রান্ডের গাড়ি আছে বলে তারও একটা টয়োটা ব্রান্ডের গাড়ি থাকতে হবে। তার বন্ধু iPhone 11 চালায় বলে তাকেও Iphone 11 ব্যবহার করতে হবে। এই যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতা মানুষকে আজ্ঞাহর রাস্তা থেকে বিচ্ছাত করে দেয়। আমরা হিঁকে পড়ি সত্যিকার সুখের রাস্তা থেকে, যে রাস্তায় আমাদের দেহ-মন প্রশান্তি লাভ করে। এজনেই আজ্ঞাহ সুবহানাছু ওয়া তাআলা আমাদের তুলনা এভিয়ে চলাতে বলেছেন। যারা দুনিয়াপূর্জয় মন্ত হয়ে আছে, তাদের দিকে ফিরে তাকাতে নিয়ে করেছেন এবং এও বলেছেন, কেবল তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে যা আজ্ঞাহ সুবহানাছু ওয়া তাআলা রিয়াক হিশেবে আমাদের দান করেছেন।

সুরী হবার জন্য Yes! Magazine-এর পরের উপায় হলো—‘Smile, even when you don't feel like it.’ অর্থাৎ হাসুন, এমনকি যখন দুঃখ ভর করে মনে, তখনো। যারা হাসতে পারে, তাদের প্রচণ্ড আশাবাদী মানুষ হিশেবে দেখা যা। তাদের মনের মধ্যে সবসময় একটা আশার আলো জ্বলজ্বল করে।

[১] সূরা ক-হ, আয়াত : ১০১

ରାସୁଲ ସାନ୍ଧାଗ୍ନାହୁ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ଧାମ ବଲେଛେ—

କୋଣୋ ଭାଲୋ କାଜକେଇ ଛୋଟ ମର୍ଦ୍ଦ  
ସାଥେ ହାସିମୁଖେ କଥା ବଲାଓ ତୁମ୍ହେ [୧]

জারিন ইবনু আবিদিল্লাহ আল-বাজলি রায়িয়াকাবুর আনন্দ বলেছেন, 'মেদিন থেকে  
আমি ইসলামে দাখিল হই, সেদিন থেকে এমন কোনোদিন নথিপ সাক্ষাৎ  
আলাইহি যো সাজামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েন যখন কোনো কথা

ଦୁଇଯାକୋଣେ ଯଦି ଆଶା ନା ଥାକେ, ଯଦି ମାନୁଷେର ପରମ ଏକଟା ଭାବରଙ୍ଗ ଥିଲା, ନିର୍ଭାବର କେନ୍ଦ୍ର ନା ଥାକେ, ତାହଳେ ମେ ମାନୁଷ ପଢ଼ୁ ହତାଶୀୟ ଡୂରେ ଥାବେ । ଆମରା ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୁଳତାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି, ତାହଳେ ନେବିଜିର ଝିଲ୍ଲିନି ଆମାଦେର ସାମନେ ଦେବତାଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ଉଦ୍‌ବହରଣ । ମାନୁଷଜୀବନେ ଏମନ କୋଣେ ବିପଦ ନେଇ, ଏମନ କୋଣେ ଦୂରୀଧି ଯେ ଯା ନିର୍ଭାବ ସାମାଜିକ ଅଳିଛି ଓ ଯା ସାମାଜିକ ଝିଲ୍ଲିନି ମେମେ ଆସନ୍ତି । ତନୁରି ତିନି ମରିଅ ଅନ୍ତରେ ମାନୁଷ ଛିଲେ । ତିନି କଥନେଇ ହତାଶ ହନିଲା । ତାର ଝିଲ୍ଲି ହିଲାଯଥିଲା, କର୍ମକଳ୍ପି

Yes! Magazine-এর সেই ফিচারে সুধী হোর উপায় হিসেবে আরও বলা হি-  
কৃতজ্ঞ হওয়া, দান করা, এমনকি টাকার পেছনে হয়ে হয়ে না ছাটাকেও তা-  
সুধী হওয়ার নিয়ামক হিসেবে উল্লেখ করেছিল। তারা বলেছিল, 'Put money  
low on your list of properties.'

ইসলামে কৃতজ্ঞ হওয়ার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। একজন মুমিনের পূর্ণ জীবনটির কৃতজ্ঞতার বাধনে বাঁধা। সে হাঁচি দিলে বলে—‘আল-হামদু লিল্লাহ’ অর্থাৎ ‘সব প্রশংসন আজ্ঞাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলামু’ আবার যখন সে জীবনে কোনো বিষ অর্জন করে, তখনে বলে ‘আল-হামদু লিল্লাহ’। যেকোনো মৃত্যু, যেকোনো পরিস্থিতিতে, হোক সুখের কিবা দুঃখের—একজন মুমিন সর্বদা আজ্ঞাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। এজনাই নববিজি সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছিলেন, ‘মুমিনের ব্যাপারটাই আশচর্মের। তার সকল বিষয়ই কল্যাণপর।’ সে যখন সুখ থাকে, তখন সে তার রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং এটা তার জন্য উত্তম। আবার, সে যখন বিষ

ବଳୋ, ସୁଖ କୋଆ ପାଇ

বলো, সুখ কোথা ?—  
তব এবং রবের কৃতজ্ঞতা জানায়।

দুর্ঘ-কটোর ভেতর দিয়ে যায়, তখন চৰি  
এটো কাৰ জন্ম উত্তম। [১]

দুনিয়নের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্ৰে তাৰ রংবের কৃতজ্ঞতাৰ ভৱা। আবিৰাতৰে অনন্ত  
জীবনের সুখৰ জন্ম দুনিয়াৰ জীবনে মহান আলাহৰ তাৰালাৰ অনুগ্রহ, তাৰ সমৃষ্টি  
এক সংস্কৰণেৰ পথে ইচ্ছতে পাৰাটাই সভিকাৰেৰ সুখ। হামিলনেৰ বংশীবাদকেৱাৰ  
আমাদেৰ মে অৰুত সুয়েৰ পথে ডাকে, সেই পথে আছে কেবল ধৈৰ্যক আৱ  
প্ৰতিষ্ঠা। কৰ্ণোৱে দুনিয়াৰ রঢ়িন চশমা পাৰে চোখেৰ সামনে দিয়ে তৰতৰ কৰেৱ  
আক্ৰম ছৰ্তে থাকা হাত-পাথৰেৰ কোঠারে সুখ লৈ। সুখ লৈই বস্তুবাদী মহলেৰ  
সঞ্জয় সংজ্ঞানিত 'বড় হওয়া' আৰা 'নাম কুড়ানোৰ' মাবে। এসব নিছকই  
চোৱাবলি। খাদেৰ কিনাৰায় পা ফসকালৈ যেৱল তলিয়ে যেতে হয় অতল গহৰে,  
ও দুনিয়া চিক তেমনই। পা ফসকালৈ বিপদ। কুৰআনেৰ ভাষায়—

وَمَا الْحَيَاةُ إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُوَ

এই দুনিয়ার জীবন নিষ্ক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।<sup>(১)</sup>

ଆପନାର ରବ ଜୀବାଚେହେ ଏହି ଦୁନିଆ ହଲୋ ନିଷକ ଖେଳ-ତାମଶାର କ୍ଷେତ୍ର। ଏକବେଳେ  
ହୋଇଥାଏ ଏକଟା କୁପ୍ତି ଏକଟା ଫାଁଦା ଏଥାମେ ଯା ସୁଖ ବଲେ ଧରା ହେଁ ତା ଆସିଲେ  
ମରିଗିଲା। ସୁଖ ତୋ ନିହିତ ଆହେ ମୁଣ୍ଡାର ଆନନ୍ଦାତ୍ୟେ। ଏହି କଟିନ ଏବଂ ଅଭିଯନ୍ତର ସତ୍ୟ  
ଯଥା ବୁଝାଇଛେ, ତାରାଇ ପରେଯେ ହେଲା ମୁଣ୍ଡାକାର ସୁଖରେ ମସଦିନ। ସୁଖ ତୋ କୃତଜ୍ଞତାର ଅଶ୍ରୁଠେ  
ସୁଖ ଆହେ ଆନନ୍ଦାତ୍ୟେ ମାଥା ନୋକାନୋତେ। ସୁଖ ଆହେ ବାନ୍ଦାର ନିରୀହ ଆକୁଳ ଫରିଯାଦେ।

[১] সহিত মুসলিম : ২০১৪

[२] सुरा आलाअम, आयात : १३

## জীবনের ইন্দুর-দৌড় কাহিনি

আমাদের জীবন যেন প্রতিযোগিতাময়। ধনসম্পদের প্রতিযোগিতা, টাকাপদক্ষ প্রতিযোগিতা, বাড়ি-গাড়ির প্রতিযোগিতা। আমরা প্রতিযোগিতা করি এবং অন্যান্য ছপিলে যাওয়ার, একে-অন্যের চেয়ে বড় হওয়ার, একে-অন্যের চেয়ে সুবেশ যাওয়ার। অমুকের ছেলে পরিষ্কার প্রথম হয়েছে, আমার ছেলে কেন হাত পালনা—এই নিয়ে আমাদের ভাবনার শেষ নেই। অমুকের মেয়ে সন্মৃত প্রতিযোগিতার সেরা পুরস্কার জিতেছে, আমার মেয়ে কেন বাছাই পর্খ হেকেই ছিটকে পাল়-স্টো নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমাদের রাতের ঘূম হারাম করে ফেলি। মোকাবৰ, আমরা একটা ‘Rat Race’-এর মধ্যে জীবন অভিবাহিত করি।

Rat Race-এর আকরিক অর্থ হাঁসু-ডোঁড়া কিন্তু প্রয়োগিক অর্থে Rat Race খেলতে বোঝায় বেশি বেশি সম্পদ এবং ক্ষমতা লাভের প্রতিমোটিত। নিজেরের জীবনের দিকে তাকালে আমরা অবাক বিশ্বায়ে লক্ষ করব যে, আমাদের জীবনটা কেনেন্টে কেনেভাবে এই Rat Race-এর আওতায় পড়ে গেছে। আমাদের দুর্ব চাই, অনেক টাকা। সেই টাকার পেছনে আমরা অবিভাব ছুটি চলি। আমাদের জীবনের নকশ উদ্দেশ্যই হলো এই টাকা। আমি বিনিএস কাঠার কেন হব? করণ, আমর তেজি সরকার চাকরি চাই। সরকারি চাকরি হলোই আমি ধরে নিতে পারি যে, আমর জীবনের নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেছে। তালো ক্ষেত্রের সামাজিক, তার সূযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। অফিসের গাড়ি পাওয়া যাবে। নিশিএ থাকলে এই বাড়িতে জুতে যেতে পারে। পড়াশোনা নিয়ে আমি বেশ তৎপর। করণ আমারে বিনিএস

জীবনের ইন্দুর-ডোড কাহিনি  
আমার কাজ হচ্ছে যখন আমার কাজের মানেই জীবন। জীবন মানেই  
বিনিয়োগ কাতার ইহো। জীবনের এই যে প্রবণতা, এটা হচ্ছে এক ধরনের Rat Race.  
কাজের কাজের হয়ে দেলে আমার প্রেরণানি থাকে প্রমোশন নিয়ে। আমার সাথে  
আমার কাজের সাথে আমার চেষ্টার সাথে দিয়েই তরতুর করে প্রমোশন  
পেতে এসিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যেখনে জিলাম ওখানেই ঠায় দাঢ়িয়ে আছি—  
বাণিজ্য আমিং টিক মেনে নিতে পারি না। আমাকেও প্রমোশন পেতে হবে। সেলিম  
সাহেবের মতো আমাকেও তরতুর করে ওপরে উঠতে হবে। এই ওপরে উঠার  
জন্য হচ্ছে ধরনের কাজ করা লাগে তা করতে আমি পদ্ধতি। বসের যত ধরনের  
কোর্সুরি, মোসাহেব করা লাগে করব। ঘূর্ণ দিতে হয় দেবো। তার বিনিময়ে  
আমার শুধু প্রমোশন চাই। একবার যদি প্রমোশন পেয়ে যাই, তাহলে এতদিন  
যখন আমাকে চিপ্পিব করা অস্বস্তি নোকগুলোকে একবার দেশেই ছড়ব। এই যে  
কৃত্তি পার্য্যাকরণ জন্য একটা অস্বীকৃতিযোগিতা—এটাও এক ধরনের Rat Race.  
অন্তকে ছেলে প্রথম হয়েছে, কিন্তু আমার সস্তান মেরিন লিস্টেই থাকতে পারছে  
না। আমার হচ্ছে আমি সেরা পজিশনে দেখতে চাই-ই চাই। তাহলে এখন কী  
করতে হবে? টিন-তিনজন টিচো যিয়ে ছেলেকে পড়াছি। ছেলের জীবনটাকে আমি  
শুধু, পঞ্চাশ টেলিভ আর খাটোর মধ্যে দৈর্ঘ্য ফেলেছি। ছেলেয় যাক তার মানসিক  
বিকাশ। আমি ওকে সেরাদের কাতারে দেখতে চাই, বাস। নাহলে ফ্লাবে আমার  
মানসভাবাই থাকে না। সস্তানসঙ্গে নিয়ে আমাদের এই যে প্রতিযোগিতা, এটা ও  
এক ধরনের Rat Race। সবখানে আমাদের শুধু 'চাই আর চাই'।

ମହାର ବ୍ୟାପାର ହଲେ, କୁରାନ୍ତେ ଏହି 'Rat Race' ଶିରୋନାମରେ ଏକଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞ ସୁରା ଥାଏଇ ଓଖନେ ଏହି ବ୍ୟାପାରଙ୍ଗଲେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଆଜ୍ଞାହ ସୁବହନାନ୍ତୁ ଓୟା ତାଆଲା ତୁଳେ ଧରେନେ ଆମାଦେର ଜନା । ଆମରା ଯେ ଅସୁଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଯା ଲିଙ୍ଗ ହସେ ଆମାଦେର ଜୀବିତରେ ଆମଲ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଥେବେ ବିଜ୍ଞାତ ହସେ ପଡ଼େଛି, ସେଇ ବ୍ୟାପାରଟା କୁରାନ୍ତା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କରେ ତୁଳେ ଧରେହେ ଏହି ସୁରାଯା । ସୁରାଟିର ନାମ ହଲେ 'ଆତ-ତାକାସୁର' । ତାକାସୁର ମନେ ପ୍ରତ୍ୟେରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ଏହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଟାକାପରସ୍ୟ ହତେ ପାରେ, ଧନସମ୍ପଦ ହତେ ପାରେ, ସମ୍ବନ୍ଧରୁକ୍ତି ହତେ ପାରେ । ଏମନକି ଚାକରି, କ୍ୟାରିଯାର, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଓ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥରୁକ୍ତି ସୁରା ନିମ୍ନଲିଙ୍ଗ—

① لَهُ كُلُّ الْحَكْمٍ

প্রাচুরের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভূলিয়ে রেখেছে

② حَتَّىٰ زُرْمُ الْقَابِرِ

যতক্ষণ না তোমরা করবে যাও

③ لَا سُوفَ تَعْلَمُونَ

মোটেই ঠিক নয়! শীঘ্রই তোমরা জানবে

④ لَمْ لَا سُوفَ تَعْلَمُونَ

আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়! তোমরা তো শীঘ্রই জানতে পারবে

⑤ لَوْلَا تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

কথনোই নয়! যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে পারতে

⑥ لَرَبُّ الْجِبَّامِ

তোমরা অবশ্যই জাহানাম প্রত্যক্ষ করবে

⑦ لَمْ لَرَبُّهَا عِنْ الْيَقِينِ

আবার বলি, তোমরা অবশ্যই দিবাদ্বিতীতে জাহানাম প্রত্যক্ষ করবে

⑧ لَمْ لَتَشَأْ يَوْمَيْنِ عَنِ الْعَيْمِ

— তোমরা আমার প্রদত্ত নিয়মত সম্পর্কে জিজিসিত হব

শুন্তেই খোল করি, আজ্ঞাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভূলিয়ে রেখেছে।’ প্রাচুর্য মানে কী? ধনসম্পদ, টাকাপঁয়সা, শ্রীস্বাস্তনসূচি, ক্ষমতা ইত্যাদি। এগুলো আমাদের ভূলিয়ে রেখেছে। গাফিল করে রেখেছে। কী হেকে? আধিগত হেকে। আমাদের জন্য অন্য একটা জগৎ অস্পেক্ট করে রেখেছে এবং সেখানে জীববিদ্বিতার একটি মৃষ্ট অপেক্ষা করে। আহ—এই বেথ থেকে প্রাচুর্য আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। ভূলিয়ে রেখেছে। এই আয়াতের শুরুতেই ‘আলহাকুম’ শব্দ আছে। মুহাসিনগণ এই আলহাকুম শব্দের অর্থ করেছেন এমন নামগাঁ জিনিস নিয়ে পাছে থাকা যা দামি কোনো জিনিসের বাপরে ভূলিয়ে রাখে। অর্থাৎ আলহাকুম হলো দামি জিনিস ফেলে রেখে নাগণ্য, তুচ্ছ জিনিসের পেছনে ছুটে বেড়ানো।<sup>[১]</sup> আমাদের জন্য আধিগত হলো দামি তুচ্ছ জিনিসের পেছনে ছুটে বেড়ানো। সেই পরম আরাধ্য জিনিস। দামি জাগে। জাগাত হলো আমাদের পরম আরাধ্য সুপ্র। সেই পরম আরাধ্য শুরুতে তুলে আমরা দুনিয়ার পেছনে দুর্নিয়ার ছুটে চলি। দুনিয়ার পেছনে ছুটতে আধিগতকে আমরা বেমালুম তুলে যাই। প্রাচুর্য আমাদের এমন অর্থ আর ছুটতে আধিগতকে আমরা বেমালুম তুলে যাই। প্রাচুর্যের এমন অর্থ আর বর্ষীর বানিয়ে রাখে যে, আমরা দামি জিনিসটিকে অস্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে পাই না।

পরের আয়াতেই আজ্ঞাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, ‘যতক্ষণ না তোমরা করবে যাব।’ শুবই সংঘাতিক অর্থে নিরেট বাস্তব একটি কথা। দুনিয়ার পেছনে নিরস্তর হৃষ্টতে হৃষ্টতে একদিন আমাদের সাথে সাক্ষাত হয় মৃত্যুর। মালাকুল মাউত এসে আমাদের বৃষ্টিকে দেহপিণ্ডের থেকে বের করে নিয়ে যায়। সাথে সাথে দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড় হয়ে পড়ে। আমরা হয়ে পড়ি অন্য জগতের বাসিন্দা। আমরা তখন অবক বিদ্যায়ে লক্ষ করি—সেই জিন জগতে দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা কাজ করে না। সেই জগতে আমার কোনো প্রভাব, কোনো ক্ষমতা খাটানোর সুযোগ নেই। দুনিয়ায় যে বাংক-বালেক, সম্পদের পাহাড় আমি গড়ে গিয়েছি, সেসবের কোনো মৃলাই ওখানে নেই। প্রাচুর্য লাভের নেশা যে আমাকে মৃত্য অবধি নেশাগ্রস্ত করে রাখে, সেই বাস্তবতার কথা তুলে ধরেই আজ্ঞাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, করবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই প্রাচুর্যের নেশা থেকে আমি বের হতে পারি না।

তৃতীয় আয়াতে আজ্ঞাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ‘মোটেই ঠিক নয়! শীঘ্রই তোমরা জানবে।’ আজ্ঞাহ আমাদের জানাচ্ছেন, আমরা যে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে

[১] অফসিয়ে আলুসি হৃষ্টব্য

ছুটতে হয়েন হয়ে যাছিঃ, ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, সেটা একটা মৌচিক শব্দ। এ দুনিয়ার মোহ আর মায়ার পেছনে অবিবাম ছুটে চলা যে আমাদের কোনো কাছে আসবে না তা আমরা খুব শীঘ্ৰই টের পাৰে।

চতুর্থ আয়তে বলছেন, ‘আবাৰ বলি, মোটেই ঠিক নয়। শীঘ্ৰই হোমো ইঞ্জিনের আবাসনতে পাৰবে।’

আজ্ঞাহ সুবহানাকু ওয়া তাআলা এই আয়তে আগেৰ আয়তেৰ বকলাবৃত্তি পুনৰাবৃত্তি কৱেছেন। যখন দেখে বড় ধৰনেৰ কোনো দুর্যোগ দেখা দেৱ, তখন আবহাওয়া মারাঘক রকমেৰ বৈৰী হয়ে গুঠে, তখন তিভিতে সংবাদ-উপস্থিতি বলেন, ‘সামাদেশে সাত নম্বৰ বিপদ সংকেত, আমি আবাৰও বলছি, সাত নম্বৰ বিপদ সংকেত দেখানো হচ্ছে।’ ‘সাত নম্বৰ বিপদ সংকেত’ কথাটা দুই-দুই উচ্চারণ কৱে উপস্থাপক আমাদেৰ আসন্ন বিপদেৰ মাজা উপলব্ধি কৱানোৰ জন্য কৱেন। এই আয়তে আজ্ঞাহ সুবহানাকু ওয়া তাআলাও ঠিক কঠিন এক বিশ্ব সম্পর্কে আমাদেৰ সতৰ্ক কৱাৰ জন্য একই কথা দুইবাৰ উচ্চারণ কৱে বিপদেৰ মুখ বুৰিয়েছেন। আয়তটি আমাদেৰ বলছে, ‘আবাৰ বলি! তোমোৰা যা কৱে গেজাই তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। শীঘ্ৰই বুৰাতে পাৰবে তোমোৰা কীসেৰ পেছনে ছুটে চলো।’

পঞ্চম আয়তে আজ্ঞাহ বলছেন, ‘কখনোই নয়! যদি তোমোৰ নিশ্চিত জন্তে অৰ্ধাং, যদি তোমোৰা দেখতে পেতে, তোমাদেৰ প্ৰাধান্য দেওয়া বিষয়গুলো কথা মূল্যায়ন, কৱাটা তুচ্ছ, তাহলে এতটা উদাসীনভাৱে দিন কঠাতে পাৰতে না মৃত্যুৰ পৱে তোমাদেৰ ধনসম্পদ, তোমাদেৰ ক্ষমতা, তোমাদেৰ শ্ৰী-সন্তুষ্টি যে কোনো কাজেই আসবে না, সেটা যদি উপলব্ধি কৱতে পাৰতে, তাহলে এইব্য মিথ্যে মোহেৰ পেছনে জীবনেৰ মূল্যবান সময়গুলো এভাৱে অপব্যায় কৱতে না।

ষষ্ঠ আয়তে আজ্ঞাহ বলছেন, ‘তোমোৰা অবশ্যই জাহানাম প্ৰত্যক্ষ কৱেব।’

খুব কঠিন একটা আয়ত। আজ্ঞাহ বুৰিয়েছেন—এই যে দুনিয়াৰ কাছে নিজেকে আমাৰ সঁপে দিয়েছি, দুনিয়াকে প্ৰাধান্য দিতে সিয়ে আগাগোড়া, বেমালুম আখিলাতে কথা ভুলে গিয়েছি, দুনিয়াকে আমাদেৰ সবকিছু মনে কৱে আজ্ঞাহৰ অবাধ্য হয়েছি, আৰ টোই হলো আমাদেৰ কৰ্মফল, পৱিণ্যাম—আগন্তুন লেলিহান শিখ।

সপ্তম আয়তে তিনি আবাৰ বলেছেন, ‘আবাৰ বলি, তোমোৰ অবশ্যই দিবানৃতিতে জাহানাম প্ৰত্যক্ষ কৱলৈ।’ আগেৰ মতো এখানেও আজ্ঞাহ সুবহানাকু ওয়া তাআলা পৰ্বেৰ অবিবাম কথাগুলোৰ ওপৰ জোৱ দিয়েছেন। আজ্ঞাহ যখন কোনো কিছুৰ ওপৰ বাৰবাবা জোৱ দিয়ে কথা বলেন, তখন বুৰাতে হবে বাপোৱটাৰ শু্ৰূত কথখনি। তিনি আমাদেৰ জন্মেছেন, যে বাস্তবতাকে তোমোৰ অঙ্গীকাৰ কৱতে, যে বাস্তবতাৰ বাপোৱে তোমোৰ বিশ্বত হয়ে দুনিয়াৰ ফাঁদে পড়েছিলে, এই দেখো আজ দেখো সেই বাস্তবতা কঠটা ভয়ংকৰ।

অষ্টম আয়তে তিনি বলেন, ‘তাৰপৰ, সেদিন অবশ্যই তোমোৰ আমাৰ প্ৰদত্ত নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞসিত হবে।’ নিআমত হিশেবে আমাদেৰ জীবন দান কৱা হয়েছিল। এই জীবনে বৌচাৰ জন্য হাতাত হিশেবে কিছু সময় বৈধে দেওয়া হয় আমাদেৱ। সেই সময়গুলো আমোৰ কোন কাজে ব্যবহাৰ কৱেছিঃ? নিআমত হিশেবে আমাদেৱ। সেই সুস্থিৎ, সেই সুষ্ঠাম দেহ নিয়ে আমি কত আমাকে সুস্থিৎ দান কৱা হয়েছিল। সেই সুস্থিৎ, সেই সুষ্ঠাম দেহ নিয়ে আমি কত গ্ৰান্ত সালাত আদায় কৱেছিঃ? কত রাত আমি তাহাজুন্দে দাঙিয়েছিঃ? নিআমত হিশেবে আমাকে ধনসম্পদ দান কৱা হয়েছিল। সেই ধনসম্পদ কোন পথে আমি হিশেবে আমাকে ধনসম্পদ দান কৱা হয়েছিল? নিআমত হিশেবে আমাকে সন্তানসন্তুতি ব্যব কৱেছিঃ? কতটুকু দান-সাদাকা কৱেছিঃ? নিআমত হিশেবে আমাকে সন্তানসন্তুতি ব্যব কৱেছিল। তাদেৱ কি সঠিক শিক্ষা দিয়ে মানুষ কৱেছিলাম? আমাৰ মৃত্যুৰ দান কৱা হয়েছিল। তাৰে কি পৰিস্থিতি কৱে রেখেছে যে, আমোৰ আমাদেৰ পৰম নিয়তি মৃত্যুৰ কথা ঝুলে বসে আছি। একদিন ঝুঁট কৱে মৃত্যু সামনে চলে আসবে। আমাকে অপ্রস্তুত দেখে মালাকুল মাউত কখনোই ফিরে যাবে না। আমাকে আৱেকটাৰ শুধৰে নেওয়াৰ শুয়োগ দেওয়া হবে না। পৰকালেৰ পাথেয়ে সংগ্ৰহ ছাড়াই যখন জীবনেৰ পৰিসমাপ্তি ঘটবে, তখন কেমন অবস্থা হবে আমাৰ?

[১] এমন কাজ যাৰ সামাজিক মৃত্যুৰ পৰও বাস্তৱ আমননামায় যোগ হতে থাকে।

## বেলা ফুরাবার আগে

আমি আফসোস করব। আমার সামনে দিয়ে কত লোক হৈতে হৈতে জ্বালত হয় যাচ্ছে। এরা তো তারাই, পুনিয়ায় যাদের সবসময় আখিরাত নিয়ে ভবতে দেখিয়েছেন জীবনে এরা ছিল সহ, সত্যবাদী, আমলদার। মসজিদের সাথে তাদের লিখ আবৃত কথা বলত না, উচ্চশুরে কথা বলত না। বিনয়ের সর্বোচ্চ মাত্রা দেখা গেত তাদের আজ্ঞায়। তারাই আজ মহা-পুরন্মুক্তিরপ্রাপ্ত! আর আমি? আমি ছিলাম উদ্বৃত্ত আর বেলুন রামাদান মাসগুলো কতই-না হেলাকেলায় কাটিয়েছি আমি। আমার সহকৰ্ত্তা, আমি সহপাঠী, আমার প্রতিবেশী আজ আমার সামনে দিয়ে জ্বালতে চলে যাচ্ছে, আর যাই ভাগো ঝুটল জাহাজ। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আমি বলব—

بِأَنْتَ فَيُمْكِنُ مَا تَرِيدُ

হায়! আমি যদি তাকে বন্ধুরূপে শ্রেণ না করতাম!(১)

আমলনামা হাতে পাওয়ার পরে আমি তাতে চোখ বুলালাম। কোথাও কেনো চারা আমল দেখতে পাইছি না। সবখানে কেবল আমার পাপ আর পাপ। অঙ্গীল ডিডি আর অঙ্গীল জিনিস দেখতে দেখতে যত রাত পার করেছি, তার সব হিসেব দেখছি এখানে সবিস্তারে লেখা আছে। ক্যাম্পাসের মে-কাটা মেয়ের নিয়ে কু-নজরে তাকাতাম, তার হিশেবও দেখছি উঠে এসেছে এখানে। ইয়া আজাই অপবাদ দিয়ে প্রতিবেশী যে মেয়েটার বিয়ে আটকে দিয়েছিলাম, সে হিশেবও দেখছি বাদ পড়েনি! আমি তখন আফসোসের সুরে বলব—

بِأَنْتَ فَيُمْكِنُ مَا تَرِيدُ كَفَافِي

হায়! আজ আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো!(১)

## জীবনের ইন্দুর-সৌত কাহিনি

পুনিয়ায় যাদের ফাঁদে পড়ে আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাস হয়েছিলাম, তাদের নামগুলোও সেবিন আমার সামনে উপস্থাপন করা হবে। যে বৰ্ষটার প্রলোভনে পড়ে ইন্দুরসৌতের নিবিষ্ট সাইটে চু মেরেছিলাম, যার প্রৱোচনায় আমুক-তমুককে কৃতার করেছিলাম, যাদের সাথে সিনেমা, কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলাম, তাদের সকলের নাম সেবিন আমাকে দেখানো হবে। আমি অবাক হব আর বলব—

يَا وَيْلَى لَيْلَى لَمْ أَشْعُدْ فَلَمْ أَلِيلَ

হায়! আমি যদি তাকে বন্ধুরূপে শ্রেণ না করতাম!(১)

জীবনের এই ইন্দুর-সৌত খেলায় আমি মন্ত হয়ে আছি। সেই খেলায় জিতে যাওয়ার জন্য জীবন আমাকে যেভাবেই নাচক, আমি সেভাবেই নাচতে প্রস্তুত। আমি জীবন না আলামীকুল সকালে ঘূম থেকে জাগতে পারব কি না। তবুও আমার জীবন হেবে না। একদম ভাবার ফুরসত পাই না, যদি এক্সুনি আমার মৃত্যু হয়? যদি এখনই তলে পড়ি রাস্তায়? যদি প্রাণবায়ু এক্সুনি বেরিয়ে যায় আমার শরীর থেকে? আমাকে কী অসহায় হয়ে, আপসোস করে বলতে হবে—‘হায়! আমি যদি প্রকালের জন্য কিছু করতাম!’

—৩০৩৩—

## চোখের রোগ



### চোখের রোগ

[ক]

এক বন্ধুর সাথে একবার ইসলামিয়া চক্র হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে একটা যত্ন পরিয়ে দিয়ে ডাক্তার সাহেবে বললেন, ‘সামনে তাকান। আমি সামনের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, ‘কী দেখতে পাচ্ছেন?’

‘কিছু ইংরেজি বণ্ণ।’

‘পড়ুন সেগুলো।’

আমার সামনে একটা গোলাকার চক-প্লেট পেটুলামের মতো খুলতে থাকা ইঞ্জিনো বর্গগুলোর কোনোটা খুবই কুদ্র আকৃতির, আবার কোনোটা খুব বড়। ছেট-বড় রূপ মাঝারি আকৃতির এই বর্গমালা পড়তে বেশ অসুবিধা হবার কথা। চোখে মন থাকলে তো বেশ বিপাকেই পড়তে হবে। মূলত চোখে কোনো সমস্যা আছে কিন্তু তা নির্ণয়ের জন্যই এগুলোকে এভাবে সাজানো হয়েছে। কিন্তু বর্গমালা পড়তে আবার কোনো অসুবিধেই হয়নি। গড়গড় করে এক নিঃশ্঵াসে সেগুলো পড়তে চেলেম। পরে বসে থাকা ভদ্রলোক গোলগাল যন্ত্রটা আমার চোখ থেকে খুলে নিয়ে বললেন—

‘আপনি তো চোখে আমার চেয়েও ভালো দেখতে পান। কী জন্মে এসেছে?’

‘রুটিন চেক-আপ করাতে।’

‘রেগুলার করান?’

‘না।  
তাহলে?’

‘এই যে, আজ থেকে শুরু করলাম।’

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক হিক করে হেসে দিলেন।

[খ]

ইসলামিয়া চক্র হাসপাতালের অত্যাধুনিক যত্ন আমার চোখে কোনো সমস্যা থেকে পায়নি। চোখের চিকিৎসার পেপো বড়সড় বক্রের তিয়াধারী ডাক্তারও আমার চোখ দেখে বললেন যে, আমার চোখ দিবি সুস্থ। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক যত্ন আর ডিয়াপ্রণ ডাক্তারেরা আমার চোখে সমস্যা থেকে না পেলেও আমি তো জিনি আমার চোখ কী পরিমাণ অসুস্থ। আমার চোখ রয়েছে এক অঙ্গুষ্ঠ রকমের অসুস্থ। সেই অসুস্থ শনাক্ত করার ক্ষমতা এখানকার শক্তিগুলোর নেই। ডাক্তারের স্টেশনিপশন কিংবা ভালো পাওয়ারের চেম্বাও করানো সেই অসুস্থ সারাতে পারবে না। দুনিয়ার কোনো অত্যাধুনিক যত্নও এই অসুস্থ থেকে পাবে না, কারণ, এই অসুস্থের কেন্দ্রস্থল চোখের কর্ণিয়া নয়, বক্ষস্থিত অস্তর।

চোখে দেখতে না পাওয়া—একটা সমস্যা বটে, তবে খুব গুরুতর সমস্যা নয়। জগতে প্রতাঙ্গের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আঙ্গুষ্ঠ সম্ভবত চোখ। চোখে দিবি দেখতে পায়—এমন কত লোকই তো অন্য লোককে চোখে চোখ রেখে খুন করে ফেলে। চোখে দেখতে পাওয়া লোকগুলো কত সহজেই চোখে চোখ রেখে মিথ্যে কথা বলে, চোখের দৃষ্টি দিয়ে সুন্দর আর ঘূসের তাক গুনে গুনে পকেট ভরতি করে। তারা মনে করে তাদের চোখগুলো দিবি ভালো আছে। কেবল চোখে দেখতে পাওয়াই কি সত্যিকার চোখের সুস্থিতা?

উন্ম মাকতুম রায়িয়াজ্জু আনঙ্ক। অর্থ সাহাবি। চর্মচক্র দিয়ে দুনিয়াকে দেখার সুবিধে থেকে তিনি হিলেন বাস্তিত। তবে, তিনি কি সত্যিই অর্থ ছিলেন? সত্যিই কি তিনি চোখে দেখতে পেতেন না? যদি না-ই দেখতে পান, হেরা গুহা থেকে উৎসারিত সেই শূলতম আলোর খৌজ তিনি পেলেন কীভাবে? কীভাবে ঠিক ঠিক চিনে ফেলেছিলেন আসমান ভেস করে আসা সেই সত্যটিকে? দুনিয়াকে আলোকিত করতে আসা অতিরিক্তিক সেই আলোকে তিনি চিনতে পারলেন কী উপায়ে? তবে কি অর্থত মানেই ‘না দেখা’ নয়? তবে কি মানুষ চোখ ছাড়াও অন্য কোনো উপায়ে, অন্য কোনো মাধ্যমে দেখতে পায়? তাহলে কোন সে উপায়? কোন সে মাধ্যম?

হাঁ, সেই মাধ্যম হলো অস্তরের চোখ। বক্ষস্থিত যে চোখ, সেই চোখ মুগি সুন্দর থাকে, তার জন্য দুনিয়া কথনে অধিকার হয় না। সুব চৰচৰু মেখনে যেন অবকার হাড়া আর কিছুই দেখে না, অস্তৰচৰু সেখানে দেখতে পার বলবৎ আলো। সাহাবি উন্মু মাকতুম রাবিয়াজ্জু আনন্দের চৰচৰুতে আলো ছিল না, যেন তার বক্ষস্থিত চোখের জ্যোতি তাকে সত্যিকার অব হতে পেয়নি। সেই চোখ টিক টিক খুঁজে নিয়েছিল শুধুতার পথ। খুঁজে নিয়েছিল পরম পরিষ্ঠ সতীটিক। সেই সতোর নাম তাওহিদ। একত্বাদ। এক ইলাহ। এক মাবুদ।

পক্ষান্তরে, আবু জাহেল কিংবা আবু লাহাবের কথা চিন্তা করুন। বাহিক চোখে দুনিয়া দিব্য সুন্দর। কিন্তু বক্ষস্থিত যে চোখ, সেই চোখ ছিল মৃত। তাদের চৰচৰু যি দুনিয়ার সবকিছু দেখার সাথ মিলেও তারা দেখতে পায়নি আদমানি আলোর হতে যে আলোর বিলিক রাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছে পৃথিবীর পথপ্রাপ্তর, যে আলোতে বলুন করে উঠেছিল মরু-মূর্যকের উপত্যকা, সেই আলোর বাণী পৌছতে পারেনি তামে অস্তরের কুঁড়িতে। তাদের অস্তরের চোখ ছিল মৃত। অস্তরের চোখ মরে যাওয়াতে হয় সতীটিকে চিন্তে পারেনি। খুঁজে আনতে পারেনি দিগন্তবিশ্বত সেই ঐশ্বী হারে রেখা। বাহিক দৃষ্টি আর অস্তরের মধ্যে কি আকাশপাতাল ব্যবধান, তাই না!

[গ]

ক্যাম্পাসে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বলি, ‘দেস্ত, আমি না অমুকের গুর তথ খেয়েছি’। ক্রশ খাওয়া মানে মেরোটার রূপ দেখে পাচাল হয়ে যাওয়া। কলনায় সীমা শাড়ি পরিহিত সেই ললনার খেঁপায় গোলাপ গুঁজে দিতে দিতে বলা, ‘তোম জন্য দুরস্ত ঘাঁড়ের চোখে বাঁধতে পারি লাল কাপড়। বিশ্বসংসার তম তম করে হৃষি আনতে পারি একশ আটচি নীলপদ্ম।’ কলনায় আমি হয়ে যাই শাহজাহান হয় সে হয় আমার মমতাজ। আমার রাতগুলো কেটে যায় সেই ক্রাশের কথা ভাবতে। দিনগুলোতে আমার মন খালি আনচান করে তাকে এক নজর দেখাব জন্ম। আমার চোখে সে-ই হলো মোনালিসা। বৃপকথার রূপের দেবী আক্ষেপিত। তবে দেখলেই আমার মনের ভেতর উথালপাথাল শুরু হয়। আমি তখন কবি হয়ে যাই আনমনে গুণগুন করি, ‘তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাহ্য।’

চোখের গোশ

নিজেকে কবি বানানোর আগে, আমরা কি একবার আল-কুরআনের দিকে দিয়ে যেতে পারি না? আমরা তো বিশ্বাস করি, আল-কুরআন হলো আমাদের শৈরনবিধান। আরাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করেই বলছেন—

فَلَلْمُؤْمِنُونَ يَعْصُو مِنْ أَصْرَارِهِمْ

(হে মাসুল) মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।<sup>[১]</sup>

আমাকে জানতে হবে, কোনো কোনো নারীর দিকে ভাবড়াব করে তাকিয়ে থাকার অনুমতি আমাকে দেখায় হ্যানি। বৰং, হাদিসে বলা হচ্ছে, কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি চলে গোল সাথে তা ফিরিয়ে নিতে। ভুলেও বিতীয় বার যেন মুখ তুলে না তাকানো হয়।<sup>[২]</sup> কাবগ, বিতীয় বারের তাকানোতে শয়তানের কুম্ভণা থাকে। শয়তান তখন মনের ভেতরে কুম্ভণা দেয় আর করিয়ে নেয় বিভিন্ন ধরনের পাপকাজ। একটি সহিত হালিস থেকে জান যায়, একবার মুহাম্মদিফাহ থেকে মিনায় যাত্রাকালে আল ফাদল হিনু আবাস এক মহিলার দিকে বারবার তাকছিলেন। এটা দেখে নবিজি সাজাজাহু আলাইহি ওয়া সালাম নিজ হাতে তার ঘাড়টাকে অন্দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।<sup>[৩]</sup>

সুরা আল মুমিনের ১৯ নম্বর আয়াত: ‘মেখানে বলা হচ্ছে, ‘চক্ষুসমূহের খিয়ানত এবং অস্তরসমূহ যা গোপন রাখে তা তিনি জানেন’—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আবুবাস রাবিয়াজ্জু আনন্দ বলেন, ‘আয়াতটিতে এমন এক ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে, যে কোনো বাহিতে যাব এবং ওই বাহির সুন্দরী মহিলার দিকে বারবার চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকায়। যখনই তার এই কজ করার নজরে পড়ে যায়, তখন সে চোখ নামিয়ে ফেলে। এরপর, আবার যখন সে সুযোগ পায়, তখন আবার ওই সুন্দরী মহিলার দিকে তাকায়।’<sup>[৪]</sup>

যেোল করুন, এই যে একজন মহিলার দিকে বারবার নজর দেওয়া, ফিরে ফিরে তাকানো, এটাকে আরাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ‘চোখের খিয়ানত’ বলেছেন।

[১] সূরা মৃত, আয়াত : ৩০

[২] সুন্নু আবি সাউদ : ২১৫১; হাদিসটি প্রাথমিকে

[৩] সুন্নু আবি সাউদ : ১৮১১; হাদিসটি প্রাথমিকে

[৪] হাদিসের ইবনু কাসিম, সূরা মুমিনের ১৯নং আয়াতের তাফসিল হ্রস্টৰ্ব্ব

'বিয়ানত' মানে হলো আপনার কাছে কেউ কিছু গভীর বিচার দেখেছে, কিন্তু সেই জিনিসটা আপনি হয় অপব্যবহার করেছেন, নয়তো আবসাং করেছেন। তাই যদি আজ্ঞাহর পক্ষ থেকে দেওয়া অন্যতম আমানত। সেই আমানত দিয়ে যদি আজ্ঞাহর ভুল কিছু দেখুন, তখন তা বিয়ানত নয় তো কী?

কোনো মহিলার দিকে লুকিয়ে-চুরিয়ে তাকানোটাও আজ্ঞাহর কাছে যদি যেনেও থাকে, তাহলে আমরা যারা নিতান্তেন 'জশ' খেয়ে ভাবনার সামনে বস্তুজু থেকে পাপের জলে অবগাহন করি, আমাদের ক্ষেত্রে কী হবে? আমরা যেটাকে জশ বলছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সেটাকে 'চোখের ফিন' বলেছি।

[৪]

তাহলে উপায়? অন্তর্দৃষ্টিতে যে বিশাল রোগ নিয়ে আমার বসবাস, সেই জীবনের পথ্যা কী? মনের ভেতরে শেকড় গেড়ে বসা লালসার পাহাড়, শাহীদের ধোঁকায় পড়ে কল্পুষিত করে রাখা অন্তরকে পরিশুধ করার প্রেসক্রিপশন হী প্রেসক্রিপশন হলো তাকওয়া। আজ্ঞাহভীতি। আজ্ঞাহকে ডয় করা। মনের ভেতরে সুরা ফিল্যালে বলা আজ্ঞাহর এই কথাগুলো গৌঁথে নেওয়া—

نَمْ يَعْلَمُ مِنْ قَالَ ذَرْهُ خَيْرًا يَرْبُزُ ④ وَمَنْ يَعْلَمُ مِنْ قَالَ ذَرْهُ شَرًّا يَرْبُزُ ⑤

অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা সে (বিচার দিবসে) দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ যারাপ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে।

আমি আজ যে মেয়েটির ওপর ক্রাশ ঘটছি, যে মহিলাকে নিয়ে আমি আজ মৌজু-বার্ষিক করছি, তা আমার আমলনামায় উঠে যাচ্ছে। মোবাইল আর কম্পিউটারের দলিলেও যে নীল দুনিয়ায় আমি বিচরণ করছি, সেই বিচরণের প্রতিটি মুহূর্ত লিপিবদ্ধ যাচ্ছে একটি অদৃশ্য আমলনামায়। ইসলামিয়া চক্ৰ হাসপাতালের অত্যাধুনিক যাত্র হয়তো এই রোগ আর এই হিশেব ধরা পড়বে না, কিন্তু পুনৰুত্থান দিবসে আমর সামনে আমার সকল কৃতকর্মকে উপস্থাপন করা হবে। গ্রাউন্ডের হিসেবে

[১] সহিহ বুখারি: ৬২৪৩, ৬৬১২; সহিহ মুসলিম: ২৬৫৭

[২] সুরা ফিল্যাল, আয়াত: ৭-৮

এক ত্রিকে মুছে দেওয়া নিষিদ্ধ সাইটের বিচরণ থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের সেই ক্রান্তের কথা ভাবতে ভাবতে জড়িয়ে পড়া পাপ—সবকিছুই আমার সামনে হাজির করা হবে। এই রোগ থেকে বাচার একটাই উপায়—তাওৰা। করজোড়ে আজ্ঞাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তিনা করা। এ রকম পাপে আর না জড়ানোর দৃঢ় শপথ করা। সর্বোপরি, যত্যন সালাত এবং তাহজুদুর সালাতে আজ্ঞাহর কাছে অন্তু বিসর্জনের মাধ্যমে হিদায়ত চাওয়া। যে মহান রব আমাকে চোখের মতন নিআমত দ্বারা ধন্য করেছেন, তার দরবারে আকুল ফরিয়াদে নত হওয়া।



## আমরা তো স্বেফ বন্ধু কেবল

[ক]

যুবকদের দীনে ফেরার পথে সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধকতা, সেটা হলো হারাম রিলেশানশিপ। এমন অনেকেই আছে যারা হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গড়ে, রামাননে সিয়াম রাখে, দীনের ব্যাপারেও খুব আগ্রহী। কিন্তু, একটা জায়গায় এসে আটকে গেছে—হারাম রিলেশানশিপ। তাদের ধারণা, নন-মাহরাম! একটি মেয়ের সাথে চলাফেরা করা, একসাথে ঘুরতে যাওয়া, ফুচকা খাওয়া, সেলফি তোলা, সেই সেলফিংযুলো ফেইসবুকে আপলোড দেওয়া এবং হাত ধরাধরি করে পার্কে হেঁটে বেড়ানোতে আসলে কেনো সমস্যা নেই।

হারাম রিলেশানশিপের সূচনাটা মোটাদাগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে শুরু হয়ে থাকে। একটা হেলে বা মেয়ে যখন নতুন নতুন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন তার মনে যৌবনের উত্তল হাওয়া বইতে থাকে। সে আশা করে কলেজের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী তার বন্ধু হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে যার্ট ছেলেটা তার সাথে একই রিকশায় ঘুরে বেড়ানোতে সে অন্য রকম একটা আনন্দ পেয়ে থাকে। ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে সুন্দরী বাবুবীটা ক্যান্টিনে তার সাথে বন্ধু ফুচকা খাচ্ছে—বাপারটাই তার কাছে অন্য রকম! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

[১] আরীফতা, দৃশ্যান অথবা শুশ্রালয়ের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে জারো নহ, তবে সেই সাক্ষাৎ জয়েম, তারা হচ্ছে মাহরাম। আর যারা এর বাইরে, তাদের বলা হয় নন-মাহরাম।

থাকাকালীন আমাদের জীবনে এ রকম অনেকগুলো বন্ধু-বাবুবী এসে ভিড় করে, যাদের আমরা মিটি ভায়ায় ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ বলে থাকি।

কেনো একটা হেলে যখন নন-মাহরাম কোনো মেয়েকে নিয়ে ক্যান্টিনে বসে আড়া দেয় কিংবা একটা মেয়ে যখন ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র কোনো এক নন-মাহরাম বড় ভাইয়ের সাথে একই রিকশায় করে ঘুরে বেড়ায়—এই ঘটনাগুলোকে আমরা নেহাতই ‘বন্ধুত্ব’ বলে চালিয়ে দিই। কিন্তু এই তথাকথিত ‘বন্ধুত্ব’ ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’-এর নেপথ্যের ঘটনা আমরা তেমন জানতে পারি না।

এ রকম ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ রিলেশানশিপে আকরান্ত কেনো ভাই কিংবা বোনকে যখনই আপনি বলতে যাবেন যে, তারা যা করছে বা যেভাবে চলছে তা আবো ইসলাম সমর্থন করে না, তখনই তারা তেলেবেগনে জ্বলে উঠবে। আর বলবে, ‘আরে ভাই! আমরা প্রেম করছি নাকি? আমরা তো কেবল বন্ধু। আপনি আর আমি যেমন বন্ধু, এই মেয়েটা আর আমার মধ্যেও সে রকম বন্ধুত্ব। এর বাইরে আর কিছু না।’

তাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসা এবং শুধু রেখেই বলতে হয়—তারা যে বন্ধুত্বের কথা বলছেন, সেই বন্ধুত্ব করতে ইসলাম কখনোই অনুমতি দেয় না। তারা যদি ইসলামকে অন্য পাঁচ-দশটা ধর্মের মতো কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদত-কেন্দ্রিক ধর্ম মনে করে থাকে, তাহলে তারা খুব বড় ভুলের মধ্যে আছে। ইসলাম ঘূর্ম থেকে ঘো থেকে শুরু করে ঘুমুতে যাওয়া পর্যব্রান্ত আমাদের জীবনের সকল দিক নিয়েই কথা বলে। আদতে ইসলাম কেনো ধর্ম নয়। এটা হলো দীন। একটা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এই ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়—আমি কার সাথে মিশব, কার সাথে মিশব না। কী খাব আর কী খাব না। কী পরব আর কী পরব না। কীভাবে চলব আর কীভাবে চলব না। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কিংবা ভালো রেজাস্ট করার জন্য আমরা যেমন ক্লাসের সিলেবাস ফলো করি, ঠিক সেভাবে কুরআন ও হাদিস হলো আমাদের জীবনের সিলেবাস। এই সিলেবাস অনুসরণ করা ব্যক্তিত আবিরামে ভালো রেজাস্ট করা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

কেবল ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ বলে যার সাথে আমি মিশছি, ঘূরছি, একসাথে খাচ্ছি, তার সাথে মেশার, যোরার কিংবা যাওয়ার অনুমতি আলাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা আমাকে দেশনি। আমার জন্য তিনি কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট করেই বলেছেন—

فِي الْمُؤْمِنِينَ يَعْصُمُ مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَخْلُفُهُمْ فِي رَبِّهِمْ

(হে রাসূল) আপনি মুমিন বাস্তিদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি  
সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে।<sup>১)</sup>

আয়াতটির দিকে আরেকবার খেয়াল করা যাক। এখানে মুমিন বাস্তিদের উপরেই বলা হচ্ছে। মুমিন বাস্তি করা? যারা আজ্ঞাহতে বিশ্বাস করে। রাসূল, প্রকল্প, জ্ঞানাত, জ্ঞানাম, ফেরেশতা। ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে তারাই হলো মুমিন। একজন চিন্তা করি, আমি বি আজ্ঞাহতে বিশ্বাস করি? নবি-রাসূলে বিশ্বাস করি? প্রকল্প, জ্ঞানাত-জ্ঞানাম-ফেরেশতায় বিশ্বাস করি? উভৰ যদি ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে এই আয়াতটি আমার জন্ম হাঁ, আমাকে উদ্দেশ্য করেই আজ্ঞাহ সুবহানান্দ ওয়া তামাল দৃষ্টি সংযত এবং লজ্জাস্থান হিফায়ত করে চলতে বলেছেন।

‘দৃষ্টি সংযত’ বলতে আসলে কী বোায়? তাহলে কি আমরা চোখ বৰ করে হাঁটি? না, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। নবিজির হাদিস থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন, ‘থথনই কোনো পরনালীর দিকে চোখ পড়ে যাবে, সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার চোখ তুলে তার দিকে তাকানো যাবে না।<sup>১)</sup>

আমাদের জন্য শরিয়তের সীমানা হলো—চলার পথে যদি কোনো নন-আজ্ঞান তথা ক্ষেগনা নালীর দিকে আমাদের দৃষ্টি চলে যায়, তাহলে সাথে সাথে সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয় বার তাকানো যাবে না। শরিয়তের সীমারেখ্য যখন এমন, তবে আমরা কীভাবে ব্যুক্তের নাম করে একজন কেণানা নালীর হাত ধরে হাঁটায়টি, যেরফুরি, আনন্দ-মাস্তি-ফুর্তি করে বেড়ানোকে জয়েয় মনে করতে পারি? ইসলাম যা আমাদের জন্য অনুমোদন করেনি, আমরা কীভাবে সেটাকে নিজেদের জন্ম জায়েয় ভাবতে পারি?

কেউ বলতে পারে, ‘আমি তো তাকে কেবল বন্ধুই ভাবছি। তার ব্যাপারে কেনো খারাপ ধারণা আমার ভেতরে নেই। কখনো আসবেও না।’

[১] সুরা নবু, আয়াত : ৩০

[২] সহিহ মুসলিম : ২১৫৯

এমন ভাবনা-পোষণকালীনের একটা গুরু শোনাতে চাই। এই গুরু এমন এক সালিহ তথা নেককার বাস্তির যার সামাজি দিন কেটে মেত আজ্ঞাহ সুবহানান্দ ওয়া তাআলার ইবাদতে। যিনি ছিলেন আগামোড়া একজন ধর্মিক, পরহেয়গার বাস্তি। আজ্ঞাহের এমন এক ব্যালিস বাল্বা কীভাবে শয়তানের ধৌকায় পড়ে বিপ্রান্ত হয়েছিলেন সেটাই শয়তানের মূল প্রতিগাম।

ঘটনাটি বাবিলিন নামের বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের একজন নেককার বাস্তির। জনা যায়, বনি ইসরাইলের লোকেরা যখন পাপের সাগরে হাবুড়ুর খাছিল, যখন তাদের আগামোড়া পাপ আর পক্ষিলতায় ছেয়ে পিয়েছিল, তখন বিশাল একটি জনপদে বেবল বারসিসাই ছিলেন একমাত্র বাস্তি যিনি সর্বদা আজ্ঞাহের ইবাদতে মশগুল ছিলেন। আবারও জানা যায়, তিনি তার প্রার্থনায়ে একটানা ৭০ বছর আজ্ঞাহের ইবাদতে মশঁ ছিলেন।

একবার বনি ইসরাইলের তিনজন যুবক একটি কাজে শহরের বাহিরে যাওয়ার জন্ম মনস্থির করল। তাদের হিল যুবতী এক বোন। পাপ-পজিকলতার এই সময়ে তাদের বোনাকে দেখে রাখবে—সেই চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে উঠল। তখন বনি ইসরাইলের অন্য লোকেরা তাদের পরামর্শ দিয়ে বলল, ‘পাপাচারের এই অস্থির সময়ে তোমাদের বোনকে দেখে রাখার মতো, হিফায়তে রাখার মতো বনি ইসরাইল সমাজে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। তবে বারসিসার কাছে তোমরা তোমাদের বোনকে রেখে যেতে পারো। আমরা তাকে পাপ থেকে মুক্ত, অন্যায় থেকে দুরে এবং আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ তাকওয়াবান ও পরহেয়গার হিশেবে জানি।’

তিনি ভাই এ রকম একজন আজ্ঞাহওয়ালা লোকের সম্মান পেয়ে খুব খুশি এবং তিথমুক্ত হলো। বারসিসার কাছে এসে বোনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করল তারা। একজন কেণানা মহিলার দায়িত্ব নেওয়ার কথা শুনেই ভয়ে কেপে উঠল বারসিসার অস্তর। তিনি বললেন, ‘চুপ করো! আমি কখনোই এই দায়িত্ব নিতে পারব না। আজ্ঞাহের দেহাই লাগে, তোমরা এখন থেকে চলে যাও।’

বারসিসার এমন কথা শুনে তিনি ভাই মনঃক্ষুঢ় হয়ে চলে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে শয়তান তার কুমুদুণা নিয়ে হাজির হলো। সে বারসিসার মনে এমন আবেগ আর দুরনি যুক্তি চেলে দিল যাতে করে তার হৃদয় সহজেই গলে যায়। বারসিসার মনে কুমুদুণা দিয়ে শয়তান বলল, ‘বারসিসা, তুমি কী করলে এটা! এই সরল,

মহৎ ভাইগুলোর এমন নিষ্পাপ আবদ্ধতাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করলে? তুমি বি শুভ করেছ, তারা কাজের জন্য শহরের বাইরে চলে গেলে তাদের ছোট মেয়েটা নিরাপদ থাকবে? কেউ তার সন্ত্রমহানি করবে না? তুমি কি মনে করো না যে, সে হচ্ছে কাহেই সর্বোচ্চ নিরাপদে থাকত?

শয়তানের পক্ষ থেকে মনে উদয় হওয়া এই প্রকাশগুলোকে বারসিসা খুব গুল্ল করে ফেলে। তার কাছে এই কথাগুলোকে খুব যুক্তিশূন্য এবং বাস্তবিক বলে মনে হজা। এ তাবল, ‘ঠিকই তো! সময় তো খুব বেশি ভালো না। তাদের বেন একা থাকলে মে-কান্স ঘৰায় নির্মাণিতা হতে পারে। তারচেয়ে ভালো হয়, যদি আমিই এই মেয়েটার দায়িত্ব নিয়ে রাখি। এতে করে সে হয়তো অন্যদের লালসার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।’

বারসিসা ফিরে যাওয়া তিন ভাইকে ডাক দিল। বলল, ‘ঠিক আছে। আমি তোমাদের বেনের দায়িত্ব নিতে পারি। তবে শর্ত হলো, সে আমার সাথে আমার প্রার্থনার থাকতে পারবে না। দূরে আমার একটি কুঠেছৰ আছে। সেখানেই তাকে থাকতে হবে।

বারসিসা তাদের বেনের যিন্মাদের হতে রাজি হয়েছে দেখে তিন ভাই-ই খুব খুশি। তারা বারসিসার শর্ত মনে নিয়ে বেনকে তার কাছে রেখে শহরের বাইরে চলে গো।

বারসিসা রোজ তার প্রার্থনাগুহারে সামনে মেয়েটির জন্য খাবার রেখে দরজা খুলে করে দিত। খাবারের পাতা বারসিসার ঘরের সামনে থেকে নিয়ে আসত মেয়েটা। এভাবেই পার হচ্ছিল দিন। কিন্তু শয়তানের চূড়ান্ত আরও গভীরে। সে আমার বারসিসার মনে কুমক্ষণা দিল। শয়তানের কুমক্ষণাগুলো ছিল আপাতদান্তিমে যৌক্তিক ও বাস্তবিক। সে বারসিসার মনে এই ভাবনার উদয় ঘটল যে, ‘বারসিসা খুনি সবসময় মেয়েটির জন্য ঘরের বাইরে খাবার রাখো। সে নিজের ঘর থেকে নেওয়ে তোমার ঘর অবধি ইঠে এসে সেই খাবারগুলো নিয়ে যায়। আজ্ঞা বারসিসা, একটা ব্যাপার কি খেয়াল করেছ? তোমার ঘর অবধি যখন মেয়েটা ইঠে আসে, সে সময় না-জ্ঞানি কত পরপুরুষ তাকে দেখে ফেলে। এটা কি ঠিক, বলো? তুমি তো চাইলে তার ঘরের দেরগোড়া পর্যন্ত খাবারগুলো রেখে আসতে পারো।’

বারসিসার মনে এই ভাবনা দাগ কঢ়ল। সে ভাবল, ‘সতিই তো! আমার ঘর পর্যন্ত আসতে তাকে তো অনেক পরপুরুষ দেখে ফেলে।’

বারসিসা পরের দিন থেকে আর নিজের ঘরের কাছে খাবারপাত্র না রেখে মেয়েটার ঘরের দেরগোড়ায় রেখে আসতে লাগল। এভাবে চলল আরও কিছু দিন। শয়তান তার কৃত্যুক্তি নিয়ে আবার হাজির হলো। এবার বলল, ‘বারসিসা! তার আজৰ লোক তো তুমি! তার ঘরের দেরগোড়া পর্যন্ত যেতে পারো, তেতেরে দিয়ে তার সাথে দু-চারটে কথা তো বলতে পারো, তাই না? বেচারি ভাইদের অনুপস্থিতিতে কঠই-ই একাকী জীবন পার করছে!

এই ভাবনাও বারসিসাৰ মনঃপূত হলো। সে ভাবল, ‘সতিই তো! এতদূর পর্যন্ত যখন আসি, তার সাথে দু-চারটে কথা তো বলে যেতে পারি। ভাইদের অনুপস্থিতিতে সে নিশ্চয় খুব একাকীবোধ করবে।’

পরের দিন থেকে বারসিসা খাবার নিয়ে সেজা মেয়েটার ঘরের ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। দুজনের হালকা কিছু গল্প-আলাপও হয়। সেই আলাপগুলো আস্তে আস্তে দীর্ঘ আলাপে পরিণত হয় এবং একসময় বারসিসা মেয়েটার প্রতি আসত্ত হয়ে পড়ে। সেই আসত্ত একটা পর্যায়ে শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়।<sup>[১]</sup>

বারসিসার ঘরের এখানেই ইতি টেনে দিই। আমরা যারা ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ বলে নারী-পুরুষের অবিষ্য মেলামেশাকে জায়েয় মনে করি এবং এতে ক্ষতির কিছু দেখি না বলে থাকি—আমাদের জন্য এই গরে ভালো রকমের শিক্ষা রয়েছে। শয়তান বনি ইসরাইল যুগের সবচেয়ে সেরা দীনদার, তাকওয়াবান, আমলবান আর নেককার বান্দা বারসিসাকে যেভাবে কান্দে ফেলেছে, আমাদের যুবসমাজকেও ঠিক একইভাবে শয়তান ফাঁদে ফেলে। গাসুলুজাই সাজাজাই আসুইহি ওয়া সাজাজের হাসিস থেকে আমরা জানতে পারি, ‘দুজন নারী-পুরুষ যখন একাত্মে আসে, সেখানে তৃতীয়জন হয় শয়তান।’<sup>[২]</sup>

আমরা যখন নন-মাহুরাম কাউকে নিয়ে একাত্মে আলাপে মন্ত হই কিংবা একই বিকশ্যায় চেপে যাওয়া-আসা করি, তখন মারাখানে শয়তান এসে আমাদের বিভাস্ত করতে থাকে আমাদের মনে হতে পারে, ‘আরে! আমার মনে তো আমার বাধ্যী সম্পর্কে কখনো খাবাপ ধরণ আসে না। আমি তো কখনো ওর দিকে খাবাপ নজরে তাকই-ই না।’ আমরা যারা এমন চিন্তাভাবনা মনে লালন করি, আমাদের উচিত

[১] অক্ষয়িরে কৃতাত্ত্ব, সুরা হাশেরের ১৬নং অ্যায়েতের অক্ষয়ির প্রার্থনা

[২] জাহি তিমাহিয়ি: ২১৬৫, হাদিসটি সহিহ

আমরা তো স্বেচ্ছ বন্ধু কেবল

বারসিসার ঘটনাটি আরেকবার মনোযোগ সহকারে পড়া। শয়তান কিন্তু একটিখনে জন্ম ও বারসিসাকে বলেন ওই মেয়েটার সাথে অনেকটিক সম্পর্কে ভজিয়ে পড়ছে; বরং শয়তান বারসিসাকে যা বলেছিল তা আপনার দৃষ্টিতে বাস্তবিক, মানবিক তার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাতে বারসিসাকে উদ্বৃত্ত করেন। বরং, শয়তান কুলে ভালো ভালো কথা বলে বারসিসাকে মেয়েটার কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই প্রতি আমরা বলি, ‘আমি তো ওর দিকে খারাপ নজরে তাকাই-ই না’, ‘ও কেবল’—এগুলো সবকিছুই শয়তানের পাতানো জাল। ফৌদ। শয়তান আমাদের হয়ে এই ভাবনার উদ্দয় করে দেয় যে, একজন নন-মাহরামের সাথে বন্ধুত্ব করা, যার সাথে বসে আজ্ঞা দেওয়া, ঘুরে বেড়ানো, রিকশায় চেপে আসা-যাওয়া করা, এর আসলে কোনো সমস্যা নেই। এগুলো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। দুজন ছেলে-মেয়ে তো বন্ধুত্ব হতেই পারে।

ভুল। আপনার মাহরাম নয় এমন কারও সাথে বসে আপনি আজ্ঞা দিতে পারেন না, চ্যাট করতে পারেন না। কোনে কথা বলতে পারেন না। যার সামনে আপনার জীবন পর্দা ফরয়, তার সাথে কীভাবে আপনি হাত ধরাধরি করে হাঁটতে পারেন? যাকে দেখামত্র আপনার জ্ঞা দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া ফরয়, তার সাথে কীভাবে আপনি বন্ধুত্ব পাতাতে পারেন? ক্যাম্পাসে আজ্ঞা দিতে পারেন? রাতে ঘুর্টার গুর হঠাৎ চ্যাট করতে পারেন? ফোনে কথা বলতে পারেন?

কুরআনের আরেকটি আয়াতের দিকে লক্ষ করা যাক—

لَا يَأْتِي كَحِيلٍ مِّنَ النَّاسِ إِنْ أَتَيْتَهُ فَلَا تُخْفِيْنَ بِالْقَوْلِ فَيُظْعَنَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ  
وَفَمَنْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

(হে নবি-পঞ্জীগণ!) তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা তাকে অবলম্বন করো, তবে (পরপুরুষদের সাথে) কোমল কঠে কথা বলো না। এতে করে (যদি তোমরা কোমল কঠে কথা বলো) যার অস্ত্রে বাহি রয়েছে, সে প্রলুব্ধ হয় আর তোমরা ন্যায়সংজ্ঞাত কথা বলবে।।।।

[১] সুরা আয়াত, আয়াত : ৩২

এই আয়াতে যদিও নবিজির স্তুর্গণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তথাপি তাফসিরকারকগণ বলছেন, এটা সকল মুমিন নারীর জন্ম ও সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ সুবহানাল্লাহু শুয়া তাআলা নারীদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, ‘তোমরা পরপুরুষদের সাথে কোমল কঠে কথা বলো না।’ এটই হচ্ছে ইসলামের সীমারেখা। আপনি যখন নিজেকে একজন মুমিন নারী হিসেবে দাবি করবেন, তখন আপনি কখনোই আপনার ডিলার্মেটের সিনিয়র ভাইটাকে মিটি সুরে ‘ভাইয়া’ বলে সহৃদয়ে করবেন না। আজ্ঞা আপনি কখনোই নন-মাহরাম কারও সাথে মিটি গলায় কথা বলবেন না, আজ্ঞা এতে করে তারা আপনার গলার, আপনার মিটি সুরে প্রলুব্ধ হবে এবং দেবেন না। এতে করে তারা আপনার গলার, আপনার মিটি সুরে প্রলুব্ধ হবে এবং আপনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে, আপনাকে নিয়ে, আপনাকে ঘিরে তারা কুসিত কিয়া মত হবে। তাদের একান্ত মুহূর্তগুলোতে করুণায় আপনাকে নিয়ে তার কত ধরনের বাজে চিন্তা যে করবে তা ভাবতেই আপনার গা গুলিয়ে উঠবে।

‘জাস্ট ফ্রেন্ড’-এর কোনো ধারণা ইসলামে নেই এবং এই ধারণা ইসলামের মৌলিক, বুনিয়াদি শিক্ষার সাথে পুরোপুরি সংঘর্ষিক। নিজেকে মুমিন-মুসলিম দাবি করা কোনো ছেলে অবশ্যই বেগানা কোনো নারীর হাত ধরাধরি করে হাঁটতে পারে না। একজন মুমিন নারী কখনোই বেগানা কোনো পুরুষের সাথে রিকশায় চেপে চলাচল করতে পারে না, পার্কে পাশাপাশি বসে আজ্ঞা দিতে পারে না। এসবগুলোই তার জন্ম হারায়।

চলুন, আমরা নিজেদের কেবল তার জন্মই সংরক্ষণ করি যাকে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু শুয়া তাআলা আমাদের জন্ম নির্ধারণ করে রেখেছেন। যে আমার স্তী হবে তার জন্মই মৌলিক হিফায়ত করি। তার সাথেই রাতে জোছনা দেখার জন্ম, সমুদ্রের পারে তার হাত ধরে হাঁটার জন্ম, গোলাপ হাতে তাকে ‘ভালোবাসি’ বলার জন্ম, বর্ধার নিমিত্ত বৃক্ষে তাকে নিয়ে ভেজার জন্ম অপেক্ষা করি। এই স্থান, এই অধিকার, এই মুহূর্তগুলো আন কাউন্ট মেন দিয়ে না বসি। আমার ওপর আমার স্তীর একেবারে প্রথম অধিকার হলো এই—আমি আমার জীবন, মৌলিক করে তার জন্ম হিফায়ত করে চলব।

আপনার ভবিষ্যৎ স্তীর জন্ম আপনার বৃপ্ত-লাবণ্যকে হিফায়ত করবুন। কেবল তার জন্মই না হয় সজলেন। তার হাত ধরাধরি করে বৃক্ষবিলাস উপভোগ করলেন। বিশ্বাস করুন, আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে কখনোই সুখ নেই, শাস্তি নেই। আল্লাহর বিধান মেনে নিজেকে একটিবার পরিবর্তন করেই দেখুন না! যে নন-মাহরাম

হেলেটোর হাত ধরে আছেন, সেই হাত আজকেই ছেড়ে দিন। এই মৃত্যু থেকে তাকে সফ জানিয়ে দিন তার আর আলাহর মাঝে আপনি সবসময় আলাহকে বেছে নিবেন। তাকে আরও জানিয়ে দিন, কেবল আলাহর জন্মই আপনি আর থেকে তার সাথে সমস্ত সম্পর্কের ইতি টেনে দিলেন। দেখবেন, আপনার জন্ম আলাহ সুবহানাকু ওয়া তাআলা সবকিছু কত সহজ করে দিবেন!

যে মেয়েটাকে ক্যাম্পাসে না দেখেন আপনার ইঞ্জিনিয়র থেমে যাওয়ার উপর হয়, তাকে আজকেই জানিয়ে দিন আপনার পরিবর্তনের কথা। তাকে বলে নি আজ থেকে আপনি আর তাকে নিয়ে ভাবছেন না। কাউকে নিয়েই আপনি আর ভাবেন না; আলাহই ছাড়ি। তাকে আরও বলুন, আলাহর জন্মই আপনি তাকে তাঙ করলেন। তার সাথে কটিনো সকল শৃঙ্খল, সকল মৃত্যুকে আলাহর জন্মই মন থেকে মুছে দিলেন। আলাহর দিকে এক বিষত আগাম, তিনি আপনার দিকে এক বালু অঙ্গসর হবেন!১)

## [খ]

রিলেশানশিপ মানে আমরা কেবল ‘প্রেম’ করাকেই বুঝি। অথচ রিলেশানশিপের মধ্যে আমাদের তথাকথিত ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ ‘বন্ধু’-সহ যাবতীয় সম্পর্কই অন্তর্ভুক্ত। যদি সামনে পদ্ধতিহীন যাওয়ার, যার সাথে অহেতুক কথা বললে, সময় কটিনোর দিবা ঘূর বেড়ানোর অনুভূতি আমার নেই, তার সাথে আমি যে নামে বিংবা যে অভিযান সম্পর্ক রাখিই না কেন—এ সমস্তকিছুই হারাম রিলেশানশিপের অন্তর্ভুক্ত। আলাহ সুবহানাকু ওয়া তাআলা এটা আমার জন্ম হারাম করেছেন। এই হারাম রিলেশানশিপের সৌভাগ্য কর্তৃক সেটা ভুক্তভোগী না হলে টের পাওয়া দুর্ভৱ হয়ে পড়ে। হারাম রিলেশানশিপের পাপকে বৈধতা দিতে শয়তান সবসময় তার বাহারি যুক্তি নিয়ে আমাদের সামনে ঘাজির হয়। ঠিক এজনেই এর সন্তান পরিণতি নিয়ে আমরা ভাবতে পারি না। আসলে শয়তান চায় না আমরা এতদূর ভাবি। সে আমাদের চোখের সামনে খুলিয়ে রেখেই একটা রাতিন পর্দা। সেই পর্দা হলো—‘আপনি ভালো তো জগৎ ভালো!’

খুব সম্প্রতি তিনটে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। খুব সম্প্রতি বলছি এজনেই কারণ, এই লেখাটি যখন লিখতে বসেছি, তার ঠিক মাস দুয়োকের মাঝেই এই

[১] সহিত সুস্থির: ৭৪০৫; সহিত সুস্থির: ২৬৭৫

ঘটনাগুলো ঘটে। প্রথম ঘটনা দেশের প্রথিতযশা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরেরে জনা গোচে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাস্টবিন থেকে উত্থার করা হয়েছে কতগুলো শূত নবজাতকের লাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাস্টবিন! নবজাতকের লাশ! চোখের সামনে কেবল দুশ্মাটা ভেসে উঠছে বলুন তো? কিছু কপোত-কপোতি। একটা হয়েছিল হৌবনের উন্নত উদ্যানে। একেবারে শুরুর দিকে তারা ছিল কেবলই ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ আর বিছু না। তাদের মাঝে ‘বন্ধুত্ব’ ছাড়া আর কোনো সম্পর্কই ছিল না। একে অন্যের জন্য নেটো তৈরি করত। ক্যাম্পাসে একজন অন্যজনের জন্য অপেক্ষা করত। বিনামূল বিকেলগুলো তারা পার করত বাহারি রঙের আর জন্য অপেক্ষা করত। বিনামূল বিকেলগুলো তারা পার করত বাহারি রঙের আর বাহারি পদের আজ্ঞা দিয়ে। একটা সময় সেই ‘জাস্ট ফ্রেন্ড’ সম্পর্ককে শয়তান ঘরে নিয়ে দেছে একটি অব্যেক্ষ, অনেকটি সম্পর্ক পর্যন্ত। এরপর কী হলো? যখন চোখের সামনে থেকে উদ্যানের পর্দাটা সরে গেল, যখন কেটে গেল হৌবনের তাড়নামিত্রিত সকল মোহু, যখন রঙিন দুনিয়ার ডিডি সৌকা থেকে তারা বাস্তবের দুনিয়ায় এসে নেওয়ার করল, তখন অব্যেক্ষ বাস্তবে লক্ষ করল যে, তাদের কৃতকর্মের ফল দুজনের কেউই আবাস নেতে বেড়াতে চায় না। তাদের এই সম্পর্কের জেরে ফল দুজনের কেউই আবেক্ষণ্য নিষ্কাপ শরীরকে জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করতে সুণ হয়ে বেড়ে ওঠা আবেক্ষণ্য নিষ্কাপ শরীরকে জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করতে সুণ হয়েছে। যে শরীরটির থাকার কথা ছিল বাবা-মার আদরমাথা কোল আর দেলুনির দেলনায়, সেই শরীরের স্থান হয়েছে পচা ডাস্টবিনের আস্তাকুড়ে! জাহিলিয়াতের চরম অধিঃপতনের ঘৃণেও এ রকম দুশ্মের দেখা মেলা ভারা!

ঢাটীয় ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকার মিরপুর এলাকায়। এক কাক ডাকা ভোরে, অভিজ্ঞত মিরপুর এলাকায় দেখা গেল ভয়ানক একটি দৃশ্য। রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল একটি নবজাতকের লাশ। দেখে মনে হলো এইমাত্রাই ভূমিষ্ঠ হওয়া। এমনকি মাঝের পেটে যে আমরার (প্লাসেন্ট) মাধামে সে খাদ্যাশুণ করত, সেই আমরাটি ও দড়ির মতো বাচ্চাটির গায়ে আটেপুঁষ্টে ছিল। কী ভয়ংকর দৃশ্য তাবুন! দুজন মানুষের নিয়ন্ত্র আবেগ আর কামনার বলি হতে হলো। একটি নিষ্কাপ প্রাপকে। তার কি কোনো অপরাধ ছিল? সে কি বলেছে যে তোমরা আমাকে যেনতেনভাবে জন্ম দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখাও?

ঢাটীয় ঘটনাটি ঢাকার এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের। আমরা বাড়িতে বিয়ে হতে দেখেছি। বিয়ে হতে দেখেছি মসজিদ আর কাজী অফিসেও। কিন্তু হাসপাতালের বেড়ে বিয়ে হয়েছে—এমন ঘটনা শুনেছেন কখনো? ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে ঢাকার এনাম মেডিকেল কলেজে। একটা মেয়ে ওই হাসপাতালে ভর্তি। ডেলিভারি কেইস।

কিন্তু মেয়েটার বিয়ে হয়নি। বিয়েই যদি না হবে, তাহলে বাচ্চার প্রথম আসে কীভাবে জুড়িয়ে বসেছিল। আর ফলাফল যা হবার তা-ই হলো। ছেলেটা সম্পর্ক অঙ্গীকৃত করতে পারে এই ভয়ে মেয়েটা ভুগ নষ্ট করেনি। বাস, হাসপাতালের বেতে, পক্ষের লোকজন মিলে ছেলে-মেয়ে দুটোকে বিয়ে দিয়ে দিল।

হারাম রিলেশানশিপ দুজন মানুষকে পাপের সামরে কীভাবে ড্রিবিয়ে নিতে পারে ওপরের ঘটনা তিনটি তার জলজ্ঞান উদাহরণ! প্রথম দেখতেই ভালো লাগে এবং পরের বন্ধু হওয়া। ক্যাম্পাসে আড়া দেওয়া। ফোনে-চ্যাটে দিনরাত সহজে পর করা। ঘুরতে যাওয়া, একসাথে খাওয়া ইত্যাদির পরে একদিন তারা জড়িয়ে পড়ে একটি অবৈধ সম্পর্কে। ডুব দেয় নিয়মিক আবেগের অতল গহুরে। সেই জুন ফলাফল হয় ভুগহতা, আভাসহত্যা কিংবা হাসপাতালের বেতে বিয়ে! যেই সম্পর্কে আঁজাহর আদেশ লঙ্ঘিত হয়, যে সম্পর্কে আঁজাহর অসমৃষ্টি, সেই সম্পর্কের শূন্য থেকে সমাপ্তি—কোথাও কোনো শান্তি আছে কি?

## [গ]

‘হারাম রিলেশানশিপ’ শব্দসময় শুনলে আমদের চোখের সামনে একটি শব্দ ভেসে ওঠে। আমরা মনে করি, হারাম রিলেশানশিপ মানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দুটো ছেলেমেয়ে একসাথে থাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুরছে, প্রেম করছে, অনেকটি সম্পর্কে ডুব দিচ্ছে। এটুকুই। অথচ বিয়ের পরেও যদি কোনো পুরুষ ঘরে যাই রেখে অন্য মহিলার সাথে অনেকিক, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, তবে সেটাও হারাম রিলেশানশিপ। সুমারির অগোচরে স্ত্রী যদি কোনো পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক করে, হাসে-মাতে, বিভিন্ন অনেকিক, অঙ্গীল, অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এটাও হারাম রিলেশানশিপ। এক কথায়, এ ধরনের সম্পর্কগুলোকে ‘পরকীয়া’ বলা হয়। এই রোগ আমদের সমাজে বর্তমানে মহামারির আকরণ ধারণ করেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজে বিদ্যমান এই পাপের কারণেই প্রতিদিন অসংখ্য পরিবারে ভাঙন ধরে। উভর আধুনিক সমাজে ডিভোর্সের যে মহামারি অবশ্য আমরা অবলোকন করি, তার অন্ততম প্রধান কারণগুলি হলো এই পরকীয়া।

একবার এক লোক একজন শাইখকে বললেন, ‘শাইখ, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আর ভালো লাগে না। কী করা যায় বলুন তো?’

শাইখ জানতে চাইলেন, ‘কেন? তোমার স্ত্রীর পুর্বের বৃপ্ত-লাবণ্য কি লোপ পেয়েছে?’

লোকটা বলল, ‘তি না, শাইখ। সে আগের মতোই আছে।’

‘তাহলে তার কি কোনো অজ্ঞানি হয়েছে যার কারণে তুমি তাকে আর পছন্দ করতে পারছ না?’

‘না, শাইখ। তার কোনো রকম অজ্ঞানি হয়নি।’

‘সে কি তোমার প্রতি উদাসীন?’

‘একেবারেই না শাইখ। সে আগের মতোই আমাকে ভালোবাসে। দেখাশোনা করে।

যত্ক করে।’

এবং শাইখ বললেন, ‘ঠিক আছে। এবার তাহলে তোমার কথা বলো। তুমি কি আজকাল পর্নোগ্রাফিতে আসস্ত হয়ে পড়েছ? তুমি কি বেগানা নারীদের কাছ থেকে নিজের দৃষ্টিকে হিকায়ত করে চলতে পারো? তুমি কি অন্য কারও সাথে কোনো অন্তিম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছ?’

শাইখ তখন বললেন, ‘তুমি যখন হারামে ডুব দেবে, হারাম জিনিসকে পছন্দ করা শুরু করবে, তখন হালাল জিনিসকে তোমার কাছে ভালো লাগবে না। বিরক্তিকর লাগবে। এটাই স্বাভাবিক।’

বাপারটা আসলেই তা-ই! আমরা যখন মিউজিক, গান-বাদ্য-বাজনা পছন্দ করা শুরু করি, তাতে আসস্ত হয়ে পড়ি, তখন কুরআনের সুর আমদের কানে পানসে ঠেকে। আমরা যখন সুমারি-স্ত্রীর মতো হালাল সম্পর্ক বাদ দিয়ে অন্যায়, অবৈধ, অনেকিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি, আমদের কাছে তখন হালাল সম্পর্কগুলোকেই বিরক্তিকর মনে হয়। মনে হয়, এই সম্পর্কের মাঝাজাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারলেই দেখ আমদের মুক্তি। এই অনীহা, অনিছা, ভালো না লাগা একসময় বৃপ্ত দেখ ডিভোর্সের মতন সিদ্ধান্তে। ফলে আমদের পরিবারগুলো ভেঙে খানখান হয়ে যায়। একটা অনেকিক সম্পর্ক মাঝাখানে নষ্ট করে দেয় অনেকগুলো মানবের জীবন আর সুখ। লক্ষণ্যভাবে করে দেয় তিলে তিলে গাঢ়ে তোলা কারও নিজসু জগৎ।

[৪]

এই পর্যায়ে কেউ কেউ যুক্তি তুলে ধরতে পারেন। বলতে পারেন, ‘ভাই! বাল্পান্তিক আপনি যতটা সরলীকরণ করেছেন, সেটা আসলে অতটা সরল নয়। কাল্পনিক কলিগের সাথে অবসরে বসে কফি খেলে সেটা তো আর অনেকিক সম্পর্ক সম্পর্ক না। এটা জাস্ট ফ্রেন্ডলি ব্যাপার।’

শাহিদ আলি তানতাবির রাইমাহার একটা কথা আমার খুব পছন্দের। কিছু কিছুই দেখে না। মেয়েদের সাথে তারা নাকি বন্ধুর মতোই কথা বলে এবং মেয়েদের বন্ধুর মতোই ভালোবাসে। মিথ্যে কথা! আল্লাহর শপথ, এসব মিথ্যে কথা বুজলে তাদের আজয় তোমাকে নিয়ে যে ধরনের কথা বলে তা যদি শুনে তাহলে তুমি ভয়ে চমকে উঠতে।’

শাহিদ তানতাবির কথাগুলোর নিয়েট ব্যক্তিবত্তা আছে। দুর্জন বন্ধুর একান্তী আলগে মাঝে তাদের সুন্দরী বাস্তুটা সম্পর্কে কী ধরনের কথাবার্তা উঠে আসে তা ন শুনলে বিশ্বাস করাটাই দুর্ভু! সেই রগরগে আলোচনাগুলো যদি সেই বাস্তু শুনে পেত, তাহলে সে কেনোদিনও আর তাদের মুখ দেখত না।

আপনি বলতে পারেন, কেবল কথা বললেই কিংবা তাকালেই কি পাপ হয় যাই। জি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘চোরের যিন হজা তার দিয়ে দেখা। জিহ্বার যিন হলো সেই জিহ্বা দিয়ে (অঙ্গীল, রগরগে) কথা কী হাতের যিন হলো পরমাণীকে (খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা। পায়ের যিন হাত ব্যতিচারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যিন হলো (ব্যতিচারে) ইহা এ আকাঙ্ক্ষা করা। আর এ সবকিছুকে কাজে বৃপ্তিস্তুত করে মানুষের গুণাঙ্গা।’<sup>[১]</sup>

হাদিসের ভাষ্য এখানে খুবই স্পষ্ট। চোখ দিয়ে আপনি ক্যাম্পাসের যে বল্পীটি বৃপ্তিবাদ্য উপভোগ করছেন, আপনি আসলে সেখানে যিন করছেন তার যিন। তার হাতে ফুল গুঁজে দেওয়ার নাম করে অথবা বন্ধুদের দোহারে নিয়ে তা হাত স্পর্শ করার যে কায়দা আপনি করে থাকেন, তা আসলে যিন। হাতে যি-

ন্ধুদের সাথে একান্ত আজড়ায়, চাটে কিংবা মোবাইল ফোনে বাল্পীদের নিয়ে যে অঙ্গীল, কুণ্ডিত আলাপে আপনি মেতে ওঠেন, তা ও একপ্রকার যিন। জিহ্বার যিন। বল্পী কিংবা কলিগের হাত ধরার জন্য, তার পাশে বসার জন্য, তার কথা শোনার জন্য আপনার মন যখন আকৃপাকৃ করে, তখনে আপনি আসলে যিন করেন। যখনের যিন। এই একান্ত কামনাগুলো মেটানোর উদ্দেশ্যে আপনি যখন ঘর থেকে যে হন, তখনে আপনি যিনার মধ্যেই থাকেন। পায়ের যিন।

সুতরাং ‘একটু কথা বললে সমস্যা কী?’ ‘একটু হাত ধরলে আপনি কীসের?’ ‘আমরা তো আর প্রেম করছি না, বন্ধুই তো’—এ সমস্ত কথা আসলে ঠুনকো অঙ্গুহাত মাত্র। শাহিদের একটা চোরা ঝাঁদ। একটা রঙিন চশমা যা পরলে দুনিয়াটিকেই রঙিন রঙিন মনে হয়।

[৫]

হারাম রিলেশানশিপের প্রতি পদেই ওঁ পেতে আছে বিপদ। এমন সম্পর্কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাপ্তির ছাড়াভিত্তি হাত্তা প্রাপ্তির খাতায় আর কোনো কিছু ঠোর সংশ্লিষ্ট নেই। অপরদিকে হালাল রিলেশানশিপের দিকে তাকান। কত সুন্দর আর যত্নের এই সম্পর্ক! শ্বারি দিকে আপনি যখন মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকান, যখন আপনি শ্বারি মুখে ভালোবেসে খাবার তুলে দেন, আপনি যখন স্বীর জন্য উপহার নিয়ে আসেন, তাকে নিয়ে দুরতে যান, তার পাশে বসে মন্ত্রমুখ হয়ে তার গুরু শোনেন—এ সবকিছুতে আল্লাহ সুন্দরনাকু ওয়া তাআলা আপনার জন্য সাওয়াব বরাদ্দ রেখেছেন। ফেরেশতারা তখন আপনার জন্য সাদাকার সাওয়াব লিখে ফেলে। অনাদিকে হারাম রিলেশানশিপে আপনি বেগোনা নারীর দিকে তাকালে, তাকে স্পর্শ করলে, তার সাথে কথা বললে, তার কথা চিন্তা করলে আপনার আমলনামায় গুনাহ যুক্ত হয়ে যায়।

হারাম রিলেশানশিপের অপর নাম দেওয়া যায় যিন। আর যিনার শাস্তি খুবই ভয়াবহ। দুনিয়াতেও, অধিকারেও। হারাম রিলেশানশিপ থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব সহজ নয়। সহজ নয় তাদের জন্য যারা দীনাংকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। যারা নিজেদের আঁশাকে আল্লাহর বদলে শাহিদের কাছে জমা দিয়ে রেখেছে, তাদের জন্য পতনের এই চোরাবালি থেকে মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য। তবে যারা আল্লাহর হয়ে যেতে চায়, যাদের জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সর্বকিছুই আল্লাহর ভালোবাসা, অনুগ্রহ আর দ্যাকে যিরে আবর্তিত হয়, তাদের জন্য এটা মোটেও কঠিন নয়। আল্লাহর দিকে

[১] সহিহ বুখারি: ৬২৪৩, ৬৬১২; সহিহ মুসলিম: ২৬৫৭

যারা মন থেকে ফিরে আসতে চায়, আজ্ঞাহ তাদের জন্য সকল প্রতিবন্ধকাতাকে নহজ  
করে দেন। তাদের হৃদয়ে ছেলে দেন প্রশান্তির সুনির্মল শুবাস। সেই শুবাসে বাদা  
রাতিয়ে নেয় তার যশিত জীবন। আজ্ঞাহর দিকে ফিরে আসার জন্য খুব অম্বকালো  
আয়োজনের দরকার হয় না। কেবল আন্তরিক তাওয়া আর চোখের পানিই তো!



## চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়

[ক]

ঘটনাটি শাইখ মুহাম্মদ আল আরিফীর কাছ থেকে শোনা। শাইখের কাছে একবার  
এক ছেলে এসে বলল, ‘শাইখ! ইন্টারনেটের ব্যাপারগুলো খুব ভালো বেঁধে এ  
রকম আমার একটা বখু ছিল। সে আবার পর্নোগ্রাফিতেও ছিল ভীষণরকম অসন্ত।  
একবার সে একটা পৰ্ন সাইটে ঢুক সেখানে সাবস্ক্রাইব করে ফেলে। সে যে সাইটে  
সাবস্ক্রাইব করেছিল, ওই সাইটে ছিল পর্নোগ্রাফি দেখা গেত না, বরং টাকার  
বিনিময়ে পর্নোগ্রাফির ফাইল ইমেইল করত ওরা। সে যখনই পর্নোগ্রাফির নতুন কানো  
ফাইল বিসিত করত, সেটা মোবাইলে ডাউনলোড করে নিয়ে পরে আমাদের দেখাত।  
আমরাও উপভোগ করতাম ভিডিওগুলো। অবাক হতাম, এত নিত্য-নতুন ভিডিও সে  
কীভাবে সংগ্রহ করে সেটা ভেবে।

যখন তার কাছে জানতে চাইতাম সে এগুলো কীভাবে, কোথাকে সংগ্রহ করে, তখন  
সে আমাদের আগ্রহকে একপ্রকার হেসেই উত্তিরে নিত আব বলত, ‘আবে ধূৱা!  
এগুলো টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ কৰি।’ আমরা বললাম, ‘সমস্যা নেই, আমরাও টাকা  
দিয়ে সংগ্রহ করব। তুই আমাদের বল এগুলো কেোথায় পাস?’ আমাদের কথা শুনে সে  
বলল, ‘তোরা শুধু শুধু টাকা নষ্ট কৰবি কেন? তাৰচেয়ে এক কাজ কৰা যাক। তোৱা  
তোদের ইমেইল এক্সেপ্লু আমাকে দে। আমি নতুন ভিডিও ফাইল পাওয়ামাত্রই  
তোদের সবাইকে একসাথে পাঠিয়ে দেবো।’

তার প্রস্তাবটা আমাদের খুব মনে থরল। ভাবলাম, ‘ভালোই তো। আমাদের টাকাগুলো বাঁচল, আবার ভিডিওগুলোও পাওয়া যাবে’ আমরা আমাদের ইতৃপ্তি হতে তার ইমেইল এড্রেস সংগ্রহ করে ওর কাছে লিলম। পরে সংজ্ঞা করি। এভাবে কেটে গেল হয় মাস।

একদিন ইঠাং রোড এক্সিটে আমাদের সেই বন্ধুটা মারা যায়। ওর মৃত্যুতে আমি কবরে শুইয়ে দিয়ে বাসায় এলাম, তখন আমার কোনে নতুন একটা ইমেইল হয়ে পড়ি। আমি অবাক বিষয়ে দেখলাম, যে বন্ধুটাকে আমি একটু আশে করে ফাইল এসে জমা হয়েছে। ভাবলাম হয়তো পুরাতন কোনো ইমেইলে নতুন পর্নোগ্রাফি সেবার এড়িয়ে গেলাম ব্যাপারটা। কিন্তু পরের সপ্তাহে দেখলাম ওর ইমেইলে এক আবরণ নেটিফিকেশন। এবারও পর্নোগ্রাফির ফাইল এসে জমা হয়েছে। এই ইমেইলটা ভালোমতো চেক করলাম। দেখলাম এটা পুরোনো ইমেইল না। একের নতুন। সাথে সাথেই ব্যাপারটা আমি বুঝে গেলাম। ও নিশ্চয় ইমেইলের ‘ছান্দোলা ফরওয়ার্ড’ অপশন অন করে রেখেছিল যার দুরুণ ও নতুন নতুন সেবা চিহ্ন ফাইল রিসিভ করেছে, সেগুলো একইসাথে আমাদের আইডিতেও চলে আসছে।

আমি উক্ত সাইটের অথোরিটির সাথে যোগাযোগ করলাম। ইমেইল করে আমাদের জানলাম যে, আমার ওই বন্ধুটি এখন মৃত। তাই তারা মেন তার আইডিতে এসব ভিডিও পাঠানো বন্ধ করে দেয়। ওই সাইটের লোকজন আমার কাছে তার ইমেইলের পাসওয়ার্ড জানা না থাকায় আমি সিদ্ধে পরিজ্ঞান না। তারা বলল, ‘দুঃখিত! তাহলে আমাদের আর কিছুই করার নেই। এই বার্ষিক এখনো সাতে চার বছরের সাবস্ক্রিপশন বাকি। পরবর্তী সাতে চার বছর তার ইমেইলে আমাদের ভিডিও ফাইল অটো চলে যাবে। সাবস্ক্রিপশন শেষ হলে ইমেইল আইডি থেকে প্রতি সপ্তাহে সে আর তার সাথে সাথে আমরাও আইডি ভিডিওগুলোর ফাইল রিসিভ করে যাচ্ছি।’

চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়। চীবনের উপাখান যেখানে পাপের বোৰা ঘোলায় আনেই সমান্ত। এটা এমন এক জীবনের উপাখান যেখানে পাপের বোৰা ঘোলার পরও বন্ধুর পরও বন্ধ বেজাতে হচ্ছে তাকে। কবরে থেকেও পেতে হচ্ছে অঙ্গীল ভিডিও। এই এমন এক জীবন্তিয়াতের মৃত্যু, যেখানে পাপের ভার কবরের চাপের পরও যাতে নামাত চাইছে না। যে হেলেটা এ রকম সাইটে চারটে বছরের জন্য সর্বস্তুপ্রশংসন করে রেখেছে এবং তা বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার সু-বন্দোবস্তও করে দোষে তার পাপটা বি সংজ্ঞাম নয়? সে নিজে যে পাপে আকৃত, জর্জিরিত, এই পাপ সে আরও অনেকের মাঝেও ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

যারা পৰ্নোগ্রাফিতে আস্তু, তারা বুঝতে পারে না কত বিশাল বড় পাপের পাহাড় তারা দুনিয়াতে করছে। এ রকম ভিডিওগুলোতে তাদের একটা ‘ভিট’ অনেক কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়। খুলে দেয় অনেক বিছুর পথ। এই ভিডিওগুলোর নিহিতাৰ্থ কেবলই দিনেন কিংবা মনোরঞ্জন নয়। মোটাদাগে ব্যবসা। তাই এসব ভিডিওতে আমার একটা ভিট এ রকম আরও দশটা ভিডিও বানানোৱ পথকে সুগাম করে। একটা ভিট এ রকম আরও অনেকগুলো ভিডিও বানানোৱ পেছনে ভূমিকা রাখে। ফলে যদিন পর্যন্ত এ রকম ভিডিও বানানো হবে এবং ইন্টাৰনেটে ছাড়ানো হবে, তার পেছনে আগনীয় একটা ভিডিয়ের ভূমিকাও চলমান থাকবে।

প্রতিটা খারাপ কাজ আরও অনেকগুলো খারাপ কাজের কারণ। প্রতিটা মিথ্যা কথা প্রতিটা খারাপ কাজের জনক। প্রতিটা অসত্তা আরও অনেকগুলো অসত্তার স্মৃতি পাপ একপ্রকার সংজ্ঞাক। সেটা ছড়িয়ে পড়ে বাস্তি থেকে বাস্তিতে।

হেলেটা জীবন্তিলা সাজা করে চলে গেছে। অর্থাৎ জারি রেখে গেছে একটা পাপের মৌশিম। সেই মৌশিমে নিয়া উৎপন্ন হচ্ছে হৰেকে পদের পথ। আর মৃত্যুর পরেও তার আমলনামায় যোগ হচ্ছে সেই পাপের দায়। ভয়াবহ! মৃত্যুর পরও রেহাই নেই। চলে গেছে, কিন্তু প্রশ্নান হয়নি।

অপরদিকে, আদ্যুলাহ জাহাঙ্গীর সারাও চলে গেছেন। রাহিমাতুল্লাহ। আজ্ঞাহ যেন তাকে সন্তুষ্ট মায়া-মত্তা দিয়ে জড়িয়ে রাখেন। উম্মাহুর জন্য তিনি রেখে গেছেন কিছু অমৃল সম্পদ। তার বইগুলো আজও বৃহৎ হৃদয়ে প্রশংসন প্রলেপ লাগায়। তার কাজগুলো থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মাহ উপকৃত হবে। কত পথহারা পথিক খুঁজে পাবে পথ। কত দিশেহারা নাবিক খুঁজে পাবে কুল। এই কাজগুলো থেকে যতদিন উম্মাহ উপকৃত হবে, ততদিন কি আদ্যুলাহ জাহাঙ্গীর স্যারের

আমলনামাতেও সেই সাওয়াব পৌছে যাবে না? সাদাকায়ে জারিয়া হিশেবে সারে আমলনামাও নিয়া ভারী হবে, ইন শা আল্লাহ! আবুল্লাহ আবাজীর শারত চলে গেছেন। তবে ওই যে, সব চলে যাওয়াই প্রস্থান নয়...

[খ]

মানবের ব্যাংকে টাকা জমিয়ে, ইন্সুরেন্স করে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা খেকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি করাতে চায়। ক্ষুদ্র এই জীবনের একটু নিরাপত্তা, একটু থাকা, একটু বাড়িত আয়েশের জন্য আমরা কত বাহারি আয়োজন-না করি প্রতিনিয়ত। অথচ আমাদের সমনে যে অনন্ত জীবনের হাতছানি, যে আপন সময়ের ভালো থাকা আর আরাম-আয়োশ নিয়ে আমাদের কোনো মাধ্যমাত্থা নেই। আমাদের স্নাতকে আনন্দের ভাসতে হবে অনঙ্গকাল, সেই জীবনের নিরাপত্তা, নিষ্ঠাতা, চিন্তাচেতনা, ধ্যানঞ্জান সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে দুনিয়াকে কেন্দ্র করে। আবিরামের রসদ গোছানোর জন্য আমাদের যেন কোনো তাড়া নেই। কিন্তু চক্র মুদলেই কি প্রলয় থেমে যায়? যায় না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আমাদের যতই আবীহ-অনিছাই থাকুক, মৃত্যুর চেয়ে সত্য আমাদের জীবনে আর কিছু নেই। দুনিয়ার কৃষি বাস্তবতা হলো এই—একদিন আমাদের মৃত্যু হবে। নশ্বর এই পথিকীর পাট চুকিয়ে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে এক অনন্ত জীবনের পথে।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সাথে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড় হয়ে যায়। আমরা প্রবেশ করি অন্য এক জগতে। তবে, মৃত্যু দুনিয়া থেকে আমাদের মুছে দিতে পারলেও, মুছে দিতে পারে না আমাদের কর্ম। সময়ের পাঠাতেন সেই কর্মসূলে অনিভিত্তের মাঝেও আমাদের অভিত্তশীল করে তোলে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লায় বলেছেন, ‘মৃত্যুর সাথে মানুষের সকল অমল বৰ্ণ হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ছাড়া। দান-সাদাকা, উপকারী জ্ঞান এবং নেককার সংস্কারণ।’<sup>[১]</sup>

অর্থাৎ দুনিয়ায় যখন আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, তখনও এই তিনটি কর্ম আমাদের জন্য সাদাকা হিশেবে জারি থাকবে। কবরে আমাদের জন্য নতুন নতুন সাওয়াব পাঠাবে। সেই সাওয়াব মুক্ত হবে আমাদের আমলনামায়। আমলের ঘাটিতে

[১] সহিত মুসলিম: ১৬১.

চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়

করলে যখন আমরা আল্লাহর কোনো পরীক্ষায় আটকে পড়ব, সাদাকায়ে জারিয়ার এই সাওয়াবগুলো তখন হতে পারে আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা। আবিরামের এই ব্যাংক সেদিন আমাদের জন্য হয়ে উঠতে পারে বিপদের সবচেয়ে বড় ব্রহ্ম। আবিরামের জন্য এমন একটি চলমান ব্যাংক তৈরি করতে হলে আমাদের কী করতে হবে? খুব সহজ! কেবল তিনটি কাজে জোর দিতে হবে।

#### সাদাকায়ে জারিয়া

সাদাকায়ে জারিয়া একটি চলমান সাওয়াব ব্যাংকের নাম। এই ব্যাংক নিয়া-নতুন সাওয়াব উৎপন্ন করে চলে। ধূরুন, আপনার অনেক টাকাপয়সা। সেই অনেক টাকাপয়সা থেকে আপনি কোথাও একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন এখন সেই মসজিদে যতদিন আয়ন হবে, যতদিন সেখানে মানুষ সালাত আদায় করবে, যতদিন সেখানে মানুষ কুরআন শিখবে, তিক ততদিন আপনার আমলনামায় তার সাওয়াব মুক্ত হবে। আপনি নিচে থাকাবস্থায় এই সাওয়াব তো পাবেনষ্টি, মারা সাওয়াব পুরণ এই সাওয়াব আপনার আমলনামায় অনবরত যুক্ত হতে থাকবে। চিন্তা যাওয়ার পরও এই সাওয়াব আপনার আমলনামায় অনবরত যুক্ত হতে পারছেন না, সিয়াম রাখতে পারছেন করুন, করবের জীবনে আপনি সালাত পড়তে পারছেন না, সিয়াম রাখতে পারছেন না, হজ-যাকাত-কুরবানি কোনো কিছুই করার আর সুযোগ নেই আপনার। কিন্তু দুনিয়ার আপনি একটি কাজ করে এসেছেন যার বদলিতে সালাত না পড়েও, সিয়াম না রাখেও, হজ-যাকাত-কুরবানি না দিয়েও করবে বসে সাওয়াব পেয়ে থাচ্ছেন! মসজিদ নির্মাণ ছাড়াও কৃপ খনন, টিউবওয়েল বসানো, এমনকি কোথাও যদি কোনো ফলের গাছ লাগান, সেই গাছ থেকে যদি পথচারী এবং পশুপাখি সকল নেক কর্মের ফল আপনার আমলনামায় জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হিশেবে গণ্য হবে।

#### নেককার সন্তানাদি

দুনিয়ায় আপনার সন্তানদের যদি ইসলামের সুমহান শিক্ষায় দীক্ষিত করেন, তাদের যদি মধ্যে ইয়ান, তাকওয়া আর ইখলাসের সম্বিবেশ ঘটাতে পারেন, তাদের যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগ্রহ আদর্শে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে আপনার মৃত্যুর পর আপনার সন্তানেরা আপনার জন্য ‘চলমান ব্যাংক’ হিশেবে ভূমিকা রাখবে। তারা প্রতিনিয়ত আপনার জন্য দুঃখ করবে। তাদের কৃত সকল নেক কর্মের ফল আপনার আমলনামাতেও সমানভাবে মুক্ত হতে থাকবে।

দুনিয়াতে যে উপকারী জ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন, সেগুলো যথন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, সেই জ্ঞান আধিকারতে আপনার জন্য সাওয়াবের 'চলাচল' ব্যাংক'-এর ভূমিকা পালন করবে। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের রাহিমাহ্মুদাহর লিখে যাত্রা বইগুলো পড়ে যখন কোনো বাস্তি আমল করে, নিজের আকিনা বিশুল্প করে, তখন এ কাজের জন্য ওই বাস্তি যে পরিমাণ সাওয়াব লাভ করে, ঠিক একই পরিমাণ সাওয়াব আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের আমলনামাতেও পৌছে যায়। আমরাও যদি এ ক্ষম বই কিংবা উপকারী জ্ঞান ছড়ানোর উপকরণ দুনিয়ায় রেখে যেতে পারি, তাহলে আশা করা যায়, এগুলোর বদৈলতে মৃত্যুর পর আমাদের আমলনামাতেও এ ক্ষম সাওয়াব যুক্ত হতে থাকবে, ইন শা আজ্ঞাহ।

মৃত্যুর মাধ্যমেই যেন আমাদের যুক্তি দুনিয়া থেকে মুছে না যায়। দুনিয়াতে না থাকা অবস্থাতেও যেন আমাদের কাজগুলো আমাদের হয়ে কথা বলে। আমাদের সাধকদের জরিয়া, আমাদের সন্তানদি আর আমাদের জ্ঞান যেন নিরস্তর সাওয়াবের 'চলাচল ব্যাংক' হিশেবে কাজ করে। আমরা চলে যাব ঠিক, কিন্তু আমাদের যেন প্রস্থান না হয়।

—১৯৩৫—

## বেলা ফুরাবার আগে

[ক]

বিজেইভা রত্নিঙ্গা পৃথিবীর বিখ্যাত একজন ফ্যাশন ডিজাইনার, ফ্যাশন বুগার কিংবা রত্নিঙ্গা পৃথিবীর নাম। অর্থ-কভি, বিন্ট-বেভে কিংবা মশ-খ্যাতি- একজীবনে এবং সেলিব্রিটি লেখকের নাম। অর্থ-কভি, বিন্ট-বেভে কিংবা মশ-খ্যাতি- একজীবনে 'অপ্রাপ্তি' বলে সম্ভবত কোনো কিছুই নেই তার বুলিতে। দুনিয়াকে হাতের মঠোয় 'প্রাপ্তি' বলে সম্ভবত কোনো কিছুই নেই তার বুলিতে। দুনিয়াকে হাতের মঠোয় পুরো যেলা রক্তিশেজ খুব সম্প্রতি কালারে আকৃত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর আগে পুরো যেলা রক্তিশেজ খুব সম্প্রতি কালারে আকৃত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর আগে পুরো যেলা রক্তিশেজ খুব সম্প্রতি কালারে আকৃত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর আগে পুরো যেলা রক্তিশেজ খুব সম্প্রতি কালারে আকৃত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর আগে পুরো যেলা রক্তিশেজ খুব সম্প্রতি কালারে আকৃত হয়ে মারা যান। এমন অক্ষণ্ট সীকারেষ্ট রঙিন কপোরেট দুনিয়া আমাদের কখনোই জানাবে না। রঞ্জিশেজ লিখেছেন—

'পৃথিবীর দামি ব্রাতের গাঢ়ি পড়ে আছে আমার গ্যারেজে। কিন্তু কী আশৰ্ম, সেই আশৰ্ম দামি আর চড়তে পারছি না! নিয়ন্ত্ৰণ দামি সব ডিজাইনের কাপড়ে গাঢ়িতে আমি আর চড়তে পারছি না! নিয়ন্ত্ৰণ দামি সব ডিজাইনের কাপড়ে গাঢ়িতে আমি আর চড়তে পারছি না! নিয়ন্ত্ৰণ দামি আর আমার গায়ে তোলা সম্ভব নয়। আমার ডুয়ার ভৱতি। কিন্তু আজ সেগুলো আর আমার গায়ে তোলা সম্ভব নয়। আমার সংঘর্ষে থাকে পৃথিবীর দামি ব্রাতের জুতো। সবচেয়ে দামি বাগটাই থাকে আমার দণ্ডহে। কিন্তু ভাগোর কী নির্মম পরিহাস, আজ সেগুলো নিতাণ্তই অকেজো আমার দণ্ডহে। কিন্তু ভাগোর কী নির্মম পরিহাস, আজ সেগুলো নিতাণ্তই অকেজো আমার দণ্ডহে। টককায় ভৱতি আমার ব্যাংক আয়কাউট, অথচ সেই টাকা আজ আর কোনো কাজেই লাগছে না। আমার অভ্যন্তরিক বাঢ়ি দামি দামি সব আসববপত্রে ভৱপূর, কিন্তু সেই আসববাবে শুয়ে আমি যে একটু আরাম করব, সেই শুয়োগ আর কই! হাসপাতালের ছেট বিছানায় আজ আমি কাতৰ। অথচ এমনও সময় ছিলো, পৃথিবীর যেকোনো প্রাণে যেতে মন চাইলে আমি আমার বাস্তিগত প্রেমে চেপে

দিবি চলে যেতে পারতাম! আমার জীবনে কোনো কিছুই অভিন্ন নেই। কিন্তু আজ আমি কেমন যেন নিঃস্মৃৎ!

অর্থক্ষি উপর্জনের জন্য যে মানুষটা নিজের গোটা জীবনটাই ব্যাক করছে, জীবনের সবচেয়ে দামি পোশাক গায়ে দিয়ে সেই টাকা, সেই অর্ধ তার কেনে কাঙ্গাই আর লাগছিল না। ও প্রাণ, সময়ের পরিক্রমায় হাসপাতালের দেওয়া রঙিন একটা চাদর বাঁচাই আর আধুনিক মানের ভেট না হলে যার চলতাই না, সে কিনা বলি হয়ে পাঢ়ে হুইল আসলে একটা মরীচিকার নাম যেখানে মৃত্যুই হলো ধূব সত্য। দুনিয়ার জীবন বিশ্বাস একটা নটামক্ষের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র। রাস্তুল সাজাইছে, আলাইছে ওয়া সাজাই বলেছিলেন, ‘এই দুনিয়ার উপমা হলো এমন এক মুসাফিরের মতো, যে তার প্রমাণে বের হয়েছে। পথিমধ্যে ক্রাস্ট লাগছিল বলে সে একটা গাছের ছায়ায় এক্ষু বিশ্বাস নিয়ে আবার পথচার আরস্ত করেছে।’[১]

পথিকের দীর্ঘ সফরটা কিছু দুনিয়ার জীবন নয়। সেই সময়টা আরও বহু মাঝে প্রলিপ্ত। কেবল গাছের ছায়ার নিচে সে যে সময়টুকু ব্যাক করেছে, ওইটুকুই হলো দুনিয়ার জীবন! মানে, একটা সুদীর্ঘ সময়ের যাত্রায় কেবল খুব অল্প কিছু সময়ের বিশ্বাসের নামই হলো দুনিয়া।

মানুষের জীবনে মৃত্যুর মতন নির্মম সত্য আর কিছু নেই। অথচ সেই নির্মম সত্যকে, সেই অখণ্ডনীয় বাস্তবতাকে অঙ্গীকার করার জন্য আমাদের কত তোড়েজড়া। আমরা মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই। কিছু পালাতে গিয়ে আমরা মৃত্যুর আরও সম্মিকটে চলে আসি। মৃত্যু আসলে আমাদের তাড়া করে না। মৃত্যু তার নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষারত। সময়ের পরিক্রমায় আমরাই বরং মৃত্যুর দিকে ছুটে যাই নিরস্তর।

ধূকপুরু ধূকপুরু শব্দে বেজে চলে আমার হঁপিঞ্চ। এই কথার অর্থ দুটো। প্রথমত, আমি এখনো জীবিত আছি, আর বিতীয়ত, আমি একদিন অবশ্যই মারা যাব। বিজ্ঞানের

তাপস্তিবিদার দ্বিতীয় সূত্রে আমরা পড়েছি, প্রম একটি কফির কাপকে টেবিলের পের রাখা হলে সময়ের ব্যবধানে সোটি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকবে। তবে সোটি কখনোই আরও বেশি গরম হয়ে উঠবে না। তাপস্তিবিদার এই সূত্র মানুষের জীবনের সাথেও অঙ্গুত্বাতে নিলে যাব। মাহগার্ডে হেদিল আমাদের প্রাণকণা সঞ্চারিত হয়েছিল, ঠিক সেদিন থেকেই আমারের জীবনের উর্তৃতার শুরু। এরপর দীরে দীরে সেই উর্তৃতা আমরা হারিয়ে চলেছি। প্রতিনিয়ত হারিছি হাত। এমন একটা সময় আমাদের সামনে উপস্থিত হবে, যখন আমরা সম্মত উর্তৃতা হারিয়ে স্তপ্ত, ঠাণ্ডা, শীতল হয়ে যাব। সেদিন ছিলিম হবে আমাদের জাগতিক সকল বৈধন। এর নামই মৃত্যু।

মৃত্যু সম্পর্কে আদৃত্বাত ইন্বন সালাবাহ বিদিয়াজ্ঞ আনন্দ বলেছেন, ‘তুমি দুনিয়ার জীবন নিয়ে মৃত্যু, অথচ, হতে পারে তোমার কাপড় ইতোমধ্যে খোপার কাহে চলে এসেছে।’[১]

তার কৰসত্ত কথা! এই যে আজ আমি দুনিয়ার স্থানে গা ভাসিয়ে চলছি, আবিরাতের চিত্ত হ্যায়-মন থেকে বেড়ে ফেলে দিয়েছি, আমি কি নিষিদ্ধ যে আগামীকালকের যাত্রা হ্যায়-মন থেকে বেড়ে ফেলতে পারব? আজকেই যে আমার জীবনের শেষ যাত্রা প্রতাতে আমি দুচোখ মেলতে পারব? আজকেই যে আমার জীবনের ক্ষেত্রে দিন নয়, জীবনের শেষ সকালটা যে ইতোমধ্যে আমি পার করে ফেলিনি, তার পুরী নিষ্কাটা? আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমার কাফনের কাপড় তো হীন নিষ্কাটা? আজ আবার মৃত্যু হয়, অপেক্ষা কেবল একটি নিলিট মৃত্যুরে। যে মৃত্যুর সেকানদারের কাহে আমার মৃত্যুসংবাদ পৌছাবে আর তিনি সাড়ে তিন হাত কাপড় কেটে নিয়ে আমার শেষ বিদায়ের জন্য প্যাকেট করে দেবেন।

যদি আজ সত্ত্বাত আমার মৃত্যু হয়, আমি কি তাহলে আলাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত? মৃত্যুর আগে শেষ ওয়াক্তের সালাতে আমি কি হাজির ছিলাম? যেদিন আমার মৃত্যু হয়, সেদিন আমার ঘরের টেলিভিশন কতবার অন-অফ হয়েছে আর কুরআন কতবার খোলা-বোধ হয়েছে? মৃত্যুর আগের সময়টাতে কতবার আমার ঠোঁটে আলাহর যিকির গুরুরিত হয়েছে আর কতবার অহেতুক আলাপে মৌজ-মাসিত করে আমি সময় কাটিয়েছি?

[খ]

দুনিয়ার জীবন নিয়ে সৃজনীর একটি উপলব্ধি আছে ইমাম গাজালি রাহিমাঙ্গালাহ। তিনি বলেছেন, ‘একজন লোক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটা সিংহ দ্বারা ধাওয়া করতে শুরু করে। সিংহের থাবা থেকে বাঁচতে লোকটা প্রাণপনে লোকাতে লাগল। লোকটা দেখল, কাছেই একটা কৃপ। সে ভাবল, এই কৃপে বাঁপ দিলে সিংহের হাতল থেকে হাতে বাঁচা যাবে। সেই ভাবা সেই কাজ। লোকটা সিংহের ভাল থাবা থেকে বাঁচতে ওই কৃপের মধ্যেই বাঁপ দিল। কৃপে বাঁপ দিয়ে লোকটা কেনেভাবে এসে দড়ি আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হলো। ফলে, সে একেবারে কৃপের গভীরেও গিয়ে পড়ল। লোকটা ভাবল, ‘যাক বাবা, এই যাত্রায় অস্তত বাঁচা দেল।’ কিন্তু পরক্ষণেই কৃপে নিচে দৃঢ়ি পড়লার সাথে সাথেই লোকটা একেবারে চমকে উঠল। দেখল, কৃপের নিচে বিশাল আকৃতির একটি বিষমধর সাপ হাঁ করে আছে তাকে সিংহে খাবার জন্য। এবং লোকটা ওপরে তাকাল। দেখল, কৃপের মুখে অপেক্ষমাণ আছে সেই ভয়কর সিংহ।

একটু পরে কোথেকে যেন একটা সাদা ইন্দুর আর একটা কালো ইন্দুর এসে লোকটার জড়িয়ে ধরা দড়িটা কুটকুট করে কাটতে শুরু করেছে। অবশ্য তো শুধুই ভানকা ওপরে সিংহ, নিচে সাপ। মাঝখানে এই ইন্দুরদের চরম শত্রু। মৃত্যুকে ঢেকানোর কোনো উপায়ই আর অবশিষ্ট নেই।

হঠাতে লোকটার সামনে কোথেকে একটা মধুর চাক আবির্ভূত হলো। সেই চাক থেকে চুইয়ে চুইয়ে মধু পড়ছে। লোকটা এক হাতে সেই মধু নিয়ে মুখে পূরে দিল। মধুর স্বাদ আর মিষ্টতা লোকটাকে ওপরের সিংহ, নিচের সাপ আর সেই দুই শত্ৰু ইন্দুরের কথা একদম ভুলিয়ে দিল।

গল্পটি বলার পরে ইমাম গাজালি রাহিমাঙ্গালাহ মন্তব্য করেছেন, ‘সিংহটা হলো মৃত্যু যা নিয়তই আমাদের তাড়া করে বেঢ়াচ্ছে। সাপটা হলো করব যার মধ্যে সকল বন আদমকে যেতে হবে। দড়িটা হলো মানুষের জীবন। সাদা ইন্দুর আর কালো ইন্দুর হলো দিন এবং রাত যা প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনটাকে সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। আর মধুটা হলো দুনিয়া। দুনিয়ার মোহ, মিষ্টতা আমাদের মৃত্যু (সিংহ), করব (সাপ) এবং সেই দিনের কথা ভুলিয়ে দেয় যেদিন আমরা সকলে আলাহর সামনে পুনরুদ্ধিত হব।

কত অর্থবহুল ভাবনা, দেখুন! মৃত্যু একটা সিংহের মতন। একটা ভয়ংকর, ত্যার্ত বাস্তবতা। মাতা নামক সেই সিংহের থাবা থেকে আমার-আপনার কারোরই নিন্দার

নেই। কবর হলো সাপের সেই হী করা মুখ আর দড়িটা হলো আমাদের জীবন। সারা আর কালো ইন্দুর হলো দিন আর রাত। একটি করে দিন আর রাত পার হচ্ছে মানে জীবনের সেই দড়ির কিছু অংশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। ছিঁড়ে যাচ্ছে। হস্তান আল বাসরি রাহিমাঙ্গাল বলতেন, ‘মানুষ হচ্ছে সময়ের সমষ্টি। জীবন থেকে একটি দিন গত হওয়া মানে মানুষের একটা অংশ গত হয়ে যাওয়া।’<sup>[১]</sup>

এভাবে মেরিন সেই ইন্দুরের সম্পূর্ণ দড়িটাকে কেটে ফেলবে, ছিঁড়ে ফেলবে, সেদিন আমরা নিষ্ঠিত হব সাপের পেটে অবস্থার করবো। কিন্তু একসব বাস্তবতা রেখে, মৃত্যু আমরা ছাড়ে। আমরা ছাড়ে যাই আমাদের নিষ্ঠিত মুনিয়ার মোহের পেছনে আমরা ছাড়ে কেবল নিরস্তর। আমরা ছাড়ে যাই জীবনটাই সত্তা, অমোহ। গন্ধুরের কথা। আমরা বিয়ুত হই সেই জীবনের ব্যাপারে, যে জীবনটাই সত্তা, অমোহ।

[গ]

সময়ের সাথে সাথে সুনিরো যাচ্ছে আমাদের জীবন। অস্তিম মৃত্যুটা আস্তে আস্তে সামনে কাছে চলে আসছে। মৃত্যু যে অমোহ, অবধারিত, এ ব্যাপারে আমাদের মনে কেনে সন্দেহ নেই। কুরআন দ্বারা কঠো ঘোষণা করেছে—

كُلْ شَبِّنْ ذَاقِيْلَهُ الْمُؤْتَ

নিচ্য সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।<sup>[২]</sup>

একদিন আমরা নিষ্ঠিতভাবে মারা যাব, ছেড়ে যাব এই রঙিন দুনিয়া। ছেড়ে যাব আমাদের সকল আর্যাতার বধন। সমন্ত কিছু জেনেও আমরা কি মৃত্যুর জন্য আমাদের খাদ্যপানীয়নিহীন মুরুভূমির পথে রওনা করে কথানো? নাবিক খুব তাড়া যায়াবর খাদ্যপানীয়নিহীন মুরুভূমির পথে রওনা করে কথানো? নাবিক খুব তাড়া করেই জানে, জাহাজ ছাড়া সমুদ্রযাত্রায় তার ধৰ্মস অনিবার্য। যায়াবর জানে খাদ্যপানীয় ছাড়া মুরুভূমিতে তার মৃত্যু সুনিষ্ঠিত। অবশ্যাঙ্গীয় ফলাফল জেনেই তারা অযোজনীয় রসদ সংগ্রহ করে নিজ নিজ যাত্রায় পাঢ়ি জমায়। কিন্তু আমাদের সামনে যে অনন্ত যাত্রা, যে অসীম সময়-সমূলে আমাদের অবগাহন, সেই যাত্রার

[১] কিত্ব্যম যুহদ, পাঞ্চ : ১২৫

[২] সুরা আলে ইমরান, অয়াত : ১৮৫

জন্য কি আমরা কোনো রসদ মজুদ করি? সময়ের শেষ ঘট্টটা বেজে ওঠার আশেই  
কি আমাদের উচিত নয় যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়া?

অতিশয় সত্য কথা হলো এই—মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা চূড়ান্তরূপে উদাসীন। অঙ্গ  
আমাদের সোনালি প্রজন্মের সোনার মানুষগুলো মৃত্যুকেই জীবনের লক্ষ্য বনানো  
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি প্রহণ করাই ছিল তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইবনু উমার  
বাযিয়াজাহু আছে বলেছেন, ‘একবার রাসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা  
কাপড়ের একটা অংশ ধরে বলেছেন, পৃথিবীতে আগস্তুকের ন্যায় জীবনযাপন করো।’

রাসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু উমারকে আগস্তুকের ন্যায় বাঁচতে বলেছেন।  
আগস্তুকের মতো থাকা মনে হলো নিজেকে এই দুনিয়ায় থিত মনে না করা। এমন  
না ভাবা যে, এই দুনিয়াই আমার সব। আমি কখনোই এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হব  
না; বরং দুনিয়ায় আমাদের থাকতে হবে আগস্তুকের মতো। এমনভাবে, মেন আমরা  
এখানে মুসাফির। এক সুদীর্ঘ সফরের মাঝে দুনিয়ার জীবন খুব অল্প কিছু সময় মাত্র।

দুনিয়ার জীবনে কীভাবে বাঁচতে হবে, সে ব্যাপারে আবশ্যিক ইবনু উমার বাযিয়াজাহু  
আনন্দ বলেছেন, ‘থখন সম্ভ্যা উপনীত হয়, তখন সকালের জন্য অপেক্ষা করো  
না। আর সকাল উপনীত হলে সম্ভ্যা জন্য অপেক্ষায় থেকে না। তোমার সুখতা  
থেকে কিছু সময় তোমার অসুখতার জন্য বরাদ্দ রাখো এবং সময় থাকতে মৃত্যুর  
জন্য পাথের সংশ্রান্তি করে নাও।’<sup>(১)</sup>

সম্ভ্যায় জীবিত আছে এমন সোক যে পরের দিন সকাল পর্যন্ত বাঁচতে থাকবে, সেই  
নিশ্চয়তা নেই। আবার সকালে জীবিত আছে এমন লোক যে সম্ভ্যা অবধি বাঁচতে থাকবে,  
সেটাও অনিচ্ছিত। আমাদের জীবন এতটাই টুকুকো, ভঙ্গুর এবং অনিশ্চ্যাতায় ভর।

আমাদের জ্ঞেয়ের ক্রমধারা আছে, কিন্তু মৃত্যুর কোনো ক্রমধারা নেই। মৃত্যু কোনো  
ক্রমধারায় বিশ্বাস করে না। আমার পিতা আমার আগে জন্মেছেন। তার আগে কখনোই  
আমি দুনিয়ায় আসতে পারি না। তবে, আমি যে আমার পিতার পরে মারা যাবো,  
সেই নিশ্চয়তাটুকু কেউ দিতে পারে না। মৃত্যুর ক্রমধারা নেই জেনেও, আমরা কি

(১) জামি তিরমিদি: ২৩৩৩

(২) সহিত বৃথারি: ৬৪১৬

আমারের কৃত পাপ কাজ হতে নিবৃত্ত হতে পেরেছি? ‘যে-কোনো মৃহূর্তে, যে-কোনো  
অব্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে’—এই অমোদ সত্য বৃত্তাতে পেরেও আমরা  
কি আমাদের প্রকালের পাথের সংগ্রহের ব্যাপারে আবো তৎপর? অথচ আমাদের  
সোনালি প্রজন্মের মানুষগুলো আলাহর ক্ষমালভের জন্য কতটাই-না বাকুল হিসেব।  
ভুলে যাব পাপ হয়ে যেত, তাওবা করতে তারা এক মৃহূর্ত দেরি করতেন না। পাপের  
তপ্র আলো থাকতেন না এবং পাপকে লুকিয়ে লুকিয়ে বৃথি করতেন না। এমনকি  
পাপ থেকে পবিত্র হতে তারা মৃত্যুকেও বরণ করে নিয়েছিলেন হাসিমুর্খে।

ইসলামে যিনা তথা ব্যতিচারের শাস্তি হলো রজম। পাথর নিষ্কেপ করে হত্যা।  
রাসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একবার এক ব্যতিচারিনি এসে  
বলল, ‘হে আলাহর রাসূল, আমাকে পবিত্র করুন। আমি যিনি করেছি। যিনির  
দায়ে আমি এখন গৰ্ভবত্তা।’ রাসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তুম  
কি সত্যই গৰ্ভবত্তা?’ মহিলাটি বলল, ‘হাঁ।’ তখন আলাহর রাসূল মহিলাটিকে  
চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বললেন, ‘তুম চলে যাও। তোমার গর্ভের স্তন  
ভূমিত হলে তারপর এসো।’ মহিলাটি চলে গেল। কয়েক মাস পরে যথন গর্ভের  
সেই স্তন ভূমিত হলো, তখন সেই মহিলা আবার রাসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া  
সাল্লামের কাছে এসে বলল, ‘হে আলাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। আমার  
গর্ভের স্তন জম্মনাভ করেছে।’ তখন রাসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
মহিলাটি স্তনে উপনীত হলু ছাড়ার বাসে উপনীত হলে এসো।’  
বললেন, ‘তুম চলে যাও। তোমার স্তন দুধ ছাড়ার বাসে উপনীত হলে এসো।’  
মহিলাটি স্বারও চলে গেল। এরপর যথন বাচ্চাটি দুধ ছাড়ার বাসে পৌছাল, তখন  
সেই মহিলা বাচ্চার হাতে এক টুকরো ঝুঁটি ধরিয়ে দিয়ে পুনরায় রাসূল সাল্লাম  
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো এবং দেখেন যে তখন থাকা ঝুঁটির টুকরো  
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো এবং মহিলার গায়ে সেই পাথরের  
রায়িয়াজাহু আনন্দ একটা পাথর নিষ্কেপ করেন ওই মহিলার গায়ে সেই পাথরের  
আবাতে মহিলার মাথা ফেটে ফিলকি দিয়ে রক্ত এসে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ  
রায়িয়াজাহু আনন্দ গায়ে লেগে যাব। তিনি তখন মহিলাটিকে তিরস্কার করতে শুরু  
করেন। রাসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রায়িয়াজাহু  
করেন। রাসূল সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রায়িয়াজাহু  
আনন্দকে বললেন, ‘খালিদ, ধারো! তার ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য করো  
না। আলাহর শপথ! সে এমন তাওবা করেছে, এ রকম তাওবা যদি দেখে বড়

জালিমও করে, তাহলে আমাই তাকেও ফুর্মা করে দেবেন।  
যিনার মতন গুরুতর পাপের বোনা হবে।

की प्राणान्तक चेटो ओ इ महिलार! एमनकि बाजार हाते बृत्त शरियो दिये थाएँ अपने करलेन थे, तार वाका दुख छेड़े दियोछे। एटा करार करव लग्ये, याते फैसिलि ताकथा विश्वास करेन। ताके आर फेरत ना पाठ्यान। नविल चाहिले एक्षत तार शान्ति वास्तव्यान करते पागेन। महिलाति जानत, समय धारक ताजाहर करनेवाले करते ना पारले तार आखिरतेर अनंत जीवन धर्म होये यावे। ताति पापों बोआ थेके मृत्त हते मृत्ताके वसियुमे वरध करे निते दिया करनेवाले करते ना पारले तार आज जीवित आहि, आमादेवर पापगुलों वायापारे करनेवाले आमरा एतावे भेवेहि? कथनो कि निढ्यते आजाहर काहे अनु वारियोड्ये किं कारतेर ताहाज्जुदे दुश्यात तुले वेळेहि—‘परयोदारिनियास! जीवन्तीचे आपादक वर्धात्याव भरे फेलेहि। जमिनेव ओपरे एमन कोणो पापों अनिष्ट नेवी वामरा द्वारा हय्यनि। आज लज्जित मुख, अबनत मष्टके, आकुल दिये आपादक मायार्थना कराहि। आपनि वाचित आमादेवर आर कोणो इलाह नेवी। नेवी कोणो अप्रयस्तु। आपनिहि आमादेवर आशा, भरसा एवं निर्भरतार धधम आर शेष यग्या। आपनि यदि क्षमा ना करेन, ताहले आमि क्षतिग्रस्तदेवर अकृत्तु करन्वाले। आपनार शीमाहीन दयार भाऊर थेके आमार जन्या बिकू दया बराद करन्वाले।

জীবন হলো সময়ের সমষ্টি। কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে আমরা ‘ইমালিলাই’ ওয়া ইমা ইলাইই রাজিউন’ পড়ি। আমাদের জীবন থেকে প্রতিদিন একটি করে মূল্যবান দিন হারিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, জীবন থেকে হারাতে থাকা এই সময়গুলোর জন্য আমরা কি কথনো ইমালিলাই পড়ি? রাশুল সাল্লামাতু আলাইই ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন একশে বার তাওবা করতেন।<sup>১৩</sup> আমরা করতে তাওবা করি প্রতিদিন। অথবা প্রতি সপ্তাহে? কিংবা প্রতি মাসে?

সময় থাকেতো তাওয়া না করায়, দ্বিমান না আনন্দ নবিজির সুমহান সুজু, নবিজির প্রায়ত্বে চাচা আবু তালিবের স্থান হবে জাহাঙ্গীর। এমনকি তার জন্ম নবিজিকে দুআ করার অনুমতিকুণ্ড দেওয়া হ্যানি। ভাবুন তো, বেলা ফুরাবার আগে যদি আমরা নিজেদের

১] সুনামু আবি দাটেম : ৪৪৪৪, হাদিসটি সহিহ

২] সহিত মুসলিম : ২৭০২

বেলা ফুরাবার আগে

ମୁଣ୍ଡଲ୍‌ବର୍ଷ ଜନ ଅନୁତକ୍ତ ନା ହିଁ, ଯଦ୍ବା ନା ଚାଟି, ନା ଶୁଧରାଇ—ଆଖିରାତେ ଆମାଦେର ସ୍ଥାନ  
ବେଳାର ହେବେ ସମ୍ରା ଥାକିତେ ଯାର ଆହାରର ଅବ୍ୟାହତା ଥେବେ କିମ୍ବା ଆଦେନି, ଯାରା  
ନିଜରେ ଜୀବନକ ଜୀବିତିଲାଭର ଓପରେଇ ସମାପ୍ତ କରିଛେ, ଆଖିରାତେ ତାର ବାରାବାର  
ଆମ୍ବାଦ କରନ୍ତେ ଥାବେ ଯାର ଦୁନ୍ୟାର ସେବି ନିଜେଦେର ଆସିରାତ ସଂଖ୍ସ କରେ ଫେରି,  
ମୁହଁ ପର ତାର ବଳବେ, ‘ହୟା ଆମି ଯଦି ମାଟି ହେଁ ଯେତାମା! ।’[୧] ଦୁନ୍ୟାର ଜୀବନ ନିଯମେ  
ଯଦି ଏହି ନା ଉପଭୋଗ କରି ତୋ କବେ? ଅଥବା ତାମର ଭୁଲ ଯାଇ, ମୁହଁ ଯୈବନ ବୋଲେ  
ନା ବୋଲେ ନ ବୃଦ୍ଧବ୍ୟା ବିଲବା ଶୈଶବା ଆଖିରାତେ ପାଥେର ଶାଶ୍ଵତ ବ୍ୟାଟିତିହି ଯଦି  
ଆମାଦେର ପଢି ଜମାରେ ହ୍ୟ ଆଖିରାତେ ପଥେ, ତାହାର ସେବନ ଆକାଶସନ କରେ ବଳବ୍,  
‘ହୟା ଯଦି ଆମି ପରକାଳେର ଜନ କିଛି କରନ୍ତାମ! ।’[୨] ନିଜେଦେର ପାପେ ଭାର ଆମଲନାମା  
ଦେଖେ ସେବନ ଆମି ଭୋଲ ଚମକି ଉଠିବା କାରାଗ, ଏ ଯେ ଆମର ପାପେର ଖତିଯାନ ଜୀବନେର  
ସବ୍ଲ ମୁହଁର୍କ, ସବ୍ଲ କୃତକର୍ମ ତାତେ ଲିପିବଳ୍ପ。 ସେଇ ଆମଲନାମା ଦେଖେ ଆମି ବଳବ୍  
‘ହୟା ଆଜକେ ଆମାକେ ଯଦି ଆମର ଆମଲନାମା ଦେଓୟା ନା ହତୋ! ।’[୩]

[৪]

কেউ যদি বলে যে সে কারও দাসত করে না, তার কোনো প্রভু নেই, নিয়ন্ত্রক নেই,  
তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। অতিটা মানুষ অবশাই কারণ-না-কারণ দাস। যা সে  
আহারের দাসত করে, নয়ত সে তার নিজের প্রত্যঙ্গির দাসত করে। এজনেই ইবনুল  
কাশিয়াম বাহিমাঙ্গল বলেছিলেন, ‘হে আদম সাত্তান! তুমি যদি এই দুনিয়াকে  
আবিষ্ঠারের বিনিময়ে বিক্রি করো, তাহলে নিশ্চিত থাকো, তুমি দুনিয়া এবং  
আবিষ্ঠার উভয়ই লাভ করবো। আর যদি তুমি আবিষ্ঠারের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয়  
করো, তাহলে তুমি দুর্ভাগ্যেই হয়বে।’

ফুটাইল ইবন হিযায় রাহিমাইয়াহকে বলা হলো, ‘আপনার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্জনক দ্বাপার কোনটি?’ তিনি খলেনে, ‘আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি একজন মানুষ আলাহ সংস্কর্কে জানে, তথাপি সে আলাহই অবধি হয়।’

[১] সুদা নাব। আয়ত্ত : ৪৯

[১] সুরা ফজল, আয়াত : ২৪

[৩] সুরা অক্তাহ, আয়াত : ২০

বেলা ফুরাবার আগে

তাবুন তো! ফুয়াইল ইবনু ইয়াখ কি কথাগুলো আমাদের জন্য বলেননি? আমরা মুখ্যমূলি হতে হবে বিচার দিবসে। আমরা কবর, হাশর-মিয়ান এবং একবিন সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। এরপরও আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে নিয়মিত এরপরও আমরা সুদ নিই, ঘূস খাই, সোক ঠকাই, মিথ্যা কথা বলি। আমরা আবাহকে চিনি ঠিকই, কিন্তু মানতে চাই না। এরচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে? দুনিয়ার সবকিছুর জন্মই আমরা প্রস্তুতি নিই। চাকরির জন্য, ক্যারিয়ার, বিয়ে, এমতি নিয়ে বাজার-সদাই করার জন্যও আমাদের একটা প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু আমাদের কেবল প্রস্তুতি নেই মৃত্যুর জন্য। ফরয় সালাতের বাইরের সুরাত সালাতগুলো আমরা সময় থাকলেও আদায় করি না। অলসতা করি। অর্থচ কবরের জগতে এমন কত মনুষ আহাজারি করছে দুনিয়ায় কিন্তু এসে একাগ্রচিত্তে আজ্ঞাহকে একটা সিজদা করার জন্য। তারা আফসোস করছে কেন তারা দুনিয়ার সময়গুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়নি।

بِأَيْنَا نُرْدُ وَلَا يَكْتَبْ بِإِيَّاتِ رَبِّنَا وَنَكْثُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হায়! যদি আমাদের পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো হতো, আর আমরা আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করতাম এবং আমরা হতাম  
সৈমান্দারদের শামিল।<sup>[১]</sup>

বেলা ফুরাবার আগে  
বেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে ফ্রমশ। আসুন হচ্ছে আজ্ঞাহর প্রতিশুত সময়। আজ্ঞাহ বলেছে—  
اَنْزَلْتَ لِلشَّيْسِ جَسَابَتْهُ وَفَنْ فِي خَلْقِكَ مَعْرُطْوَنَ  
মানুবের হিশেব-নিকেশের সময় আসুন। অর্থচ তারা উদসীনতায় মুখ  
ফিরিয়ে রেখেছে।

জীবনের বেলা একেবারে ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের জীবনতারীকে নির্বিয়ে  
কূলে ভেঙ্গে হবে। সেই কূল, যে কূলে আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। নেই কোনো  
মৃত্যুপোর গঢ়।

—৩৪—

আমরা কি জানি আমাদের জীবনের শেষ দিন কোনটি? শেষ অংশ আর শেষ আমল  
কোনটি হবে? জানি না। আজকের দিনটাও তো আমার জীবনের শেষ দিন হতে  
পারে। আজকের অংটুকুই হতে পারে আমার জীবনের শেষ অংশ। আজকের  
আমলটুকুই হতে পারে আমার জীবনের শেষ আমল। আজকেই যদি আমার জীবনের  
শেষ দিন হয়, তাহলে আজকের দিনটিকে আমার জীবনের সেৱা দিন বানাতে হলে  
আমাকে ঠিক কৌ করতে হবে? আমার আজকের আমলটুকুই যদি জীবনের শেষ  
আমল হয়, তাহলে আমার আজকের দিনের আমলগুলো ঠিক কেমন হতে হবে?

[১] সূরা আনআম, অয়াত : ২৭

[১] সূরা আনআম, অয়াত : ০১



## মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

[ক]

‘মানুষ’ শব্দের আববি প্রতিশব্দ হলো ‘নাস’। প্রসিদ্ধ মতানুসারে শব্দটি পথ ভুলে যাব, বিস্মিত হব, বিচ্ছান্ত হব বলেই আমাদের নাম নাস তথা মানু। আলাইহিস সালাম এবং মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামও নিজেদের কৃত ওয়াজ থেকে খানিক সময়ের জন্য বিস্মিত হয়েছিলেন। ভুল করে তারা সেই গাছের ফল আমাদের সুভাবজাত মেশিষ্ট।

আমরা ভুল করব জেনেই আলাই সুবহানাহু ওয়া তাআলার দুটো গুণবাচক নাম গাফুর ও রাহীম। ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। এই বিশ্বচরাচরে তার মতন ক্ষমার অধিকারী দ্বিতীয় আর কেউই নেই। নবিজি সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, ‘সকল আদম সত্তানই গুনাহগার। তবে তাদের মধ্যে উন্নত সে, যে তাওবা করে।’<sup>[১]</sup>

আরেকটি হাদিস থেকে জানা যায়, নবিজি সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, ‘সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ না

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

করতে, তাহলে আলাই সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত এবং তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করত। ফলে আলাইও তাদের ক্ষমা করতেন।’<sup>[২]</sup>

যে বান্দা ভুল করে, যে বান্দা আগামোড়া পাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তার জন্যও তিনি রহমতের দরজা বন্ধ করে দেন না। কোনো গুনাহগার বান্দার জন্য তিনি বাতাসের প্রবেশেন থামিয়ে দেন না, আকাশের বৃষ্টি থামিয়ে দেন না, থামিয়ে দেন না সূর্যের আলো, মেঘ, রাতের জ্বোল। বান্দা অনবরত ভুল করে আর তিনি অবিরত সুযোগ দিয়ে যান। আপক্ষের থামেন বান্দার রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের। কখন বান্দা নিজের কৃত ভুল সুরক্ষ করে ক্ষমা চাহিবে, কখন সে তাওবা করে পাপের দরিয়া থেকে উঠে আসবে, কখন সে তার বরের নির্দেশিত পথের দিকে যাব্বা করবে।

আমরা মনে করি, যে কঠিন কঠিন পাপ আমরা করে বসেছি তার হয়তো-বা কোনো ক্ষমা হতে পারে না। আমাদের মনে এই ধারণা বৰ্দ্ধমূল হয়ে আছে যে, আমাদের কৃত পাপের হয়তো-বা কোনো ক্ষমা নেই। অথচ, আলাই সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিম্ন কিছু এটা নয়। তিনি ক্ষমার পদস্থা নিয়ে আছেন বান্দাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করার জন্য। তিনি বলছেন—

يَا عَبْدَنِي أَسْرُوا عَلَىٰ نَفْسِهِمْ لَا تَقْتُلُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا لَّهُ فَرَحْ

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের প্রের যুলুম করে বসেছ, তোমরা আলাইর রহমত থেকে কখনোই নিরাশ হয়ো না। নিশ্চাই আলাই সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল এবং প্রের দয়ালু।<sup>[৩]</sup>

এই যে এই আয়াতটা, মনে হচ্ছে এই আয়াত যেন আমার জন্যই নায়িল করা। আলাই সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন, ‘হে আমার বান্দা! সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন, ‘হে আমার বান্দা! সেনি রাতের অধিকারে তুমি অমুক অমুক পাপে লিঙ্গ ছিলে। যারণ করো তোমার সামাত কায়া করার দিনগুলো। মনে করার চেষ্টা করো ইটারনেটের অধিকার গলিতে

[১] জামি তিরমিয়ি: ২৪৯৯, হাদিসটি সহিত

[২] সহিত মুসলিম: ২৭৪৯

[৩] সুরা যুমার, আয়াত: ৫০

তুল দেওয়ার মুহূর্তগুলোকে। তুলে গোছ সেই দিনগুলোর বাধা, যখন তুমি নিজের প্রদিন মসজিদমুখী হওনি? তুমি নিজের প্রপর, নিজের আজাহর ওপর সূচন করছে তার ভাবে আজ আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো? তুমি কি আবশ্যিক উপরিক্ষিত? তুমি কি তিরস্কার করব? তুমি কি ধরে নিছ আজ আমি তোমার স্থিত হতে হৃষি নিবিসে আমার বাসন, তুমি ভুল ভাবছ! তুমি নিজের প্রপর যত ঝুলুম, যত অত্যাজার বলে না কেন, আমি সর্বদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। তুমি কখনোই আমার রহস্য থেকে নিরাশ হয়ে না। ভেবো না যে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না, তোমার ভাব শুন কখনোই আমার ক্ষমার চাইতে বড় নয়। তুমি কেবল আমার দিকে দিয়ে এসো। আমি দিকে ঝুকে পড়ো। হাত তুলে আমাকে বলো। তোমাকে ক্ষমা করার জন্য। মুক্তির অশুর বিনিময়ে আমার কাছে চাও। আমি অবশ্যই তোমার ভাকে সাড়া দেবো।'

আমাদের পাপসমূহ মাফ করার জন্য আজ্ঞাহ সুবহানাতু ওয়া তাআলা যে আয়োজন সাজিয়েছেন, সেই আয়োজন সম্পর্কে জানি না বরেই আমরা তাঁর রহস্য থেকে নিরাশ হয়ে পড়ি। আমরা যদি জানতাম যে, ক্ষমালাভের জন্য আমাদের অস্তরে একটু ব্যাকুলতা, হৃদয়ের খানিক আকুলতাকে আজ্ঞাহ কীভাবে মূল্যায়ন করেন, তাহলে আমরা কখনোই হতাশ হতাম না।

একদিন সাহাবিদের কাছে, পূর্ব্যুগের এক লোকের কথা বলেছিলেন নবিজি। সোকৌ ছিল অত্যন্ত সম্পদশালী। তার বিশাল সম্পদের ভাস্তর থেকে সে কেনেৰিন আজ্ঞাহের রাস্তায় এক কানাকড়িও খরচ করেন। উপরন্তু, আজ্ঞাহর ইবাদত থেকেও নিজেকে সে গুঁটিয়ে রেখেছিল। যখন সে মৃত্যুশ্যায় উপনীত হলো, যখন জীবনের সর্বিক্ষণে এসে পৌছাল সে, তার মধ্যে আজ্ঞাহর ভয় এসে ঢেঢে বসল। সে তার ঘনসম্পদের কথা মনে করল। সম্পদের এই পাহাড় থেকে কেনেৰিন একটা পয়সা আজ্ঞাহের রাস্তায় ব্যয় করার তাড়না সে অনুভব করেন। নিজের জীবনের এতগুলো সময় থেকে আজ্ঞাহর ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখেনি কেনো মুহূর্ত। জীবনকে উপভোগ করেছে খেয়ালখুশিমতো। মৃত্যু শিয়ারে এসে দাঁড়াতেই আজ তার এত ভয়, এত শক্তি!

লোকটা তার সন্তানদের ডেকে বলল, ‘বাবারা, বলো দেখি পিতা হিশেবে আমি কেমন ছিলাম?’

তার বলল, ‘তালো।’

‘আজ্ঞাহ সামনে আজির ইত্যার জন্য যার ঝুলিতে কিছুই নেই, সে আবার ভালো হচ্ছে পাবে কীভাবে? তার জন্য তো ধৃৎস হাড় আর কোনো পথ খোলা নেই।’

হেলো নিচে হচ্ছে থাকল। লোকটা আবার বলল, ‘তোমরা এক কাজ করবে। আমি মাত্র পেলে আমাকে কর দিয়ো না, বরং আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো। এরপর মেঘায়ের কিছু অংশ বাতাসে উভিয়ে দেবে এবং কিছু অংশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে।’

হেলো বুঝতে পাল না, তাদের পিতা এমন কথা কেনই-বা বলছেন। জীবনের স্বর্ণের মুহূর্ত এসে কি তার ভীমরতি হয়েছে? কিছু সোকৌ তার সংকলে আলো।

সন্তানদের এই বাপাপের প্রতিজ্ঞাও করাল। তারা বাজি হলো এবং লোকটার মৃত্যুর প্রস্তরদের তাকে পুঁজিয়ে সেই ছাই বাতাসে ও সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল।

নবিজির ভায় থেকে জান যায়, কিয়ামতে আজ্ঞাহ সুবহানাতু ওয়া তাআলা বাতাস ও সমুদ্রকে বলবেন তাদের কাছে এই লোকের যা যা অশ্চ আছে তা বের করে নিতে বাতাস ও সমুদ্র তা বের করে দেবে। লোকটাকে আজ্ঞাহ ওঠাবেন। বলবেন,

‘কেন তুম এই কাজের নির্দেশ দিয়েছিলে সেদিন?’

লোকটা বলবে, ‘আপনার তরে। আমর মনে হয়েছিল, আমার গুনাহের কারণে আপনি আমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। আমি তেবেছি, এভাবে নিজেকে ছাই করে ফেললো, বোঁকেরি, আপনার শাস্তি থেকে বেঁচে যাব।’

এই কথা শুনে আজ্ঞাহ বলবেন, ‘যাও, আমি তোমায় ক্ষমা করে দিলাম।’[১]

আজ্ঞাহের ক্ষমার পরিধিটা এতই বিশাল। কেবল একটু অনুশোচনা, একটু আঙুরিকতা, হৃদয়কেশে একটু ভয়ের কারণে মৃহৃত্তৈ আজ্ঞাহ সুবহানাতু ওয়া তাআলা এ রকম একজন পাণীরকেও ক্ষমা করে দেন। অথচ আমরা ভাবছি, আমাদের গুহাহতুলো হয়তো ক্ষমা করা হবে না।

গুলাহ করার পরে তুল বুরাতে পেরে আমরা যখন তাওবা করি, তখন আজ্ঞাহের চাইতে মেশি খুলি আর কেউ হয় না। নবি কারীম সালামাতু আলাইহি ওয়া সালাম

[১] সহিত বুঝাবি: ৬৪৮১: এছাড়া বিভিন্ন হাস্তান্ত্রিক ঘটনাটি বিছুটা ভিজ শব্দে এসেছে।

বলেছেন, ‘মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া উট পুনরায় কিরে দেয়ে উটের মালিক নজা  
খুশি হয়, বাস্তা গুনাহের পরে তাওবা করে কিরে এলে আজাহ সুবহানাহু ও  
তাআলা তার চাইতে বেশি খুশি হন।’[۱]

ভাবুন তো! খৈখী মরুভূমি। দৃষ্টিশীমানায় নেই কেনো জনবসতির চিহ্ন। যদিকে  
দুচোখ যায় কেবল বালি আর বালি। মাথার ওপর গনগানে সৃষ্টি হচ্ছে এবং  
পরিবেশে আপনি আপনার সাথে থাকা উটটা হারিয়ে বসেছেন। নিষ্ঠত নয়,  
বাতীত আপনার জন্য দ্বিতীয় আর কেনো পথ খোলা নেই। কারণ, পায়ে হাতে  
এই মরুভূমিপ্রান্তের পার হওয়া আপনার পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। এই তৎ মরুভূমিতে  
সুধা, তঁড়া আর অনাহারে আস্তে আস্তে নেতৃত্বে পড়তে আপনার শরীর নিবাহ  
এমন অবস্থায়, যদি চোখের পলকে হারিয়ে যাওয়া উট আপনার কাছে কিরে  
আসে, আপনার চেয়ে সুবী জগতে তখন আর কে হতে পারে?

আমরা যখন পাপ করে আজাহর কাছে আপ্তিক তাওবা করি, মাফ চাই, যেখেন  
জল ফেলে করজেডে ক্ষমাপ্রার্থনা করি, আজাহ ওই হারিয়ে যাওয়া উট কিরে  
পাওয়া ব্যক্তির চাইতেও বেশি খুশি হন। নবিজির হাদিস থেকে জানা যায়, ‘আজাহ  
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ‘আদম সত্তান! যদি তুমি আমাকে যারণ করো  
এবং আমার থেকে আশা করো, তাহলে তোমার কৃতকর্মগুলো (গুনাহ) আমি  
অবশ্যই ক্ষমা করে দেবো। ওহে আদম সত্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি  
আকাশের মেঘমালাও ছাঁয়ে এবং এরপর তুমি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো,  
আমি অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। আদম সত্তান! আমার সাথে কাউকে  
শারিক করা বাতীত পৃথিবী-পরিমাণ গুনাহের বেরো নিয়েও যদি আমার সামনে  
দাঁড়াও, আমি অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।’[۲]

এই কথাগুলোর চাইতে উন্মত ভরসার বাণী আমাদের জন্য আর কী হতে পারে? এর  
চাইতে বেশি সুস্থিতদায়ক আর কারও কথা হতে পারে কি? পাপের অতল সহ্যে  
ডুবে যাওয়ার পরেও যদি হৃদয়ের কোথাও ভিইয়ে রাখি এক টুকরো বিশ্বাস, যদি  
হৃদয়গাঁথনে সুপ্ত রাখি রাহমানের ওপর একটু ভরসা, একটু আশ্চর্য এবং একদিন যদি

[۱] সহিহ বুখারি: ৬৩০৮; সহিহ মুসলিম: ২৬৭৫

[۲] জামি তিরমিহি: ৩৫৪০, হাসিস্তি সহিহ

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

বিহুরে বাথ নেই নিষ্পাস, সেই সুপ্ত ভরসাতে ভর করে আমরা সত্যি সত্যিই তার  
সামনে নত হয়ে দাঁড়াই, যদি জীবনের সব ভুল, সব অপরাধ, সব অবাধাতার জন্ম  
তাঁর কাছে অঙ্গস্তুত মানে, অনুমূল ভোজ বদনে, কাতর হৃদয়ে ক্ষমা চাইতে পারি,  
তিনি আরূপ নিছেন, তিনি ভরসা নিছেন, তিনি ওয়াদা করছেন—তিনি আমাদের  
সকল পাপ, সকল গুনাহ, সকল অপরাধ, অবাধাতা, ভুলভূষ্টি মাঝ করে দেবেন।  
আমাদের পাপ যদি আকাশের মেঘমালাও স্পর্শ করে, যদি আমাদের অবাধাতার  
পরিমাণ পূর্বীতেও সংকুলন না হয়, তবু তব নেই। আরশের মালিক ত্বরণ  
আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আমাদের ঢেকে দেবেন তাঁর পরম মমতার চাদরে।

[۳]

যাদুবুরাহ সাজাইয়ে আলাইহি ওয়া সালামের চাচা আবু তালিবের কথা মনে আছে?  
সেই বাতীত যার ঘরে নবিজির পার করেছিলেন শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনেরও অর্ধেক  
সময়। আবু তালিব সেই বাতীত যিনি ছিলেন নবিজির একজন পরম অভিভাবক।  
একজন সত্যিকার শুভাবাজ্জলী। মুক্তির মুশ্রিকদের পক্ষ থেকে নবিজির ওপরে  
গথনাই কোনো বিপদ এসেছে, সেই বিপদের সামনে সবার আগে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে  
যেতেন আবু তালিব। নবিজির শৈশবে আবু তালিব ছিলেন একজন পিতার মতন  
দার্শনী। কৈশোরে নবিজির মাথার ওপরে ছিলেন একটি বটবুক্কের ছায়ার মতন। আর  
যৌবনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন নবিজির একজন সত্যিকার অভিভাবক।  
আবু তালিব নবিজিরকে কখনোই আত্মপূর্ণ জ্ঞান করেননি। কখনো নিজের সন্তান  
থেকে আলাদা চোখে দেখেননি। বাবা-মা এবং দাদাকে হারানোর পর আবু তালিবের  
যাতেই তো নবিজির বেড়ে ওঠ। সেই আবু তালিবের জন্ম নবিজির হৃদয়েও  
ভালোবাসার কোনো ক্ষমতি ছিল না। কিন্তু খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হলো, যে চাচার  
যাতে নবিজির অর্ধেক জীবন অভিবাহিত হয়ে গেল, যাতে ছায়া মাথায় নিয়ে নবিজি  
পথ চালছিলেন, যার গৃহে নবিজি পেয়েছিলেন থাকার স্থান, যার কাঁধে নবিজি লাভ  
করেছিলেন পিতৃসম মৌহু—সেই আবু তালিব কিনা পান করতে পারেননি ইসলামের  
অমৃত সুধি! ইসলামের ঝালভাসী নবিকে যিনি জীবন দিয়ে আগামে রেখেছিলেন,  
সেই আবু তালিবই কিনা শেষ পর্যন্ত মুশ্রিক থেকে দেলেন। তিনি জানতেন তাঁর  
আত্মপূর্ণ আজাহর প্রেরিত নবি। তিনি জানতেন মুহাম্মদ সাজাইয়ে আলাইহি ওয়া  
সালাম সাধারণ কেনো মানুষ নন, একজন নবি। আজাহর পক্ষ থেকে মনুষের জন্ম  
আসা একজন বাতীবাহক। তথাপি আবু তালিবের বর্ণশৰ্মাদা, তাঁর পূর্ণপুরুষদের

ধর্ম, সীতিনীতি তার সামনে সত্ত্বের চেয়েও প্রবল হয়ে দাঁড়াল। সত্ত্বকে অস্তিত্বের পরিবর্তে, বংশীয় পৌরবই তার নিষ্ঠাট প্রাথমিক পেল।

যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিষ্ঠে এলো, যখন বিজ্ঞান জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছিলেন রাসূলের প্রাণবিহীন প্রিয় চাচা, যখন জীবনের শেষ সম্পর্কে ছটফট করছিলেন তিনি, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালিমা উচ্চারণ করার জন্য। কিন্তু নাহ। আবু তালিবের সেই অনুরোধ করছিলেন কালিমা উচ্চারণ করার জন্য। আবু তালিবের সেই সৌভাগ্য ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত্যু আবু তালিবের বিছানার পাশে বসে তার মুখ দিয়ে তাওহিদের ঘোষণা উচ্চারণ করাতে চাহিলেন ঠিক তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরও একজন বাস্তি। তার নাম আব্দুল্লাহ ইবন শাহাদাহ পাঠ করাতে তৎপর, ব্যতিবাস্ত, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া বাস্ত তালিব, শেষ সময়ে এসে তুমি কি তোমার পিতৃধর্ম ত্যাগ করে বসবে? এবে আবু তালিব, জীবনের সম্পর্কে এসে তুমি কি সত্তিই পথচার্ট হয়ে পড়বে? মুহাম্মদের প্রয়োচনায় জীবনসায়াহে তুমি কি আমাদের উপাসাদের অসীকার করে বসবে?

সেদিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবু তালিবের মন গলাতে পারেননি। আবু তালিব শাহাদাহ পাঠ না করে মুশ্রিক অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে সেই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া? যে কিনা আবু তালিবকে ফুসলিয়ে ছিলেন শাহাদাহ পাঠ না করার জন্য, তার কী হলো খেয়ে? হাঁ, সেই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া শেবে ইসলামের অন্ত সুধা পান করেছিলেন। যিনি একদিন আবু তালিবকে পিতৃধর্ম ত্যাগ না করার জন্য, পূর্ণপূর্বের ধর্ম ত্যাগ না করার জন্য, তাদের উপাসাদের অসীকার না করার জন্য তাড়া জুগিয়েছিলেন, সেই তিনিই কিনা পিতৃধর্ম, পুঁজিত বংশীয় উপাসাদের পায়ে ঠেলে ঘোষণা দিয়ে বসলেন এক ইলাহার, এক মাঝদের, এক আজ্ঞাহর! সেই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তায়েফের যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহিদ হয়েছিলেন।<sup>(১)</sup>

[১] আজ-ই-ইতি আব ফি মা'রিজতিল ভাসহাব, বর্ত : ১, পৃষ্ঠা : ২৬১; আব-বাহিত মালিক, পৃষ্ঠা : ১০১

তাহন তো সুহার বিজ্ঞান যিনি আবু তালিবকে কুমস্ত্রণ, কুপরামৰ্শ জুগিয়েছিলেন, সেই তিনি পানে শহাদাহ পাঠ করে হয়ে গেলেন একজন সোনার মানুষ! শুধু তা-ই না, বিদেন অংশবৰ্ধণ করে তিনি লাভ করেছেন শহিদ হবার মর্যাদাও ও সুবৃত্তাজ্ঞাও! সেই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া অন্তভুক্ত হয়ে পড়লেন শহিদদের মিছিলে। আর আবু তালিবের জন্য দুহাত তুলে আমরা যে একটু দুআ করব, সেই সুনোগটাও রইল না। আজ্ঞাহর দিকে যিনি আমরা যারা নিজের আজ্ঞার সাথে, নিজের নক্ষসের জীবিকা উপলব্ধি করব, আমরা যারা তাবছি যে, আমাদের সেই মুক্তির, সেই পাশের কোনো ক্ষমা হ্যাতো নেই, তাদের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া রায়জামাহ আনন্দ চমৎকার একটি দৃঢ়ত্ব। আজ্ঞাহ সুবৃহন্তু ওয়া তাজালা তাকে সম্মানিত করেছেন। তাকে শহিদদের কাতারে স্থান দিয়েছে। আজ্ঞাহ যদি তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আপনাকে কেন করবেন না? আপনার বর আর আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়ার বর তো একই মনিবের আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়ার বন্দু। যিনি আব্দুল্লাহকে ক্ষমা করতে পারেন, তিনি আপনাকেও দাস একই ইস্তাহর বন্দু। যিনি আব্দুল্লাহকে ক্ষমা করতে পারেন, তার কাছে যিনি সমস্ত ক্ষমার আধার। শুধু আশা রাখুন। ফিরে আসুন তার কাছে যিনি সমস্ত ক্ষমার আধার।

[১]

পরিষত কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সুরাটা হলো সুরাতুল ফাতিহা। সুরা ফাতিহা হলো উন্নত কুরআনের তথা কুরআনের মা' প্রতিদিনের ফরার সভাতে আমরা ১৭ বার সুরা ফাতিহা কুরআন করি। এই সুরার শুরুটা হয়েছে আজ্ঞাহ সুবৃহন্তু ওয়া তাজালা প্রশংসবাকি দিয়ে। আমরা ঘোষণা দিই—আল-হাম্দু লিল্লাহি রাকিল আলালিন। সমস্ত প্রশংস্যা তার জন্যে যিনি বিশ্বজাহনের রব। এরপর আমরা বলি—আর রাহমানুর রহিম। মালিকি ইয়াওমিদৱীন। ‘আর রাহমানুর রাহিম’ মানে হলো ‘যিনি পরম করুণাময়, মালিকি ইয়াওমিদৱীন।’ আর ‘মালিকি ইয়াওমিদৱীন’ মানে হলো ‘যিনি বিচার দিনের মালিক।’ অতো স্থান দিয়েছেন? তিনি তো চাইলে বলতে পারতেন, মালিকি ইয়াওমিদৱীন। আর রাহমানুর রাহিম। কিন্তু তিনি সেভাবে বলেননি। কেন বলেননি?

বিচারক তিনিই যিনি আপনার ভালোমন্দ দুটো কাজেই হিশেবে চাইলেন। কিন্তু করার জন্য তার দুটোই পরিপূর্ণ হিশেবে দরকার। আর সেই বিচারক যদম আসার সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তখন ব্যাপারটা কেমন হচ্ছে? তার চোখকে ঝকিপ দিয়ে কেনো পাপ লুকোনো যাবে? তার কাছ থেকে গোপন করা যাবে কেনো গুরুত্ব কেনো অবাধাতা? জীবনের পরতে পরতে আমরা যে অহরহ পাপ করি, তাৰ অবাধা হচ্ছি, সেসবের কেনো হিশেবেই কি আজ্ঞাহুর কাছ থেকে শুকনোর সুযোগ আছে? বিচারের মাঠে তিনি যদি কঠোর হওয়া শুরু করেন, তাহলে আমদের কেউ তাঁর ক্রান্ত থেকে বাঁচতে পারব না।

কিন্তু তিনি যে ‘বিচারক’, সেই গুণের কথা উল্লেখ করার আগে তিনি বলেছেন তিনি হলেন ‘পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু’। তার রয়েছে অসীম দয়ার ভাতো। তিনি বিচারকের আগে দয়ালু। এর অর্থ হলো—আমরা যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের প্রবৃত্তির মৌকায় হাস্তুরু খাচ্ছি, যারা দিনের পর দিন তাঁর অবাধা হচ্ছি, গুনাহের অধৈ সাগরে মজে রাখেছি, আমরা যদি আস্ত্রীকরণ রাখে তাঁর দিকে কিরে আসি, যদি অনুত্তম হৃদয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তাহলে তিনি আমদের ক্ষমা করে দেবেন। বিচারকের ভূমিকার আগে যে তিনি দয়ালু হবার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আপনার বিচার করার আগে আপনাকে দয়া করবেন যদি আপনি বলেন, হে রাহমানুর রাহীম! প্রতিনিয়ত গুনাহের অতল গহনে তলিয়ে যাচ্ছি। হেন কোনো পাপ নেই যা আমি করছি না। রাতের অর্ধকারে, দিনের আলোতে আমি একজন পাপী। আমার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা আজ পাপের কলিয়া দৃষ্টিত। আমার হৃদয়-মন আজ গুনাহের তারে জর্জরিত। তবুও, মালিক আপনি তো রাহমানুর রাহীম। গাঢ়ুনুর রাহীম। আমি আজ নত মস্তকে, বিনীত চিঠ্ঠে, আকুল হৃদয়ে আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন।’

তিনি আমদের জন্য সুযোগ বরাদ্দ রেখেছেন। কিরে আসুন সুযোগ। ক্ষমা লাভের সুযোগ। ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সুযোগ। তাই তিনি সুরা ফাতিহায় ‘মালিকি ইয়াওমিদহীন’ গুণের আগে ‘আর রাহমানুর রাহীম’ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। এখন আমদের উচিত সেই সুযোগ লুফে নেওয়া। তাঁকে বিচারক হিশেবে পাওয়ার আগে রাহমানুর রাহীম হিশেবে পেয়ে যাওয়া।

মেঘের কোলে ঘোন হেসেছে

[৪]

গোলি ভালোবে আপনার পাপের কোনো ক্ষমা নেই। অর্থাৎ, আপনার স্মরণ করা চাইত সেই উল্লেখ, অহংকারী ফিরাউনের কথা যে নিজেকে আজ্ঞাহুর আসনে বসিয়ে নিয়েছিল। যে প্রতাপশালী ফিরাউন নিজেকে দাবি করেছিল মানুষের রব হিশেবে, যে হত্যা করেছিল বলি ইসরাইলের হাজার হাজার নিক্ষেপ ক্ষিপ্তকে, সেই ফিরাউনের বাজে যখন সঠের নাওয়াত-সহ আজ্ঞাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা মৃদা আলাইহিস সলাম এবং তার ভাই হাস্তুর আলাইহিস সলামকে পাঠাচ্ছেন, তখন তিনি বললেন—

فَقُولَا لَهُ قُوْلًا أَبْيَانًا يَنْذِرْكُ أَزْمَعْنَى

তোমরা দুজন তার সাথে নরম সুরে কথা বলবে। হাতো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আমাকে ডয় করবে।।।।

ফিরাউনের মতো উল্লেখ, অহংকারী, সীমালজনকারী জালিমের সাথে কথা বলার সময় আজ্ঞাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যেন তার সাথে নরম সুরে, কোমল গলায় কথা বলা হয়। ফিরাউনের মতো অবাধ জালিমের ক্ষেত্রে যদি আজ্ঞাহুর অবস্থান এ রকম হয়, আপনার সাথে কীরকম হবে ভাবুন তো? আপনি তো তাঁকেই সিজদা দেন, তাঁর কাছেই সাহায্য চান, আপনার মজল-আমজল সবকিছুর জন্য তাঁর ওপরই ভরনা করেন। মাঝে মাঝে শ্রমতানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে পাপ করে মেঘেনে। আপনার পাপের পরিমাণ তো ফিরাউনের পাপের সমান নয়। আপনার পাপের পরিমাণ তো ফিরাউনের পাপের সমান নয়। তাকে ফিরাউনের জন্মে যদি আজ্ঞাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুযোগ বরাদ্দ রাখেন, তাকে উদ্দেশ্য করে যদি আজ্ঞাহু বলতে পারেন ‘হাতো সে উপদেশ গ্রহণ করবে’, আপনার বেলায় রাখুন আলামিনের মহস্ত, ক্ষমা আর দয়ার পরিমাণ কেমন হবে আপনার বেলায় রাখুন আলামিনের মহস্ত, ক্ষমা আর দয়ার পরিমাণ কেমন হবে আপনার কাছে কাঁদুন। তিনি আপনার জীবনকে আলো বলমালে দিনে পরিষ্কত করে দেনেন। কাছে কাঁদুন। তিনি আপনার সাজাজাহু আলাইহি ওয়া সাজাজাহুর চমৎকার, আশা জাগানিয়া এই হামিস্তির নবিজি সাজাজাহু আলাইহি ওয়া সাজাজাহুর চমৎকার, আশা জাগানিয়া এই হামিস্তির কথাগুলো শুনুন। নবিজি সাজাজাহু আলাইহি ওয়া সাজাজাহুর বলেছেন—

[৫] সুরা ত-হা, আয়াত : ৮৮

আঙ্গাহ বলেন, ‘আমার বান্দা আমাকে যেমন ভাবে, আমি তেমন। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি। সে যদি কোনো সভায় আমাকে স্মরণ করে, আমি তারচেয়েও তালো সভায় তার কথা উল্লেখ করি। সে আমার দিকে এক বিষণ্ণ এসেও, আমি এলে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আমি সে যদি দিকে এক হাত এসেও, আমি দু-হাত এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেঁটে এলে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।’।।।

আপনার আমার সকল অবাধ্যতা, সকল উৎ্থতের পরেও আঙ্গাহ সুবহানা তুঃ তুঃ তাআলা আমাদের জন্য সুযোগ তুলে নেননি। আমাদের জন্য বধ করে দেননি আমাকে স্মরণ করবেন। কত বড় একটা বাপুর এটা, ভাবুন তো! আমি দুনিয়ার বাস কোনো টেলিফোন নয়, কোনো ইমেইল, চিঠি কিংবা বায়বীয় কোনো মাধ্যম নয়। কেবল অন্তরের গভীর থেকে তাতে একটুখানিই যারণ! আমি যদি আঙ্গাহকে আমার কোনো আজ্ঞায় স্মরণ করি, আমার আজ্ঞার বন্ধুরা যখন দুনিয়াবি আলাপে মেঠে উঠতে চায়, তখন যদি আমি তাদের সুবহান আঙ্গাহর কথা স্মরণ করিয়ে নিই, যদি বলি তোমরা আঙ্গাহকে ড্য করো, মিথ্যে বলো না, আঙ্গাহর অবাধ্য হয়ে না, অসং পথে পা বাড়িয়ো না, তখন আসমানের অধিপতি ফেরেশতাদের সমাবেশে আমার কথা স্মরণ করেন। আমার নাম উৎখাপন করেন। সম্মানিত ফেরেশতাদের সামনে, আঙ্গাহ সুবহানা তুঃ তুঃ তাআলা আমার কথা বলছেন, আমার নাম নিছেন, চোখ দুটো বধ করে এই দৃশ্যটা একটু ভাবুন তো!

মহান বৎ, যিনি হলেন গাফুরুর রাহীম, অসীম, অনিঃশ্বেষ দয়ার সাগর, তিনি আপনার-আমার ফিরে আসার চেষ্টাগুলোকে এতাই মূল্যায়ন করেন। আমরা যদি পাপের রাস্তা ছেড়ে তার দিকে এক বিষণ্ণ হেঁটে যাই, তিনি আমাদের দিকে এক হাত হেঁটে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা এক হাত দেলে তিনি দু-হাত এগিয়ে আসেন। আমরা যদি তার দিকে হেঁটে যাই, তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে আসেন। তিনি কতভাবেই-না আমাদের ক্ষমা করতে চান। কত উপায়েই-না তিনি খোলা রেখেছেন আপার ক্ষমার দুয়ার।

তিনি তাঁর পরিত্য মেলে ধরেছেন ‘গাফুরুর রাহীম’ হিশেবে। অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। তাঁর ক্ষমা সবসময় তাঁর ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ হয়। আমাদের পুনাহার পরিমাণ যদি আকাশ ছুয়ে যায়, পথিবী যদি আমাদের পুনাহারকে সংকুলন দিতে বার্থ হয়, যদি আকাশ আর জমিনের মাঝে আমিহ সবচেয়ে বড় পুনাহার, সবচেয়ে বড় পাপী, সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অর্থব্দ, অপদৰ্থ হয়ে থাকি, তবুও হতাক হবার কিছু নেই। আকাশের মেঘ কথমো সূর্যকে ঢেকে দিতে পারে না। মেঘ কুকে সুর্যের আলো টিকই টিকে বেরিয়ে আসে। অস্তরে পাপের মেঘ ঘনিষ্ঠুত হয়ে আছে, সেগুলোও ধুয়েনুহুজে যাবে। সেই মেঘের কোলেও সূর্য হস্তের অদ্বরমহলে কেবল একটু জায়গা খালি রাখি যেখানটায় উচ্চারিত হবে, ‘আঙ্গাহুরাম-কিরাম! আঙ্গাহুরাম-কিরাম! হে আঙ্গাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন ও আঙ্গাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন!’



## বসন্ত এসে গেছে

হৃদয়ে যে বসন্ত আসে, সেই বসন্তের নাম হীন। এই বসন্তের আগমনে হৃদয়কাননে ফোটে শুল্কতার ফুল। অস্তরমননে জাগে শুল্কতার শিহরন। এই বসন্ত অস্তরে দ্রুতে দেয় আলোর মশাল। সেই আলোতে দূর হয় হৃদয়ের সমস্ত অধ্যকার। জ্ঞানে উঠে ত্রিয়মাণ বৃক্ষরাজি। এই বসন্ত অস্তরে বইয়ে দেয় খুশির কংলো। হৃদয়গহীনে প্রশঁসিত করে নতুন আশা, নতুন সুপ্তি।

দীনটাকে জীবনে বাস্তবায়ন করা এক অর্থে খুব সহজ, আবার অন্য অর্থে খুব বেশি সহজ নয়। যারা সত্ত্বাকার অর্থে দীনে প্রবেশ করতে চায়, যাদের অস্তরে আপাত বিস্মৃত থাকলেও ইসলামের ভালোবাসা হৃদয় থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, তাদের জন্য আজ্ঞাহর দিকে ফিরে আসা, নিজের নফসের ধোঁকা থেকে পরিণাম লাভ করা, সর্বোপরি দীনকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়ন করাটা সহজ হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি যখন জাহিলিয়াতের আবরণ ছেড়ে ইসলামের দিকে ধৰ্মবান হতে চায়, তখন আজ্ঞাহ সুবহানাত্তু ওয়া তাআলাই তার জন্য সিরাতুল মুস্তকিমের রাস্তা খুলে দেন। পথের প্রতিবর্ধকতাগুলো দূর করে দেন। অস্তরকে প্রশঁসত করে দেন। এ বিষয়ে কুরআনে চমৎকার একটি আয়াত আছে। আজ্ঞাহ সুবহানাত্তু ওয়া তাআলা বলছেন—

وَمَنْ يُشْفِيَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مُخْرِجًا ① وَمَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَنْوِيْكَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَاسِبٌ

যে আজ্ঞাহকে ভয় করে, আজ্ঞাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উত্তরণের) রাস্তা দেব করে দেন। আর তাকে এমন উৎস থেকে রিয়িক প্রদান করেন যা সে করমাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আজ্ঞাহর ওপর ভরসা করে, আজ্ঞাহই তার জন্য যথেষ্ট! [১]

‘আজ্ঞাহকে ভয় করা’ মানে আজ্ঞাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং আজ্ঞাহ যা নিয়ে করেছেন তা এড়িয়ে চলা। এই একটি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে একজন মুম্লের গোটা জীবনপ্রণালী। তার অস্তরে হয় তাকওয়া তথা ‘আজ্ঞাহভীতি’ থাকে, নয়তো তার অস্তরে হয় তাকওয়াশূন। যার অস্তরে তাকওয়া থাকে, সে কখনোই আজ্ঞাহর অবাধ্য হতে পারে না। সে কখনোই সালাত ছেড়ে দেয় না, সিয়াম ছেড়ে দেয় না। তার দুনিয়ার জীবনের পরতে পরতে থাকে আজ্ঞাহভীতির হাপ। সে ঘৃণন নির্ভরে, একাকী অবস্থায় থাকে, যখন পাপের সাথের নিচিত্তে তুব দেওয়ার অবাধ সুযোগ তার সামনে আসে, যখন দুনিয়ার কোনো চোখ তাকে দেখতে পায় না, কোনো কান তাকে শুনতে পায় না, ঠিক তখনো সে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় না। সে বিশ্বাস করে, দুনিয়ার সকল চোখ আর কানকে ফাঁকি দেওয়া গোচে অসমানে যিনি আছেন তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তিনি সর্বাবস্থায় সব মেঘেন, সব শোমেন। গভীর সামগ্রতলে পাথারের ওপর হীটতে থাকা ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে কেটি আলোকবর্ধ দূরের প্রাণাশ—সর্বকিছুর ওপর রয়েছে তাঁর সমান সজাগ দৃষ্টি। এই বিশ্বাস অস্তরে ধারণ করার নাই হলো তাকওয়া। এটাই আজ্ঞাহের জন্য আজ্ঞাহভীতি। এই বৈশিষ্ট্য যার হৃদয়-মননে প্রেরিত, সে কখনোই আজ্ঞাহের হলো আজ্ঞাহভীতি।

আজ্ঞাহ সুবহানাত্তু ওয়া তাআলা বলেছেন, যে আজ্ঞাহকে ভয় করে, অর্থাৎ যার অস্তরে আজ্ঞাহ সুবহানাত্তু ওয়া তাআলা বলেছেন, যে আজ্ঞাহকে ভয় করে, অর্থাৎ যার অস্তরে আজ্ঞাহ আছে তার জন্য বিপরীতে থেকে উত্তরণের পথ আজ্ঞাহ নিজেই তৈরি করে তাকওয়া আছে তার জন্য বিপরীতে থেকে উত্তরণের পথ আজ্ঞাহ নিজেই তৈরি করে তাকওয়া আছে তার জন্য এরচেয়ে খুশির সংবাদ দেন। আজ্ঞাহের দিকে প্রত্যার্থীন করতে চাওয়া মানুষের জন্য এরচেয়ে খুশির সংবাদ আর কীই-বা হতে পারে? আমার মনে পড়ে, আমি যখন দাঢ়ি রাখ শুরু করি, তখন নানান লোক আমাকে নানান কথা শোনত। এলাকার মুসলিম গোছের লোকগুলো চোখের কোণা দিয়ে তীব্র অবহেলা মিশিত চাহানি সহকারে বলত, ‘মাথার ভীমতি চেপেছে নাকি? তোমার বাপে মোছ রাখে নাই, তুমি বানাইছ একহাত লুরা দাঢ়ি।’

[১] সূন্না তালিক, আয়াত: ২-৩

বসন্ত এসে গেছে

তখন দীনে একেবারেই নতুন। কেবল সুবৃহান্বাহ সাজালাহু আলাই ওয়া সাজালামে সুবৃহানকে ভালোবেসেই দাঢ়ি রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে এলাকার মানবসূলোর ত্বরিক মস্তব্য, এমনকি আমার পরিবারের সমস্যারের মধ্যেও অনেক কথায় আমি তখন খণ্ডবিখণ্ড প্রাপ্ত। একে তো বেকার অবস্থা, তার ওপর ঘোঁষ করে এমন পরিবর্তন! চারদিক থেকে আমার ব্যাপারে নামান আজাপ, নামান গুরুত্ব চারিত্বে হতে লাগল। এমন বিপদের দিনে আমার ওপর বর্ষিত হয়েছিল আজাহ সুবৃহান চারিত্বে তাজালার অপার দয়া। তিনি আমার জন্য সহজ করেছেন বিপদসংকূল যাত্রা। আম অন্তরকে তিনি ভরে দিয়েছেন ঈমানী জয়বাতে। দীনের বুরাটিকে আমার জন্য সুবৃহান সহজ করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষের বক্ষাথে আমি কর্তৃ পেতাম না, হচ্ছি হচ্ছি না। দাঢ়িতে নিজেকে কথনো পশ্চাংপদ মনে হতো না। বরং অন্তরে এক অন্য রকম প্রিপ্রিতা বিবাজ করত সর্বদা। মনে হতো আমি আজাহের রাস্তায় আছি। এই গৃহেই তো সুধান করে বেড়াই প্রতি রাকআত সালাতে। ইহসিনাস সিরাহাল মুহারীম। এটাই তো সেই আরাধ্য জীবন যার সুপ্ত বুকে বুনে চলেছি প্রতিনিয়ত। তাহলে এই জীবনে কেন আমি আশাহত হব? কেন ভাবব, আমি অন্যদের চেয়ে অনুভূত আর পশ্চাংপদ? আমার এই যে চিন্তার শক্তি, এই শক্তিটুকু আজাহ সুবৃহান্বাহ ওয়া তাজালাই আমার অন্তরে দান করেছিলেন। ফলে দীনে ফেরার প্রথম দিকের সেই দিনগুলোতে আমি সংযমী হতে শিখেছি। বৈর্যধারণের প্রাথমিক পাঠ আমি তখনই লাভ করেছি। বুবাতে শিখেছি, আজাহের রাস্তায় চলতে গেলে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার দরকার হয়।

যারা সত্ত্বিকারঅর্থেই আজাহের জন্যই বদলাতে চায়, তাদের জন্য এই আপাত অস্তুব খুব সহজেই সম্ভব হয়ে যায়। ফিরাউন বাহিনীর কবল থেকে মুসা আলাইহিস সালামকে উত্থারের জন্য নদীর মাঝে আজাহেই তো রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনিই তো ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য নমরুদের আগুমকে শান্ত করে দিয়েছিলেন। মাছের পেটে ইউনস আলাইহিস সালামকে তিনিই রক্ষা করেছেন। যখন ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে আসে, তখন আজাহেই পরম মমতায় তাকে বিতীয় আসমানে তুলে নেন। ইজরাতের দিন যখন গুহামুখে অত্যাচারী কুরাইশীরা ঘূরঘূর করছিল, তখন মহামহিম আজাহেই মুহাম্মাদ সাজালাহু আলাই ওয়া সাজাম এবং আবু বকর রায়িয়াল্লাহু আনহুকে নিরাপত্তার চাপের আবৃত করেছিলেন। এসব হলো তাকওয়ার ফল। তাদের অন্তরে এমন উঁচু স্তরের তাকওয়া বিদ্যমান ছিল।

জুর আগাতে আজাহ সুবৃহান্বাহ ওয়া তাজালা আরও বলেছেন, ‘তাকে এমন উৎস থেকে নিরিক্ষণ পদন করেন যা সে কলনাও করতে পারে না।’ এই অংশটির খুব সুন্দর উপরাম আছে নবি মুসা আলাইহিস সালামের জীবনে। ফিরাউনের রাজ্য থেকে পালিয়ে তিনি যান মাদাইয়ান নদারে চলে আসেন, তখন তিনি দ্বাক একজন আগস্তুক। যুবরাজ পালিক মাথা সৌজার এতটুকু সীই নেই কোথাও। কিন্তু অঙ্গোভোর ঈমান আছে। প্রতি এমন নতজানু দ্রুত যার, তার কি রিয়িকের ব্যাপারে কোনো চিন্তা থাকতে পারে?

হ্যাঁ আলাইহিস সালামকেও চিহ্নিত হতে হয়েন। একেবারে অপরিচিত আগস্তুক হয়েও

তিনি মাদাইয়ান নদে গেলেন আল্লামের স্থান। দুজন মহিলার বকরিকে পানি পান

করিয়ে দেয়ার পর তিনি খাত তুলে আজাহের কাছে ফেরিয়াদ করলেন, ‘হে আমার বুক্স আপনি আমার প্রতি যে অনুহৃত নথিল করবেন, আমি তারই মুখ্যপেক্ষী।’।।।

তার এই দুচাল মধ্যে ভাববার মতন অনেক উপকরণ রয়েছে আমাদের সামনে।

মহিলাদের উপকর করে তিনি তাদের কাছে আবেদন করে বলেন, ‘আমাকে আজ

দুপ্তুর কিছু খেতে দেবেন?’ উপকরের প্রতিদিন তিনি মানুষের কাছে চাননি। চেয়েছেন তিনি আজাহের কাছে। এটাই তকচূড়া। এটাই ঈস্মান। আজাহের কাছে চাইতে নিয়েও তিনি আজাহের কাছে। আজাহে, আমি তো নেয়ে দুটোর উপকর করলাম। এখন আপনি আমাকে বাজাননি, ‘আজাহে, আমি তো নেয়ে দুটোর উপকর করলাম। এখন আপনি নাখিল করবেন। বরং তিনি এভাবেও চাননি। বরং তিনি বসেছেন, ‘হে আজাহের রবা আমার প্রতি যে অনুহৃত আপনি নাখিল করবেন, আমি তারই মুখ্যপেক্ষী।’

আমার রবা আজাহের প্রতি যে অনুহৃত আপনি নাখিল করবেন, কী দেবেন? সেই ব্যাপারটা আজাহের তিনি আজাহের কাছে নির্দিষ্ট করে কিছু চাননি। কী দেবেন তাতেই তিনি খুশি। তিনি নির্ভর করেছেন ওপর নাস্ত করেছেন। আজাহে যা-ই দিবেন তাতেই তিনি খুশি।

আজাহে যা-ই দিবেন তাকে নির্ভর করে তাদের জন্য আজাহেই যথেষ্ট আজাহের ওপরে। আর যারা আজাহের ওপরে নির্ভর করে তাদের জন্য আজাহেই যথেষ্ট আজাহের ওপরে যান। মুসা আলাইহিস সালামের মেলাতেও তা-ই ঘটল। আজাহ সুবৃহান্বাহ ওয়া হয়ে যান। মুসা আলাইহিস সালামের মেলাতেও তা-ই ঘটল। আজাহ সুবৃহান্বাহ ওয়া তাজালামকে কলাদের বাবার মাধ্যমে তাদের বাক্স-খাওয়ার বলেবক্ত তাজালা কলাদের বাবার মাধ্যমে তাদের বাক্স-খাওয়ার অপার দয়া। মুসা আলাইহিস সালাম করে দিলেন। এটাই আজাহের অনুহৃত। এটাই আজাহের অনুহৃত। কী খাবেন, কী করবেন। শান্তিক পূর্বেও জানতেন না, মাদাইয়ানে তিনি কোথায় থাকবেন কোথায় থাকবেন। যারা আজাহের একটু পরেই আজাহে তার জন্য রিয়িকের সমস্ত দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। যারা আজাহের ওপরে ভরসা করে, আজাহের রাস্তায় থাকতে চায়, আজাহের দিকে ফিরে আসতে চায়, তাদের জন্য এভাবেই আজাহে সুবৃহান্বাহ ওয়া তাজালা সবকিছুকে সহজ করে দেন।

আলুমাহ ইবনু আব্বাস রায়িয়াজ্জাহু আনঙ্কু তখন খুব ছেট। মাঝেই ১৩ বছরের সময়ে সেই ছেট বয়সেই মাদুরাহ সালালাহু আলাইছি ওয়া সালাম তাকে দ্বিতীয় সময়ে আনয়নের জন্য কিছু কার্যকরী উপদেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বারে ব্যক্তিমে ব্যাপত বাহু থাকলে সেই গজুটা আমরা আলুমাহ ইবনু আব্বাসের মুখ থেকেই শুনতে পাই। তিনি বলেছেন—  
একদিন আমি ঘোড়ায় চেপে নবিজি সালালাহু আলাইছি ওয়া সালামের পেছে থেকে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘আলুমাহ, আজ আমি তোমকে কিছু কথা শিখিয়ে দেবো। তুমি সর্বদা আলাহকে আরণে রেখো, তাহলে আলাহকে তোমার ব্যাপারে যত্নশীল হবেন। তুমি তাঁকে আরণে রেখো, তাহলে তাঁকে আলাহকে পাশে পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন কেবল আলাহর কাছেই চাও এবং যখন তোমার সাহায্যের দরকার হবে, তখন কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষ হও। বাদ মনে রেখো, যদি গোটা দুনিয়াও তোমার কল্যাণার্থে একত্র হয়, তথাপি আলাহকে তোমার কল্যাণ চান, তাহলে কারও সাধ্য নেই যে, তোমার একবিন্দু পরিমাণ কল্যাণ মায়িদ গোটা দুনিয়াও তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্র হয়, তথাপি আলাহকে তোমার কল্যাণ চান, তাহলে কারও সাধ্য নেই যে, তোমার একবিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করে।’।।।  
চমৎকার এই উপদেশগুলো নবিজি সালালাহু আলাইছি ওয়া সালাম দিয়েছিলেন বালক ইবনু আব্বাস রায়িয়াজ্জাহু আনঙ্কুকে। নিজের জীবনে ধীনকে প্রতিটা করার জন্য যে উপাদান দরকার, তার সবচেয়ে এই হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি বলেছেন আলাহর হকগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে। যদি আলাহর হকের ব্যাপারে সতর্ক থাকা যায়, তাহলে আলাহ আমাদের প্রতি যত্নশীল হবেন। আমরা আলাহকে আমাদের পাশে পাব। আমাদের সুখে-সুখে, সর্বদা। আলাহর হকগুলো কী? ইবাদতই হলো আলাহর হক। আমাদের সালাত, আমাদের সিয়াম, হজ, যাকাত এবং কুরবানি। আমরা যদি এগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হই, তাহলে আলাহও আমাদের ব্যাপারে যত্নশীল হবেন। তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। আমাদের রিহিক বাড়িয়ে দেবেন। তিনি বলেছেন যদি কিছু চাইতে হয়, তাহলে কেবল আলাহর কাছেই চাইতে। আমরা মনে করি, আলাহর কাছে কেবল পরকালের বিষয়াদিই চাইতে হয়। দুনিয়ার কোনো কিছুই মনে হয় চাওয়া যায় না কিন্তব্য চাওয়া টিক না। এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। কুরআনে আলাহ সুবহনাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার

বসন্ত এসে গেছে

তজ বিনিসও চাওয়ার জন্য বলেছেন। আমরা দুআর মধ্যে পড়ি, ‘রাবরানা আতিলা মিম-মুন্ডো হাসনাহ।’ দুনিয়ার উভয় বস্তু চাওয়াতে কোনো মানা নেই। জীবনে বসন্তের হোলা আনতে এগুলোই হলো দুনিয়ানি ব্যাপার। ইবনু আব্বাসকে দেওয়া নবিজির এই উপদেশগুলো হুমাহর সকল খুবকের জনাই প্রয়োজ।

আপনি যখন ধীনের পথে হাতে খুব করবেন, তখন আপনার মধ্যে অন্য রকম এক খুশির ক্ষেত্র প্রবাহিত হবে। সেই খুশি হারাম থেকে দৈচে থাকতে পারার খুশি। সেই খুশি রাসূল সালালাহু আলাহকে ওয়া সালামের সুনাহকে, তার শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারার খুশি। মোবাইল-কম্পিউটার থেকে আপনি যখন গান আর মুভির ফোন্টারটা এক ক্লিক ডিলেন করে দেবেন, কেবল আলাহর সন্তুষ্টির জন্যই আপনি যখন এতদিনের হারাম বিলেখানলিপকে এক মুহূর্তে ত্যাগ করে ফেলবেন, আলাহর আবেশ মানার জন্যই যখন আপনি হারাম টাকার লোকীয়া বেতনের চাবরিটা সোখ ব্যব করে ছেড়ে আসবেন, তখন আপনার ইন এক অনপূর্ণ আনন্দে নেচে উঠবে। সেই আনন্দ পরিব্রতার আনন্দ। সেই আনন্দ হারাম থেকে নিজেকে মুক্ত করার আনন্দ। সেই আনন্দ রবের কাছে আহসনমর্দনের আনন্দ। ‘পাছে লোকে করার আনন্দ। সেই আনন্দ রবের প্রতি কাছে, কথায়, চিন্তায় আপনি সং থাকেন, করে নেন, যখন জীবনের প্রতিটি কাছে, কথায়, চিন্তায় আপনি সং থাকেন, তখন আপনার মনে দোলা দিয়ে যায় বসন্তের হাওয়া। হাজারো প্রতিক্লিন্তায় আপনি দিশেহারা হন না। শুভ বাঢ়-বাঞ্ছাটে আপনি ভেঙে পড়েন না। আপনার আপনি দিশেহারা হন না। শুভ বাঢ়-বাঞ্ছাটে আপনি ভিত্তি নিতান্তই তৃষ্ণ। হলেয়ে যে চোলা বসন্ত বাতাসের প্রিপ্পতার কাছে এ সমস্ত সংবট নিতান্তই তৃষ্ণ। হলেয়ে যে বসন্ত এসে গেছে তা ধরে রাখুন। আলাহর কাছে আকুল ফরিয়াদ হলেয়েমননে যে বসন্ত এসে গেছে তা ধরে রাখুন। আলাহর কাছে আকুল ফরিয়াদ করে বলুন, ‘ইয়া মুল্লিবল কুলুব, সালিল কালবি আলা দীনিক।’ এই দুটো নবিজি সালালাহু আলাইছি ওয়া সালাম আমাদের প্রিয়ায়েছেন যার অর্থ—‘হে অস্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অস্তরকে ধীনের ওপর দৃঢ় রাখুন।’।।।

[১] জাতি তিব্বতি: ১৯৮৬ সালের মুক্তি।

ଶୀଳନେ ପ୍ରବେଶର ଅର୍ଥି ହଲୋ ଏକଟା ଯୁଦ୍ଧ ଜୀବିତୀ ଯାଓୟା। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ଶୀଳନେର ଶେଷ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲବନ୍ତ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧଟା ନିଜେର ସାଥେ। ନିଜେର ନକଶେର ସାଥେ। ଶରୀରକାନ୍ତେ ଓୟାସ-ଓୟାସର ସାଥେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟା ଲଡ଼ିବେ ଗିରେ ଆମରା ବାରବାର ପିଛିଯେ ପଡ଼ିବେ ପରି। ଆଶାହତ ହତେ ପାରି। ତାହିଁ ଏ ରକମ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିବେ ମେନ ଆମାଦେଇ ଭେଡେ ପଡ଼ିବେ ପାରି। ଆଶାହତ ହତେ ପାରି। ତାହିଁ ଏ ରକମ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିବେ ମେନ ଆମାଦେଇ ପଦମ୍ବଳନ ନା ଘଟିବେ, ଯାତେ ଆମରା ସିରାତୂଳ ମୁଖ୍ୟାକିମେର ପଥ ଦେବେ ବିଚାର ନା ହିଁ ଏଜନ୍ୟେଇ ନବିଜି ସାଙ୍ଗଜ୍ଞାତ୍ତ୍ଵ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାଙ୍ଗାମ ଏହି ଦୁଆ ଆମାଦେର ଶିଖିଯେ ଦିମ୍ବାହେ।



## ସାଲାତେ ଆମାର ମନ ବସେ ନା

[କ]

ଯେ ମୁଖ୍ୟଟା ନିଜେର କାଜେ ଖୁବ ଶୀର୍ଷିଥିର, ଖୁବ ଭେବେଚିଲେ, ଗୁଡ଼ିଯେ କାଜ କରିବେ  
ଭାଲୋବାସେ, ମୁକ୍ତିଜୀବିଦେ ଏଲେ ସେଇ ମାନ୍ୟଟାଓ କେମନ ମେନ ତାଢ଼ାଇବେ ଶୁଣୁ କରେ।  
ଦୁନିଆର କାଜକର୍ମେ ଯିନି ‘ମାନ’ ଧରେ ରାଖିବେ ଖୁବି ତଃପର, ମୁକ୍ତିଜୀବିଦେ ଏଲେ ତାକେଓ  
ଖୁବ ଅଗୋଛାଲୋ ପାଓୟା ଯାଇ। ଖୁବ ଅଛୁତ ଆମାଦେର ଆଚରଣ! ଆମରା ଆମାଦେର  
ବାବସାୟେ ବାରାକାହ ଚାଇ, ଆମାଦେର ହୟାତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଚାଇ, ଆମାଦେର ବିପଦ ଦୂର  
ହେବ ଚାଇ, ଆମରା ଚାଇ ଯେ, ଆମାଦେର ଧନମଞ୍ଚପଦ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାକ। କିନ୍ତୁ, ଏହି  
ଯେ ବାବସାୟେ ବାରାକାହ, ହୟାତ ବୃଦ୍ଧି, ବିପଦ ଦୂରୀକରଣ କିହବା ଧନମଞ୍ଚପଦେ ଉପରୁପରି  
ବୃଦ୍ଧି ପାଓୟା—ଏସବକିଛୁଇ ଯାର ହାତେ, ଯାର ନିୟାକ୍ରମେ ଏହି ଯାର ଅର୍ଥିନ—ସେଇ ମହାନ  
ରାବେର ସାମିଶ୍ର ପାବାର ସବଚେଯେ କର୍ଯ୍ୟକରୀ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ହାତ୍ଜେ ସାଲାତ। ଅର୍ଥାତ୍, ସେଇ ସାଲାତେଇ  
ଆମାଦେର ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍‌ଦୀନିତା। ଅବସ୍ଥାଦୂର୍ଦ୍ଵାରା ମନେ ହୟ, ସାଲାତ ଜିନିସଟା ମେନ  
ଆମାଦେର ଓପର ଖୁବ ଭୋର କରେ ଚାପିଯେ ଦେଖ୍ୟା କୋନେ ବନ୍ତୁ। କୋନେ ରକମେ ଦୁଟୋ  
ଦିଜନା ଦିଯେ କାଜ ଶାରାତେ ପାରଲେଇ ମେନ ଆମରା ଦିବି ବୈଚେ ଯାଇ।

ଦୁନିଆର ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରେହେ ଏବନ କିଛୁ ମାନୁମେର ସାମିଶ୍ର ଯାଓୟାର ଅର କିଛୁ ସୁଧୋଗ  
ଆମାର ହେୟେଛେ। ତାର ସଥିନ କଥା ବଲେନ ତଥିନ ତାଦେର ଅଶପାଶେ ଥାକା  
ମାନୁଶଗୁଲୋ ଗଭୀର ମନୋହୋଗ ଆର ଫିରିବା ନିଯେଇ ତାଦେର କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଥାକେ। କୋନେ  
ଅକ୍ଷର, କୋନେ ଶବ୍ଦ, କୋନେ ବାକ୍ୟ ତାରା ବାବ ଦିଲେ ଚାଯ ନା। ହଦ୍ସ-ମନେ ମେନ  
ଦର୍ଶକୁ ଦେଖେ ନିତେ ପାରଲେଇ ଭକ୍ତକୂଳ ଧନ୍ୟ ହୟ। ଦୁନିଆର ସେଲିକ୍ରିଟିଦେର ସାମିଶ୍ର ଆର

তাদের কথা শোনার জন্য আমাদের ব্যাকুলতার কমতি নেই। অথচ, মিনি বস্তুগুলি আলাভিন, বিশ্বজাহানের মালিক—তাঁর সাথে কথা বলতেই যেন আমাদের গবেষণা অনীহা, অনিছা, অনাশ্রাহ। সালাতে দাঁড়ালেই আমাদের মন উদ্ধালপ্রাণীল করে ওঠে। অফিসে রেখে আসা আমার অর্ধসমাপ্ত হিসেব, মিস করে শাওয়া বিকেনের আপয়েন্টমেন্ট, রাতের খোশগালের আজ্ঞা—সবকিছুই আমাদের ইন্দ্রিপটে দেখে উঠতে থাকে। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে আমরা তখন যত্নের মতন উঠলস করি নাই। এই অনীহা, অনিছা, অনাশ্রাহের কারণ হলো, আমরা সালাতকে কেবল অনুষ্ঠানিক 'ইবাকুল' বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। যখনই আমরা সালাতকে আজ্ঞাহ সুবহনানুওয়া তাজালত আমাদের মন যোগাযোগের মাধ্যম মনে করতে পারব, যখনই আমরা বুবাতে পারব যে, সালাতই আজ্ঞাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম। যখন মনের মধ্যে আজ্ঞাহ জ্ঞা হয়ে উঠবে। সালাত হচ্ছে সেই মূহূর্ত, যে মূহূর্তে বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটে চলে যায়। সালাত হচ্ছে সেই মূহূর্ত, যে মূহূর্তে বান্দার সাথে তার রবের কথোপকথন হয়। সালাত হচ্ছে সেই সময়, যে সময় বান্দা তার রবের কাছে সকল সমস্যার ঝুঁতি, বিপদের বিবরণ, চাওয়া-পাওয়ার বাসনা নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সালাত হতে হ্যাম্ফুর। বান্দা তার সমস্ত প্রেম, সমস্ত ধ্যান এই সালাতেই চেলে দেবে।

#### [খ]

যুগের বিবর্তনের ফলে আমাদের সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। ডিপ্রেশনে ভৃগুলে আমরা এখন কানে হেডফোন গুঁজে দিয়ে গান শুনি। প্রিয় কবির সেখা বিরহের কবিতা আওড়াই। যারা এসবের থারেকাছে দৌঁবে না, তারা সিগারেট ঝুঁকে কিংবা নেশা করে। অথচ আজ্ঞাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, 'সালাতে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে'<sup>[১]</sup>। চোখ আর মনের প্রশান্তি আসার কথা ছিল সালাতে। কিন্তু আমরা প্রশান্তি খুঁজে বেঢ়াচ্ছি গান-কবিতা, সিগারেট আর নেশাদ্বয়ে। মূলত সালাতের মধ্যে কীভাবে ভূব দিতে হবে, কীভাবে সালাত আদায় করলে চোখের আর মনের প্রশান্তি লাভ করা যাবে, সেসব বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা না থাকায় আমরা আজ সালাতের আসল

ক্লেশ, কার্যবালিতা থেকে বিছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। সালাতকে আমরা বান্দি করে ফেলেছি পর্যবেক্ষণ শরীরিক যায়ামের মধ্যে। সালাত আমরা কেন পড়ি? কী উদ্দেশ্যে পড়ি? সালাতে আমরা কী বলছি বা কী বলা উচিত—এ সকল বাপারে উদাসীন ধাকার মধ্যে আমাদের সালাতগুলোর এমন কর্তৃণ অবস্থা।

[গ]

সালাত মনোবোগ ধরে বাথার কিছু কার্যকরী উপায় রয়েছে। এই উপায়গুলো নিয়ে আমাদের সালাতকাণ কথা বলেছেন। আমরা যদি আমাদের সালাতে সেই উপায়গুলোকে ব্যবহারণ করতে পারি, তাহলে আশা করা যায়, আমাদের সালাতগুলো প্রাপ্ত হবে পাবে, ইন শা আজ্ঞাহ।

সালাত মনোবোগ স্থাপনের একেবারে শুরুর উপায় হলো নিয়ত। না, আমি আসলে যুক্ত উচ্চারিত সালাতের নিয়তের কথা বলছি না। 'নিয়ত' বলতে আমি মূলত সালাত আদায় করার জন্য আপনি যে মনস্থির করলেন, সেটাকেই নেওয়াতে চাহিছি। কোনো কাজ করার জন্য আমরা যখন মনস্থির করি, তখন সেটাকেই নিয়ত করা হয়। ইলামের নিয়তের রয়েছে ব্যাপক গুরুত্ব। রাস্তুরাই সালাতকে আলাইহি ওয়া সালাত বলেছেন, 'সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল'<sup>[২]</sup>। মানে, যে উদ্দেশ্যে আপনি কাজটা শুরু করবেন, তার ফলাফল দিনশৈবে তাঁই হবে।

[১] সহিহ বুখারি : ১

[২] সহিহ বুখারি : ৩৪৫; সহিহ মুসলিম : ৬৫০। সহিহ বুখারির অন্য আরেকটি খবরিস (৬৫৬) এসেছে, 'আমাদাতে সালাত আদায় করলে একবার আদায়ের চারতে প্রতিশূল দেশি সাওয়াব'<sup>[৩]</sup>। এ মুসলিমের মাঝে 'আমাদাতে সালাত আদায় করলে একবার আদায়ের চারতে প্রতিশূল দেশি সাওয়াব' আদায়ের পের উচ্চিতা করে নেওয়া করলেন হচ্ছে। ইহাম হলু হাজার আবকালানি গাহিনোক্ত বাস্তবে, 'সালাতকুল সাওয়াব সরবে বিবোআত নিয়ে আসে'।



সুরাটি। সালাতে আমরা এত দ্রুত আর এত তাড়াহড়ের সাথে সুরা ফাতিহ

তিলাওয়াত করে থাকি যে, আমরা কী বলছি আর কী পড়ছি তা বুঝেও পাইশ উস্তায আলি হাম্মদা হকিয়াতুল্লাহ একবার একটি কথা বলেছিলেন, ‘সালাতে আর যেভাবে আর যে গতিতে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেন, তিক সেই গতিতে আর প্রিয় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বাস্তির সাথে কথা বলে দেখুন তো তাদের প্রতিক্রিয়া কী হয়?’ ব্যাপারটা আসলে তা-ই। আমরা যত দ্রুত সালাতে সুরা ফাতিহা পড়ি, তিক এই গতিতে কি আমাদের অফিসের বেসের সামনে আমরা কথা বলতে পারব? চুক্তি বেহাল দশা হবে না? অথচ আজ্ঞাহ সুবহানাল্লু ওয়া তাআলা হলেন সম্মানিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। গুরুত্বপূর্ণদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর সামনে সৌজানে টিক কঢ়ো ধীরস্থির, কতটা বিনয় আর ন্য৷ তাঁর সাথে সুরা ফাতিহা পড়া উচিত আমাদের? সুরা ফাতিহা পাঠে আমাদের দ্রুততা কিংবা তাতে অমনোযোগিতার প্রধান কারণ হলো সুরা ফাতিহায় আমরা কী পড়ি সেটা অনুযাবনে আমাদের ব্যর্থতা। আমরা সুরা ফাতিহায় পড়ি—

الحمد لله رب العالمين

সমস্ত প্রশংসা আজ্ঞাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

প্রম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

مَالِكِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

বিচার দিলের মালিক

إِنَّكَ تَعْلِمُ وَإِنَّكَ نَسْتَعِنُ

আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমার কাছেই সাহায্য গ্রহণ করি।

اهدئ الصراط المستقيم

আমাদের সরলপথে পরিচালিত করুন।

সালাতে আমার মন বসে না

১২১

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَشْتَ عَلَيْهِ

তাদের পথে যাদের আপনি করুণা করেছেন।

غَيْرُ التَّضَوُّبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِبِينَ

তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত হয়েছে।

সালাতে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াতের ব্যাপারে খুব সুন্দর একটি হাদিস আছে। ওই হাদিস থেকে আনতে পারি, সুরা ফাতিহা তিলাওয়াতের সময় আজ্ঞাহ সুবহানাল্লু

ওয়া তাআলা আমাদের কথাখালোর জবাব দেন—

বান্দা যখন বলে, ‘আল-হাম্মদু লিল্লাহি রাকিল আলামিন’, তখন আজ্ঞাহ বলেন,

| আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

বান্দা যখন বলে, ‘আর রাহমানির রাহিম’, তখন আজ্ঞাহ বলেন,

| আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করছে।

বান্দা যখন বলে, ‘মালিক ইয়াওমিদ্দীন’, আজ্ঞাহ তখন বলেন,

| আমার বান্দা আমার বড়তু ঘোষণা করছে।

বান্দা ‘ইয়াকা না’ বুলু ওয়া ইয়াকা নাস্তাজিন’ বললে আজ্ঞাহ বলেন,

গাইলিল মাগন্থুবি আলাইহিম ওয়ালাদুল্লীন’ বলার জবাবে আজ্ঞাহ বলেন,

| আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে সে তা-ই পাবে।

[১] সহিহ মুসলিম: ৩৯৫, সুনামুন নসারি: ৯০৯

কী চমৎকার, তাই না? আমরা আজ্ঞাহকে ডাকছি আর আজ্ঞাহ আমাদের ভাবে শব্দ কোনো কথা নয় কিংবা আমার বানানে কোনো আকেশী বর্ণনাও নয়। এটা কিন্তু কথার খণ্টিয়ে শব্দ হাদিস। নবিজির বলা কথা কি কখনো মিথ্যে হতে পারে? আমরা যখন শুব্দে শুব্দ, অনুধাবন করে, দৃশ্যের সমস্ত আবেগ ঢেলে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করব, আরও তখন টিকছি আমাদের ভাবে সাড়া দেবেন। তাই, আজ থেকে আর গংবরাজানে সুরা ফাতিহা পড়া নয়। আজ থেকে আমরা এক ভিন্নভাবে, ভিন্ন প্রেরণা, ভিন্ন ভাবনা নিয়ে সুরা ফাতিহা পড়ব। এমনভাবে পড়ব যেন আজ্ঞাহ আমাদের কথাগুলো শুনতে পাব না। কিন্তু তাতে কী আমরা বিশ্বাস করব যে, তিনি আমাদের তিলাওয়াত শুনছেন এবং জবাব দিচ্ছেন।

সুরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে বুরানের যে অংশ আমার জন্য সহজ, সেই অংশ কাফিরুন, সুরা আসর কিংবা অন্য যেকোনো ছেট বা বড় সুরা। সঙ্গে হলে এই আরবিতে কী বলছি? যদি বুবাতে পারি, তাহলে পড়ার সময় বুবাতে পারব আমরা আসে সহজ হয়ে যাব। মনোযোগ বিছিন হয় না।

তিলাওয়াত শেষ করার পরে আমরা ‘আজ্ঞাহু আকবার’ বলে বুকুতে চলে যাব। ‘আজ্ঞাহু আকবার’ বলার সময় মনের ভাবনায় কোন দৃশ্যপট ঝীকতে হবে তা তো আগেই বলেছি। এবার বুকু এবং সিজদা নিয়ে চমৎকার আরেকটি হাদিস উল্ল্পত্তি করি। নবিজি সাজাজাহু আলাইছি ওয়া সাজাম বলেছেন, ‘বাদ্দি যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন তার গুনাহগুলো তার শরীর থেকে তার কাঁধ এবং মাথায় চলে আসে। এরপর, সে যখন মাথা নিটু করে বুকুতে যায়, তখন সেই গুনাহগুলো তার কাঁধ এবং মাথা থেকে যাবে নিচে পড়ে যায়।’<sup>(১)</sup>

কী চমৎকার একটি সুযোগ! কতই-না সুন্দর একটি দৃশ্য! আমরা যখন একাগ্রচিত্তে সালাতে দাঁড়াই, অমনি আমাদের সকল গুনাহ পুরো শরীর থেকে কাঁধ এবং মাথায় চলে আসে। তিলাওয়াত শেষ করে যখন আমরা বুকুতে যাই, তখন আমাদের গুনাহগুলো বরে পড়ে যায়!

[১] সহিত ইবনু বিবান: ১৭৩৪; সিলসিলাতুল ফাতেহ

এই কথাটি পর্যবেক্ষণে কোনো সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ কিংবা অর্থশাস্ত্রবিদের নয়। এই কথা নিয়ে বলেছেন তিনি হলেন সর্ববৃহৎ মানুষ—রাহমাতুল্লিল আলামিন। তাহলে এই কথায় কি কোনো খাদ থাকতে পারে? এই কথা নিয়ে আমাদের কারণও মন কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? অবশ্যই নয়। তিনি যখন বলেছেন, বুকুতে গোল বালার গুনাহ বরে পড়ে, তখন সেটা অবশ্যই অবশ্যই সত্য।

বিশ্বাস করুন, এই হাদিসটির শেষের অন্তর থেকে আমল করে আমরা যদি খাটি নিয়ত আর বিশ্বাস করুন নিয়ে সালাত পড়ি, আমাদের মনই চাইবে না বুকু থেকে মাথা ঝঠতে। মন চাইবে, ধাকি না আরও বিশ্বাস। গুনাহগুলো সব ধূমেশুমে বরে যাব। আমাদের মন এই বাপুরাটি বুকুমুল হয়ে গোল বুকুতে আমরা আন রকম একটা মজা পেয়ে যাব।

বুকুতে আমরা আরও বিশ্বাস রাখতে পারি। যেমন—আমি এমন এক সম্ভব কাছে মাথা নইয়ে নিয়েছি যিনি এই সুবিশাল সৃষ্টিজগতের অধিপতি। মালিক। যার কাছে আমি নিতান্ত তুচ্ছ। আমি হলুম দাস আর তিনি মালিক। আমি মাথা নইয়ে তাকে বলছি, ‘মালিক, আপনি মহান। মালিক, আপনি মহান।’

এরপর গভীর মনোযোগের সাথে বুকুর তাসবিহ পাঠ শেষে ‘সামিআজাহু লিমান এবং হামিদাহ’ বলে মাথা ঝঠব। এই ‘সামিআজাহু লিমান হামিদাহ’ অর্থ কী? এর অর্থ হলো ‘আমার রব সেই বাস্তির প্রশংসা শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে’ কী দুর্বল একটি কথা! আমি যখন আমার রবের প্রশংসা করি, আমার রব তখন সেই প্রশংসা করিব মেসি কি শোনে। একটু ভাবুন তো—আমরা যখন ফুটবলার মেসির প্রশংসা করি, মেসি কি আমাদের সেই প্রশংসা শোনে? আমরা যখন কোনো অভিনেতা, কোনো গায়ক, আমাদের সেই প্রশংসা শোনে? আমরা যখন কোনো শিল্পীর প্রশংসা গুণগুণ হাই, তাদের কোনো শিল্পী বা পথিকী বিখ্যাত কোনো সেলিব্রিটির প্রশংসায় গুণগুণ হাই, তাদের কোনো শিল্পী বা পথিকী বিখ্যাত কোনো সেলিব্রিটির প্রশংসায় গুণগুণ হাই, যখন আমি বালুকণ পরিমাণ ও মূল্য নেই, সেই সুব্যহান সত্ত্ব আমার প্রশংসা শোনেন, যখন আমি তাঁর প্রশংসা করি। তিনি আমার স্তুতি শোনেন, যখন আমি তাঁর স্তুতি পাই। আমি তাঁর প্রশংসা করি। আমার সেই শব্দ, সেই স্তুতিবাক্য সত্ত আসমানের পর্দা তের করে সেজা আরশে আমার সেই শব্দ, সেই স্তুতিবাক্য সত্ত আসমানের পর্দা তের করে সেজা আরশে আমিমে পৌছে যাব। তাতে কোনো বিশ্বাস দরকার হয় না, দরকার হয় না কোনো প্রয়োগিতা। তাতে দরকার হয় না কোনো মাথায়, কোনো প্রয়োগিতা।

দরকার হয় কেবল আমার একাগ্রতা, বিনয় আর ইখলাস। যস, আর কিছু না। যে, রাজাধিরাজ আলাহ আমার প্রশংসা শুনছেন—এই ব্যাপারটি তো অন কোম।  
বুকু শেষ করে আমরা সিজদায় যাই। সিজদা হলো আলাহ এবং বাদ্যর মধ্যকাৰ  
সম্পর্কের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠিতম মুহূৰ্ত। বাদ্য সিজদায় আলাহৰ সমচাইতে নিষ্ঠিত  
হয়ে যায়। আমরা যখন সিজদায় যাব, তখন আমরা আরও কিছু ব্যাপার মানপন্থে  
এঁকে নেব। আগের মতো এবারও আমরা যাব কৰব নিজেদের পাপের কথা,  
অবাধ্যতার কথা। মনিবের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে একজন দাস কী করে?  
হাউমাউ করে কেইন্দ্ৰিক মনিবের পা জড়িয়ে ধৰে বলে, ‘মাফ করে দেন ইষ্টু।  
আমি অন্যায় করেছি। আমি জানি আমি ঠিক কৰিনি। আমি আপনার কাছ  
বিনীতভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। আপনি মাফ না করলে কে  
আমাকে মাফ করবে, বলুন? আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে?’

হাঁ, সত্যিই আলাহ বাতীত আমাদের আসলে আর কেউই নেই। আলাহৰ চাইতে  
উন্নত অভিভাবক আমাদের জন্য আর কেউ ইতেই পারে না। সিজদায় আমরা সেই  
সভার কাছে লুটিয়ে পড়ব, যিনি আমাদের লালনপালন করেছেন আমাদের মায়ের  
পেটে, যিনি আমাকে দুনিয়ার আলো-বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি পাপী,  
মূনাহগুর। নিজের আল্লার সাথে নিয়ত যুলুম করে চলা এক জালিম আমি। আমাকে  
ক্ষমা করতে পাবে শুধু আলাহ। সেই আলাহৰ কাছেই সিজদায় আমি লুটিয়ে পড়েছি।  
আমার এখন কাজ কী? আমার কাজ হচ্ছে যেভাবেই হোক ক্ষমা আদায় করে  
নেওয়া। বাচ্চা যেভাবে মায়ের কাছ থেকে বুকের দুধ আদায় করে নেয়। কৃধা পেলে  
সে যেমন হাউমাউ করে কানা জুড়ে দেয়, ঠিক সেভাবে গুনাহের ভারে নুহিয়ে পড়।  
এই আলাকে জাহানামের লেপিহান আগুনের শিখা হতে বাঁচাতে আমাকেও কাঁদতে  
হবে। হুঁচু করে কান্না! চেখের জল ফেলতে হবে। বলতে হবে, ‘আলাহ, পাপ করতে  
করতে নিজেকে পাপের অতল সাগরে ডুবিয়ে ফেলেছি। নিঃশ্বাসজুড়ে কেবল পাপ  
আর পাপ। শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে পাপের অবাধ প্রবাহ। আমার পাপের  
স্তুপের কাছে হিমালয় পর্বতও নসি। কিন্তু আপনি তো রাহমানুর রাহিম, দয়ালু।  
আপনি ক্ষমা না করলে কে এমন আছে যে আমাকে ক্ষমা করবে? রাস্তা দেখাবে?  
বেড়ে নেই। আমায় ক্ষমা করে দিন। আমাকে সরল-সহজ পথে পরিচালিত করন।’

সালাতে আমার মন বসে না

বিজ্ঞদায় আস্তরিক হতে হবে। মনপ্রাণ এক করে আলাহৰ কাছে চাইতে হবে। যা  
কিছু চাওয়ার, যা কিছু পাওয়ার সব সবিস্তারে আলাহৰ কাছে খুল বলতে হবে।  
আলাহৰ বড়ত্বের কাছে নিজের তুচ্ছতা অঙ্গে এনে আলাহকে মন থেকে ডাকতে  
হবে যদি সালাতের সাথে আমাদের মন জুড়ে যায়, যদি আমাদের সালাতগুলো  
গুণ হিসেবে পায় নতুন করে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সালাতের জন্য  
আমাদের মন সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকবে। প্রিয়জনের দর্শনলাভের জন্য যেমন করে  
ব্যাকুল, অস্থির হয়ে থাকে মন, ঠিক সেভাবে সালাতের জন্য, সালাতে আলাহৰ  
কাছে নিজেকে সংপো দেওয়ার জন্যও আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ব।

ذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ ⑤ الَّذِينَ هُمْ فِي ضَلَالٍ يَهُمْ خَاطِئُونَ ⑥

সে সকল মুমিন সফলকাম হয়ে গেছে, যারা তাদের সালাতে বিনয়ী।



## ତୋମାଯ ହୃଦ ମାଝାରେ ରାଖିବ...

মানুষের একটি স্বভাব হলো—সে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি, সবচাইতে মূল্যবান বস্তুটি সবচেয়ে সুরক্ষিত জায়গায় রাখতে চায়। এজনেই প্রিয় কেনে উপরে আমরা আমদের প্রিয় জায়গায় সাজিয়ে রাখি। মূল্যবান জিনিসটি সুরক্ষিত থাকে এনে রাখি যাতে করে সেটা হারিয়ে না যায়। ছুরি হয়ে না যায়। এভাবেই প্রিয় লেখকের অটোগ্রাফওয়ালা বই, প্রিয় মানুষের সাথে তোলা হবি, প্রিয়জনের পাশাপাশে চিরকুটকে আমরা পরম যত্নে আগলে রাখি।

ପିଲ୍ଲା ମାନୁଷଟାକେ ଆମରା କଥନୋହି ଚୋଖେର ଆଡ଼ାଳ ହତେ ଦିତେ ଚାଇ ନା । ତାର ଏକୁ  
ଅନୁପସିଥିତ ଆମାଦେର ହସନ୍ତକେ ଅଶାଙ୍କ କରେ ତୋଲେ । ତାର ଏକଟୁ ଅଭିମାନ ଆମରେ  
ହୁଦୁୟେ ଘଟାଯି ରକ୍ତକୁଣ୍ଠଣ । ତାର ସାଥେ ଏକଟୁ ଦୂରତ୍ତ ଆମାଦେର ହସନ୍ତରେ ଭାଜମେର ଥାବନ  
ତୈରି କରେ । ଆମରା ତାକେ କଥନୋହି ହାରାତେ ଚାଇ ନା । ଦୂରେ ରାଖିତେ ଚାଇ ନା । ଆମରା  
ସବସମ୍ମାନ ତାକେ କାହେ କାହେ ଚାଇ । ଚୋଖେ ଚୋଖେ ଚାଇ । ଚାଇ ଅନ୍ତରେ ଆସିବ ।

তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব...

বাধ্যতে বলেছেন হৃদয়াবাবে এবং এই কাজের জন্য তিনি এমন এক মহাপুরুষকারের প্রেরণা দিয়ে গ্রেচেন যা আমরা কঢ়ানাও করতে পারি না। তিনি সাতজন ব্যক্তিকে কিয়াছেন মাত্র আলাই আরশের নিচে ছায়া প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সেই মহাপুরুষালোচনা দিন যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না। একটু ছায়ার জন্য যেদিন সব মানব হাতাকর-হাতিপোশ করবে। এমন বিভীষিকাময় দিনে আলাই সুব্রহ্মানাথ প্রভা তাজালা সত শ্রেণির ব্যক্তিকে ভালোবেসে, পরম মত্তায়, অপর অনুগ্রহে তাঁর আরশের ছায়ার নিচে আপ্য দেবেন। সেই সত শ্রেণির মধ্যে একটি শ্রেণি হলো ওই সকল লোক, যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে।<sup>(১)</sup> অর্থাৎ, যাদের হৃদয় মসজিদেই পড়ে থাকে। ওই সকল লোক, যারা মসজিদকে হৃদয়ের সাথে বৈধে রাখে, যারা মসজিদকে তাদের অঙ্গের সাথে পোথে রাখে।

ভারতের মসজিদকে আবার অস্তরের সাথে বৈধে রাখে কীভাবে, তাই না? আসলে এটি একটি উপমা। এই উপমার মাধ্যমে নিবিজি হন্দয়ের কাকুতি, অস্তরের ব্যাকুলতা পুরোচনে। যে কাকুতি হবে সালাতের জন্ম। যে ব্যাকুলতা হবে আলাহর কাছে নিজেকে সঙ্গে দেবার জন্ম। তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্ম হচ্ছেগান্ডীর যে উৎসেতা কাজ করবে, সেটাকেই উদ্দেশ্য করেছেন প্রিয় নবি সালালালু আলাইহি ওয়া সালাম। মসজিদে এক ঘোষণা সালাত পড়ে আসন্ন পর আপনার অস্তর আবার ছাটফট করতে থাকবে পরবর্তী ঘোষণের জন্ম। আপনার হন্দয় তড়পাতে থাকবে পুনরায় মসজিদে যাওয়ার জন্ম। আবার সালাতে শামিল হওয়ার জন্ম আপনার মন সবসময় উন্দীপুর থাকবে। প্রচন্ড ব্যাস্ততার মাঝেও আপনার কান সর্বদা সংজ্ঞ থাকবে যেন পরবর্তী সালাতের আয়ন মিস না হয়। আপনি বারবার ঘড়ির দিকে তাকাবেন সালাতের ঘোষণা হয়ে দেল কি না বা ঘোষণা হতে আর কতক্ষণ সময় থাকি আছে সেটা দেখার জন্ম। সেই মোতাবেক আপনি আপনার কাজকর্মসূলোকে যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট করে আনবেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই যখু করে রাখবেন অথবা যখু করার সময়টাকু হাতে রেখেই মসজিদে যাবেন। মসজিদে জামাইত হয় এমন সময়ে আপনি কথনেই মিঠি রাখবেন না। জুরুর কাজে ব্যস্ত থাকবেন না। আপনার কাজ আবার ব্যস্ততার মাঝেও মনের মধ্যে একটা ভাঙ্গা কাজ করবে, ‘জামাইতেই আমাকে সালত আদায় করতে হবে’ এটাই হলো মসজিদকে বুকের সাথে খেঁবে রাখা। অস্তরের সাথে খেঁবে কেলা। হলু মাঝারে স্থান দেওয়া। এই জিনিসটা যাইহু বিশ্ব করতে পেরেছে, তাদের জন্মাই

१०५ अंकिता, २०१०: साइट भवगिम: १०५

হাদিসের ওই মহা সুসংবাদ। তাদেরই হাশেরের মহাবলে আজাই সুবহানাক্ত গো তাজাল  
তার আয়শের নিচে আয়া দেওয়ার প্রতিষ্ঠৃতি দিয়েছেন।

আরেকটু সহজ করা যাব। আচ্ছা, নিজেকে প্রশ্ন করি তো, ‘আমি কি সিদ্ধের দেখি?’ যদি উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে কথনো কি জানার চেষ্টা করেছি, সিদ্ধের দেখা আমার জন্য হালাল না হারাম? এটা কি আমার জন্য বৈধ না আবেগ? যেনেই অর্থনৈতিক মহিলারা অভিনয় করে, যেখানে একজন পুরুষ আর একজন নারীর পরস্পরের প্রদর্শিত হয়, অবাধ মেলামেশাকে প্রদর্শন করা হয়—এমন জিনিস কি একজন মুসলিম হয়ে আমি দেখতে পারি? আচ্ছাই কি আমার জন্য এটা অনুমোদন করেছে?

নিজের কাছে এভাবে প্রশ্নের ডালা মেলে বসি, চলুন। নিজেকে একের পর এক প্রশ্নে জরুরিত করি—আমি কি হাসাম রিলেশানশিপে আছি? আমি কি কিংখো কথা বলে মানুষ ঠকাই? আমি কি অন্যের হক নষ্ট করে চলি? পিতা-মাতার ব্যাপারে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আজ্ঞাহ সুবহানান্ন ওয়া তাতালা আমাকে দিয়েছেন, তা কি আমি পালন করছি? আমি কি কোনোভাবে আমার পিতা-মাতার অসম্মুক্তির কারণ? আমার দ্বারা কি আজ্ঞাহ কোনো বাদা কিংবা সৃষ্টির ক্ষতি সাধিত হচ্ছে? আমি কি আমার সহপাত্তী মেয়ের দিকে কুন্জেরে তাকাই?

ନିଜେକେ ପ୍ରଥା କରେ ଉତ୍ସରଗୁଲେ ଏକେର ପର ଏକ ସାଜାତେ ହବେ। ଯଦି ଆମରା ଏହି ଧରନେର ପାପେ ସତି ସତିଇ ନିରଜିତ ଥାକି, ତାହିଁ ଆଜିକେ, ଏହି ମହର୍ତ୍ତ ଥେବେଟି

তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব...

হাতবা করে দিয়ে আসতে হবে। বদলে যেতে হবে নিজেকে। পাটেই ফেলতে হবে অস্থা। এভাবে কৃত পাপগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই আমরা সহজে আমাদের অন্তরকে মনস্তিদের সাথে সংযুক্ত করতে পারব।

প্রথমে মধ্যে নিমজ্জিত থাকার দুর্ভ আমরা ভালো কাজ থেকে দূরে সরে যাই। পাপ করলুম কখনোই আমাদের আরাহত কাছাকাছি আসতে দেয় না। পাপের সাগরে আমরা অবশ্যই ফেলে আমাদের অস্তর তাওবার দিকে ঝুকে আসে না। তখন আমাদের সালাত ভালো লাগে না, সিয়াম ভালো লাগে না। রামাদান মাসকে তখন আমাদের কাছে বাঢ়তি একটা বোবা মনে হয়। কেবল চক্ষুলজ্জা এড়াতেই আমরা সব সিয়াম রাখি আর মসজিদে দিয়ে থাকি।

এ প্রসঙ্গে খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন হাসান আল বাসরি রাষ্ট্রমন্ত্রীর  
একবার একলোক তার কাছে জানতে চাইল, ‘আজ্ঞা, আপনি তো বলেন, পাপ  
করলে নাকি আরাহ তার নিয়ামতগুলো থেকে বাদামে বিচ্ছিন্ন করেন। আমি  
কিছু প্রচুর পাপ কাজ করি এবং ভালো কাজ এককাম করিই না বলা চলে। কিন্তু  
দেখুন, আমার খুব শুদ্ধ একটি স্তৰী আছে। সশনসন্তুতি আছে। আমার রয়েছে  
প্রাণ টাকা ও ধনসম্পদ। বলা চলে, আরাহ আমাকে কেনো কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন  
করেননি। তাহলে আপনি কীভাবে এই কথা বলেন যে, পাপ কাজ করলে আরাহ  
বাদামে তার নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন করেন?’

(ଲୋକଟାର କଥା ଶୁଣେ ହାସିନ ଅଳ ସମ୍ପରି ରାହିମାହୁର୍ରାହ ବଲୋଲେ, ‘ଆଜ୍ଞା, ତୁ ମିଳି ରାତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିଲେ ପାରୋ? ଆତ୍ମରିକତାର ସାଥେ କଥନୀ ଆଜାହର କାହେ ଦୂର କରାତେ ପାରୋ? ତୁ ମିଳି କି ତୃପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ କଥନୀ ଶାଲାତ ଆଦିଯି କରାତେ ପାରୋ? କୁରାଜାନ ପଢ଼ାତେ ପାରୋ? ଏବେବି ତୋ ଆଜାହର ନିଅମିତ ହେବେ ବସିଛି ହରାର ଜୟ ଥୁବେଟି’

হাদিন আল বাসতি রাহিমাহুজ্জাহ শুন্দর এই জ্বালাটির মাঝে অনেক উত্তর লুকিয়ে  
আছে আমাদের জন্য। বাধ্যতিকভাবে, আমরা আমাদের চারপাশে এমন অনেক লোককে  
দেখি যারা আগামোগো পাপের সাথের হাতুড়ু খাচ্ছে। সুন খাচ্ছে, সুন খাচ্ছে। দুর্ভাগ্যি-  
করছে, মানুষ ঠকাচ্ছে। আঙীল কাঁচে জড়িয়ে আছে। কিন্তু তারপরও তাদের ধনসম্পদ  
উত্তোলনের বৃক্ষ পেরেই ঢেলছে। এই ধরনের মানুষের কাহে মিয়ে জিঙ্গেস করুন তো,  
শেষ করে তারা আলাইবৰ কাহে আঙীলিকরণ সাথে কালতে পেরোছে, মনে আছে কি  
না। শেষ করে তারা কেবল আলাইকে বাঁচি-বুঁচি করার জন্য সলালত আদায় করেছে,



মনে আছে কি না। শেষ কবে সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ ধরে  
রাখতে পেরেছে, মনে পড়ে কি না। পাপের মধ্যে ডুবে থাকার ফল এমনটি। আপনির  
সাথে দুলিয়ার সম্পর্ক বেড়ে যাবে, কিন্তু আজ্ঞাহর সাথে আপনার সম্পর্কের দ্রুত  
কেবল বাড়তেই থাকবে। আপনি পাপের মধ্যে আমগ ডুবে থাকলে কখনোই সালাতে  
মনোযোগ দিতে পারবেন না। বৃক্ষ এবং সিজদার তাসবিহগুলোতে কী বলছেন সোন  
কেবল শারীরিক ব্যায়ামে পরিণত হবে। আযান হলেই আপনার বিরক্ত লাগবে সোন  
ছেড়ে মসজিদে যেতে মন চাইবে না। তবুও, আমার সহকর্মীরা মসজিদে যাচ্ছে,  
আমি না গেলে কেমন দেখায়—এমন চক্রবলজ্জা এড়াতে অনিষ্ট সত্ত্বেও আপনাক  
কিছুতেই আপনি মজা পাবেন না। বরং আপনি ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠবেন। মনে হচ্ছে,  
যেন সালাত থেকে পালাতে পারবেন আপনি নেঁচে যান। অবস্থা যদি এমন হয়,  
তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, আমাদের অস্তরঙ্গতে এক মহামারি চলছে। সেখানে  
পাপের বীজগুলো একেকটা মহিরুহে পরিণত হয়ে আছে। সেই মহিরুহগুলোকে  
উপভোগ না গেলে তা একদিন আমার সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং, আমাদের অস্তরকে মসজিদের সাথে বৈধে ফেলার একটি শর্ত হলো  
পাপ থেকে মুক্ত থাকা। যখনই আমি যিথে বলা থেকে নিজেকে নিবৃত করব,  
যখনই অনেকে হকের বাপারে সচেষ্ট থাকব, যখনই অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে  
যথাসম্ভব বাচিয়ে রাখব, যখনই নিজের জীবন থেকে আমি সমস্ত অঞ্চলিতা ও তার  
নিয়ামকসমূহকে বেঁচিয়ে বিদেয় করে দেবো, তখনই সেখানে প্রতিষ্ঠাপিত হবে  
একটি নূর। সেই নূর হলো হিদায়তের নূর। সেই নূরের বালকানিতে বালমু করে  
উঠবে আমাদের দেহ-মন। তখন সালাতের জন্য আমরা সারাক্ষণ উদ্ধৃত থাকব।  
করে আযান হবে, করে মসজিদমুঠী হব—এমন চিন্তায় বিভোর থাকবে আমাদের  
অস্তর। যাদের অস্তরে মসজিদের জন্য এমন মায়া, এমন টান, এমন ভালোবাস  
বিদ্যামান, তাদের জন্যই তো সুসংবাদ দিয়েছেন নবিজি সালাহাদু আলাইহি ওয়া  
সালাম। তারাই হবে সেই ছায়ার নিচে আশ্রয়াপ্ত সৌভাগ্যবানের দল। যেদিন  
আজ্ঞাহর আবশের ছায়া ব্যক্তিত অন কেনে ছায়া থাকবে না, সেদিন এই ছায়ার  
নিচে থাকতে হলে আমরাও কি মসজিদকে আমাদের অস্তরের সাথে বৈধে রাখতে  
পারি না? পারি না আমাদের দুদ মাঝারে মসজিদকে সভ্যকার স্থান দিতে?

## যুধ মানে শত্রু-শত্রু খেলা

আমাদের জীবনে আমরা নানা সময়ে নানান অঙ্গীকার করে থাকি। সেই অঙ্গীকারগুলোর  
কোনোটা আমরা পূরণ করতে পারি, কোনোটা পারি না। কোনোটা পূরণে আমরা উদ্ধৃত,  
আবার কোনোটার নেকায় আমরা চৰম উদসীনতা প্রদর্শন করি। ধরা যাক আমরা কোনো  
এক শত্রুর কথা। সে অঙ্গীকার করেছে যে, জীবনে সে আমাকে কখনোই সফল হতে  
সক্ষম না। আমার সফলতার পথে সবসময় সে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। যখনই আমি মাথা ডুঁ  
দেবে না। আমার সফলতার পথে সবসময় সে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। আমি দাঁড়াতে চাইলে আমাকে  
করে দাঁড়াতে চাইব, তখনই সে আমার পা টেনে ধরবে। আমি দাঁড়াতে চাইলে  
বসিয়ে দেবে। আমি দৌড়াতে চাইলে আমাকে থারিয়ে দেবে। আমি বলতে চাইলে  
আমাকে চুপ করিয়ে দেবে। মোদ্দাকথা, সে আমার জীবনের সাথে গুতপ্লেতভাবে  
জড়িয়ে যাবে। আমার ক্ষতি করার জন্য দুলিয়া যা যা করতে হয়, তার স্বাটাই সে  
করবে। তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যাই হবে আমার ক্ষতি করা। আমাকে বিপর্যাসী করা।  
আমাকে পথভ্রষ্ট করে ফেলা। আমাকে আমার সফলতার রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

বিবেক-বৃদ্ধি দিয়ে তাকে প্রসারণ করতে চাইল না? সচেতন বৃদ্ধিমান হওয়ার জন্য এই অবশ্যই। এ রকম প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যথাগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, অবশ্যই। সত্যিকারার সচেতন ও দুরদৰ্শী মানুষের কাজ।'

তাহলে, এবার আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই আপনার জীবনের এমন এক শৃঙ্খলা সাথে, যার চাইতে বড় শত্রু আপনার জন্য আর কেউ নেই। যে আপনার জীবনের সফলতার পথে বাধা। অন্ত জীবনের যে মহাসাফলের কথা আপনাকে আপনার রব শুনিয়েছেন, যুগে যুগে নবি-রাসূলগণ যে মহাসাফলের কথা আপনাকে শুনিয়েছেন, সেই সফলতার দরজায় আপনার জন্য দুর্গম্বস্থান বাধা হয়ে নথিয়ে আছে যে শত্রু, তাকে আপনি চিনতে চান না? আপনাকে আপনার রব চিনিয়ে দিলেন তাঙ্গে—

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ কর

এবার আপনি আপনার প্রকাশ, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু, আপনার সফলতার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক তাকে ঢিলে ফেলেছেন। শুধু শত্রুকে ঢিলে ফেলেছেই তার শত্রুতা থেকে বাঁচা যায় না। তার কলা-কোশল, তার পরিকল্পনা, তার দুরভিসম্মিতি, তার অসং অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে না পারলে শত্রু ছিঁতিকরণের যে সাফল্য, তা ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষিত হতে বাধ্য। আপনার রব আপনাকে এখানেও হতাশ করেন। তিনি কখনো তার প্রিয় বান্দাদের হতাশ করেন না। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। তাই, তিনি কেবল আপনাকে শত্রু চিনিয়ে দিয়েই যেমের ঘানিনি বলেননি, ‘শত্রুকে চিনিয়ে দিলাম। এবার তার পরিকল্পনা জেনে নিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নাও।’ তিনি শত্রু চিনিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি শত্রুর পরিকল্পনাও আপনার সামনে তুলে ধরেছেন। আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু আপনাকে নিয়ে কী ফন্ডি আঠছে। আপনাকে যিয়ে আপনার শত্রুর মহাপরিকল্পনা তিনি ফাঁসি করে দিয়েছেন এজনাই যে, তিনি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসেন। আপনি যাতে নিরিষে শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে পারেন, শত্রুকে পরাস্ত করতে পারেন, শত্রুর পরিকল্পনা জেনে তাকে ঠেকানোর যথাযথ পদস্থেপ গ্রহণ করতে পারেন।

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪৮

যুদ্ধ মানে শত্রু-শত্রু থেলা

গু. শ্যাতন আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রকাশ্য শত্রু। আপনাকে দিয়ে শ্যাতনের হচ্ছে ক্ষেত্রের নীল নকশা। সেই নীল নকশাগুলোর ফাঁকফোকের জ্ঞেনে আপনাকে সমান্য অস্থির হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে, সামান্য একটু পুর ফসকালেই আপনি অঙ্গ গুহ্যে হারিয়ে যেতে পারেন। তাই অতি সাধারণে, খুব সর্বক্ষর সাথে আপনাকে পথ চারতে হবে। আপনাকে আরও মনে রাখতে হবে, শ্যাতন কখনোই আপনার মহান বরের চেয়ে বড় নয়। শ্যাতনের শক্তি কখনোই আপনার প্রতিপাদকের শক্তির ওপর বিজয়ী হতে পারে না। তবে, এটা নিশ্চিত, শ্যাতন আপনার চেয়ে অধিকর্তৃ শক্তিশালী। শ্যাতনের চক্রান্তের কাছে আপনি নিতান্তই শিখু। শ্যাতনের পরিকল্পনার সামনে আপনার পরিকল্পনা স্ফেহ ঝড়কুটোর মতন উড়ে ঢেলে যাবে। তাই কখনোই এমন ধরণ করা উচিত নয় যে, আপনি নিজ দেশায় শ্যাতনকে প্রারম্ভ করে হেজে পারবেন। এটা একেবারেই অসম্ভব। এমনকি আজ্ঞাহর শক্তিশালী কালাম দ্রুতান মার্জিন পাঠের সময়ও আমরা বিতর্কিত শ্যাতনের কাছ থেকে আজ্ঞাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। বলি, আউয়ু পিলাহি মিনাশ শাইতনিলির জাতীয়।

আপনাকে দিবে আপনার প্রকাশ্য শত্ৰু, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশ্মন শয়াতলের চার-চারটে মাস্টারজন্যান রয়েছে। কুরআনের সুরা নিম্নাংশ মধ্যে আলাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তাওয়া সেই চারটে পরিকল্পনা, সেই চারটে মাস্টারজন্যান বিবৃত করেছেন। শয়াতল খনন তার দোষে আসমান থেকে ভিত্তিত হলো, যখন সে অভিষ্ঠপ্তদের কানাতের নাম লেখাল, তখন সে মহান আলাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তাওয়া সামনে চারটে অঙ্গীকার তথ্য শপথ করে। সেই চারটে শপথ সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। জাহাজামের লেনিলাহন শিখ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই আপনাকে জানতে হবে।

## শয়তানের প্রথম অঙ্গীকার ছিল—

وَلَا يُضْلِلُنَّهُمْ

ଏବଂ ଆମି ତାଦେର ଅବଶ୍ୟକ ପଥଭର୍ତ୍ତ କରିବ (୧)

শয়তান এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবন্ধ যে, সে আপনাকে পথভ্রষ্ট করবে। সে অপনাকে পথভ্রষ্ট করবে। সে অপনাকে বিপথ্যামী করবে। সে অপনাকে কীভাবে আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে, সে ব্যাপারটা বোধের জন্য আমা সুনির্দিষ্ট একেবারে শুরুর দিকের একটা ঘটনায় আলোকপাত করতে পারি। আদম আলাইহস সালাম এবং হাওয়া আলাইহস সালামকে শয়তান কীভাবে জারাত থেকে বিচুত করেছিল সেই ঘটনা আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি। মজার বাপুর হচ্ছে, শয়তান যে জিনিসটা সবচাইতে ভালো বেবে সেটা হলো মানুষের সাইকোলজি। শয়তান যে জিনিসটা সবচাইতে ভালো বেবে সেটা হলো মানুষের সাইকোলজি। শয়তান টোপ ফেলে। যেমন—আদম আলাইহস সালাম এবং হাওয়া আলাইহস সালামকে সৃষ্টি করার পরে আলাহ সুবহানাখু ওয়া তাআলা তাদের জামাতে ধারণ দিয়েছিলেন। তবে, সাথে ঝুঁড়ে দিয়েছেন একটা শর্ত, একটা নিমেখাজ্ঞা। জামাতে সবখানে তারা বিচরণ করতে পারবে, ঘুরে বেড়াতে পারবে, সমক্ষিতে ভোগ করতে পারবে, তবে নির্দিষ্ট একটা গাছের কাছে তারা যেতে পারবে না। এই নিমেখাজ্ঞা মেলেই আদম আলাইহস সালাম এবং হাওয়া আলাইহস সালাম জামাতে থাকতে শুরু করলেন। এই নিমেখাজ্ঞার ভেতর থেকেই শয়তান নিজের চালটা বের করে আস।

জামাতের পরমানন্দে অভিষ্ঠত হয়ে যান আদম আলাইহস সালাম এবং হাওয়া আলাইহস সালাম। আহা! সুপ্রিয় তো এত সুন্দর হয় না! সেই অপরূপ নৈসর্গিক সুর্গেদ্যানে তারা খুব আনন্দের সাথেই দিন কাটাতে লাগলেন। এমনই আনন্দমূলক একটা দিনে, একদিন ইবলিস শয়তান তাদের কাছে এলো। বলল, ‘আলাহ যে তোমাদের এই গাছটির নিকটে যেতে বারণ করলেন, তার কারণ জনো? তার কারণ হলো—তোমরা যদি এই গাছটার কাছে যাও এবং এই গাছের ফল খাও, তাহলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে, নয়তো তোমরা এখানে চিরঅমর হয়ে যাবে। যাতে তোমরা ফেরেশতা বনে যাওয়া কিংবা চিরঅমর হওয়ার সুযোগ না পাও, সে জনোই কিন্তু আলাহ তোমাদের এই গাছের কাছে হৈবতেও নিষেধ করেছেন।’<sup>[১]</sup>

বলা বাক্সে, সৃষ্টিগতভাবেই নিমিখ জিনিসের প্রতি মানুষের রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ। তারা হয়তো ভাবল, ‘এত পরমানন্দের সবখানে যাওয়ার, সবকিছু ছোঁয়ার, সবকিছু করার অনুমতি আলাহ সুবহানাখু ওয়া তাআলা দিয়েছেন, তাহলে কেবল এই

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ২০

গাছটির নিকটেই-বা কেন যেতে বারণ করলেন? কী এমন আছে এই গাছটায়?’

শুধুতে শয়তান মানুষের চেয়ে আরও কয়েক কাটি সরেস। সে আরও বলল, ‘আমি কিন্তু তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের ভালো চাই বলেই কিন্তু কথাগুলো কলাম।’<sup>[২]</sup> শয়তান যার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়, তার বি আর নতুন করে শুরুর কলাম।  
‘আদম আলাইহস সালাম এবং হাওয়া আলাইহস সালামেরও নতুন পত্রু দরকার পতেনি। শয়তানের এহেন প্রোচনায় প্রতিরিত হয়ে তারা দুজনে শেষ পর্যন্ত এই গাছের ফল খেয়ে বসেন এবং জারাত থেকেই বিচুত হন।

শয়তানের প্রোচনার ব্যাপারটা খেয়াল করুন। সে কিন্তু খুব সাদাসিধে, প্রটোভায়ী, এবং হিতাকাঙ্ক্ষী সেজেই আদম আলাইহস সালাম এবং হাওয়া আলাইহস সালামের কাছে এসেছিল, এবং তাদের সাইকোলজি বুঝেই তাদের জন্য টোপ মেলেছিল। একটা নিমিখ জিনিসকে আকর্ষণের কস্তু বানিয়ে সেটার সাথে এমন দৃষ্টি জিনিসকে সে জড়িয়ে দিয়েছে যা ক্ষণিকের জন্য আদম আলাইহস সালাম এবং হাওয়া আলাইহস সালামের মনে জড়গা করে নিয়েছিল। ফেরেশতা হয়ে যাওয়া হাওয়া আলাইহস সালামের মনে জড়গা করে নিয়েছিল। ফেরেশতা হয়ে যাওয়া আলাইহস সালামের মন। কিংবা চিরঅমর হয়ে থাকা। মুহূর্তেই এই দুটোর জন্য প্রলুক্ষ হয়ে ওঠে তাদের মন। ফলে, তারা তাদের কৃত ওয়ালা ভুলে যান এবং ওই নিমিখ গাছের ফল খেয়ে বসেন।

বাস্তব জীবনে শয়তানের চালগুলো এমনই। সে মানুষকে এভাবেই বিভাস্ত, পথচার করে থাকে। আপনার শত্ৰু বেশে শয়তান আপনার সামনে হাজির হবে না কখনোই। আপনার চিরাইতেই, চিরশুভাকাঙ্ক্ষী সেজেই সে আপনার সামনে উপস্থিত হবে। এখনেই সে আপনার মন বুঝে নেবে। আপনি কেন জিনিসের প্রতি আসস্ত, আকরিত সেটা জেনে নিয়ে, সেই মোটাবেক শয়তান আপনার জন্য টোপ ফেলবে। আপনার আপনাকে সে বোঝাবে, ‘দেখ বাপু! হতে পারে দুর্গাপুজা হিন্দুদের উৎসব। সেই আপনাকে সেখানে ফেলেই যে তোমার মুসলমানিত নিয়ে টানটানি পড়বে, তাও না। এটাকে সেখানে ফেলেই যে তোমার ধর্মীয় উৎসব হিশেবে না দেখে কেবল একটা সাধারণ উৎসব হিশেবেই তুমি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হিশেবে না দেখে কেবল একটা সাধারণ উৎসব হিশেবেই তোমার বাড়ির পাশের একটা উৎসবই মনে করো। মনে করো। সেখানে দেখো। তোমার বাড়ির পাশের একটা উৎসবই মনে করো। তাই না? ওই একটা মেলা হচ্ছে। তোমার সাদা মনে তো আর কেনো কাদা নেই, তাই না? ওই

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ২১

দেৱীকে তো তুমি পুজোও কৰছ না, তাৰ পায়ে মাথাও ঢেকাছ না। কেৱল এক্ষণ্যে  
চিত্ৰবিনোদনের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছ। আৱাও কতজনই তো যায়। এতে কি তাদেৱ ভাঙ  
যাচ্ছ, না ধৰ্ম লোপ পাচ্ছে?’

অথবা শয়তান আপনাকে ঘোস্তুয়াসা দিতে পাৰে এই বলে যে, ‘পহেলা বৈৱাহিক  
মঙ্গল শোভায়াস্য বাধ-ভাস্তুক আৱ প্যাচার প্ৰতিমুক্তি মাথায় নিয়ে মিহিল কৰাৰ যথোৎসুক  
খাৱাপ কিছু নেই; বৰং এগুলো তোমাকে দুনিয়াৰ সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শোভা  
তোমার মতন কত মুসলিমই তো এসব উৎসবে যায়, তাদেৱ কি ধৰ্ম চলে দোচাই?’  
নতুন্বা শয়তান আপনাকে বলবে, ‘একজন পৰলাঙ্গীৰ সাথে বসে দু-দণ্ড গৱ কৰলে,  
পাপ হয় না। তুমি তো আৱ তাৰ সাথে অভেতিক কাজে জড়াচ্ছ না। তোমাৰ যদি  
তো এ রকম কোনো অসং অভিপ্ৰায় নেই। তুমি তো তাকে কেৱল বধুই ভাবো  
ছেটিবোনেৰ মতোই দ্যাখো। তাহলে, তাৰ সাথে এহেন সম্পর্ক রাখতে দেব কী?’  
একটু সুখ-দুঃখেৰ কথা বললে, দুজনে কোথাও ঘৃণতে গেলে, হাত ধৰে পাৰ্কে হাতোল  
পাপ হয় না। তুমি তো আৱ তাৰ সাথে অভেতিক কাজে জড়াচ্ছ না। তোমাৰ যদি  
তো এ রকম কোনো অসং অভিপ্ৰায় নেই। তুমি তো তাকে কেৱল বধুই ভাবো  
ছেটিবোনেৰ মতোই দ্যাখো। তাহলে, তাৰ সাথে এহেন সম্পর্ক রাখতে দেব কী?’  
শয়তানেৰ টোপগুলো এমনই। আপনাৰ হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে, আপনাকে আপাত  
বাধ-ভাস্তুক আৱ প্যাচার মূল্তি মাথায় পৰিয়ে আপনাকে দিয়ে মঙ্গল শোভায়াস্য  
কৰাবে। আপনাকে সে পৰলাঙ্গীৰ কাছাকাছি, পাশাপাশি নিয়ে যাবে আপনাৰ  
মনস্তত্ত্বিক অবস্থা বুৱো। এভাৱেই শয়তান মানুষকে পথভৰ্ত কৰে যাৰ ওয়াদা সে

শয়তানেৰ কৃত দ্বিতীয় ওয়াদা হলো—

وَلَا يَنْتَهُمْ

আমি অবশ্যই তাদেৱ মধ্যে কামনা-বাসনা বাঢ়িয়ে দেবো।।।।

খুবই ভালকৰ একটা ওয়াদা। শয়তান বলহে সে মানুৰে মধ্যে কামনা-বাসনা  
বাঢ়িয়ে দেবো। যদি আমোৱা আমাদেৱ প্ৰাতাহিক জীবনেৰ দিকে তাকাই, তাহলে

[।।] সুৰা নিম্ন, আয়ত : ১১৯

আমোৱা অৱৰ বিবায়ে লক্ষ কৰৱ যে, দৈনন্দিন জীবনে কোনো-না-কোনোভাবে  
প্ৰয়োগ আমাদেৱ মধ্যে দুনিয়াৰি কামনা-বাসনা বাঢ়িয়ে দিয়ে তাৰ ওয়াদা পূৰ্ণ কৰে  
হৈ আছে। কিন্তু শয়তানেৰ প্ৰয়োগ আমোৱা এতটাই বিভোৱা আৱ প্ৰয়োচিত যে,  
তাৰ চৰকাঞ্জুলোকে বুকো ওঠৰ জন্য যথেষ্ট সংবিষ্টিকু হাৰিয়ে বসে আছ।

আমি এমন অনেককেই চিনি যাৰা দৰকাৰে ঘূস দিয়ে হালোও চাকৰি কৰতে প্ৰস্তুত।  
লক্ষ লক্ষ টাকা ঘূস দিতে হৈবে জেনেও সেই চাকৰিৰ জন্য তাৰা হা-হুতাশ কৰতে  
থাকে। এই যে, ঘূস দেওয়া-বেওয়াৰ নামে একপক প্ৰতাৱণা কৰে আৱ অনাপন্ধি  
প্ৰতাৱণাৰ অপৰ নেয়া, কেন তাৰা একটা কৰৱে? জিজেস কৰলে তাৰা বলে, এ বৰকম  
চাকৰি মানেই জীবনেৰ একটা পৰম নিষ্ঠিয়তা। একজীবনে যে সুখ দৰকাৰ, তাৰ সৰ্বটাই  
চাকৰি মানেই জীবনেৰ একটা পৰম নিষ্ঠিয়তা। এই যে মোহ, এই যে বাসনা,  
দিতে পাৰে এমন চাকৰি। অৰুৰেখ পঞ্চায়া জীবিকা নিৰ্বাহেৰ এই যে মোহ, এই যে বাসনা,  
দুনিয়াৰ জীবনে দেবল একটু আৱাম আয়োশেৰ জন্য এই যে প্ৰকল্পনা—এটাই হলো  
শয়তানেৰ জীবনে দেবল একটু আৱাম আয়োশেৰ জন্য এই যে প্ৰকল্পনা। আৱ অনেক  
কৰৱে আৱ কৰৱে। সে বুৰিয়েছে, এই জীবনে তালো থাকতে হলে তালো চাকৰি দৰকাৰ।  
শয়তানেৰ জন্য যদি ঘূস দিতে হয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। জীবনে বড়লোক আৱ  
সেই চাকৰিৰ জন্য যদি ঘূস দিতে হয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। জীবনে বড়লোক আৱ  
কৰৱে আৱ কৰৱে। সেটা নিতাত্তই শৌখ।

মানুৰ যথন শয়তানেৰ কাঁদে পড়ে আলাহকে ভুলে যায়, তখন তাৰ কাছে দুনিয়াটাই  
মুখ হয়ে ওঠে। পৰকালেৰ জীবনেৰ কথা তাৰ স্মৃত্যেৰ মানসগঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে  
যাব। সেই স্থান দখল কৰে নেয়া দুনিয়াৰ চাকচিক। সেখানে তালোমদ বিচাৱেৰ  
যাব। এভাৱেই শয়তান আৱ আয়োশ হয়ে ওঠে প্ৰথম বিৰেচনাৰ বিষয়। এভাৱেই শয়তান তাৰ  
বলে আৱাম-আয়োশ হয়ে ওঠে প্ৰথম প্ৰেম কৰতে দিয়ে তাদেৱ  
ঠিকই, কিন্তু আমোৱা টেৱই পাই না যে, দুনিয়াৰ অভিস্থায় প্ৰমণ কৰতে দিয়ে তাদেৱ  
আমোৱা আখিৱাৰতেৰ জীবন থেকে দূৰে ঠেলে নিছিছ।

শহুরে জীবনের যে মা তার সন্তানকে ভোরবেলায় ঘূম থেকে চুলে হারমেলিশি-  
তারা কি কখনো ভাবে যে, এই ক্ষণিকের দুনিয়ার পরে তাদের সামনে গড়ে রয়েছে—  
এক অনন্তকালের জীবন? তারা কি কখনো উপলব্ধি করতে পারেন, এই সন্তানের  
জন্য একদিন আলাহর কাঠগড়ায় তাদের দাঁড়াতে হবে, জবাবদিন করতে হবে—  
সন্তুষ্ট পারেন না। পারেন না কারণ, শ্যাতান দুনিয়ার এক রঙিন শৈমা তাদের  
চমুচুগালে পরিয়ে দিয়েছে। সেই রঙিন চশমায় দুনিয়াটা বজ্জ উপভোগের সেই  
তাতে দুনিয়ার কামনা-বাসনা প্রতিস্থাপন করে রাখে। এভাবেই জিতে যায় শ্যাতান  
হেরে যায় মানুষ। হেরে যাই আমরা।

শ্যাতানের তৃতীয় ওয়াদা ছিল—

لَا مُرْتَهِمْ لَيَبْيَسْنَ آذَانَ الْأَنْعَامِ

এবং আমি তাদের নির্দেশ দেবো, ফলে তারা জৃত-জনোয়ারদের কান  
ছেদন করবে।<sup>[১]</sup>

এই আয়াতটির ব্যাপারে তফসিলগুলোতে বেশ সুন্দর ব্যাখ্যা এসেছে। তফসিলে  
বলা হয়েছে, প্রাক-ইসলামি যুগে প্যাগানদের মধ্যে একটি ভারি আহত সংশ্লিষ্ট চুল  
ছিল। প্যাগানরা জৃত-জনোয়ারদের ধরে, তাদের কান কেটে, বিভিন্ন অঙ্গপ্রতাঞ্জ  
কেটে নিয়ে সেগুলোকে নেতৃপ বানিয়ে ফেলত এবং পরে সেগুলোর পূজা করত। মূলত, ধরে  
বিকৃতিসাধন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। শ্যাতান এমন ব্যাপারকেই উদ্দেশ্য করে  
বলছে, সে মানুষকে দিয়ে ধর্মের বিকৃতি ঘটিয়ে ছাড়বে।

আজ কি আমরা ধর্মকে বিকৃত করছি না? ‘সেকুলারিজম’-এর নামে আমরা কি  
বলছি না, ‘ধর্ম যার যাব, উৎসব সবার?’ অসাম্প্রদায়িকতার নাম ভাঙিয়ে আমরা  
আলাইহি ওয়া সালাম স্পষ্ট করে আমাদের জন্য হারাম করেছেন? পহেলা বৈশাখে

[১] শুবা নিসা, আয়াত : ১১৯

শুধু মানে শত্রু-শত্রু খেলা

কল শেতায়ার মতন ব্যাপারগুলোকে ‘ধর্মের সাথে অসংঘর্ষিক’ ভাবছি।  
নির্বের যা ভালো লাগছে, নিজের খেলাখুশিকে ইচ্ছেমতে ব্যবহার করে  
নিস্ত্রে আমাই আবার ফাতওয়া তালাশ করছি, ‘অমুক জিনিস করা যাবে না,  
ও কৃতান্তে কোথায় বলা আছে?’

শুধু কি তা-ই নতুন নতুন বিদ্যাত চালু করেও ধর্মকে আমরা বিকৃত করে চলছি  
রোজ আলাহ এবং তাঁর রাসূল সালালাই আলাইহি ওয়া সালাম আমাদের জন্য  
নির্ধারণ করেননি, এমনসব কাজ আমরা করি যা প্রকারাত্ত্বে ধর্মকে বিকৃত করা।

শ্যাতান তার চতুর্থ এবং শেষ ওয়াদায় বলেছে—

وَلَمْ يَرْتَهِمْ قَلْبَعِينَ خَلْقَ اللَّهِ

এবং আমি অবশ্যই তাদের নির্দেশ দেবো, ফলে তারা সৃষ্টির বিকৃতিসাধন ঘটবে।<sup>[২]</sup>

শ্যাতানের এই ওয়াদার বাস্তবায়ন আজ আমরা অহরহ দেখতে পাই আমাদের  
সমাজে। বেশ কিছুদিন আগে, কোনো এক দরকারে টিএসপি গিয়েছিলাম। ফেরার  
পথে দাকা বিশ্বিদ্যালয়ের সেক্ট্রাল লাইব্রেরি অতিক্রম করার সময় আমি লম্ব চুল  
এবং সেই চুল খুঁটি বাঁধা একজনকে দেখতে পেলাম। পরনে জিল আর টি-শার্ট।  
ঢাকা শহরের আইটি মার্কেট আধুনিক মেয়েরা এ ধরনের পোশাক পরে বিধায় আমি  
তাকে সে রকম কোনো এক মেয়ে তেবেছিলাম। পরে দেখা গেল, ওটা আসলে  
কোনো মেয়ে ছিল না। মাড়ি-পৌরুষোদাল একজন পুরুষ!

নারীর মতো বেশভূত্যা ধরা শুরু করেছে আমাদের পুরুষের। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিমা  
বিশ্বে এখন খুব হচ্ছাগোলের একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘ট্রাঙ্গেন্ডার’ কাহিনি।  
ছেলেদের যদি নারী হতে মন চায়, তাহলে তারা সার্জেরী করে নারী হয়ে যাবে।  
নারীদের যদি পুরুষ হতে মন চায়, তাহলে তারাও একই কামদায় পুরুষ বনে যাবে।  
আলাহর সৃষ্টির সাথে কত জগন্ত এই মশকরা, ভাবতে পারেন?

নারীরা চুল ছেঁটে হোট করে ফেলছে, পুরুষরা মাথার চুল নারীর মতন সধা করছে।  
নারীরা শার্ট-প্যান্ট গায়ে তুলছে, পুরুষ হাতে-কানে তুলছে বালা আব দৃশ্য। মেয়েরা  
ভুগ্নি-সহ নানানভাবে আলাহর সুচির বিকৃতি ঘটিয়ে চলছে হরহামেশ্বৰী।

শয়তান তার মিশনে সৰ্বেব বিজয়ী। আমাদের দাবার গুটি বানিয়ে সে নিজের কৃষি  
ওয়াদা পূরণে বৰ্ধপরিকর। সে নিজে তো ধৰ্মসপ্রাণ আৰ অভিশপ্ত, তবে সে এক  
ধৰ্ম হতে চায় না, একই অভিশপ্ত থাকতে চায় না। সে চায় আলাহৰ বাধারে  
তাঁৰ রহমত থেকে দূৰে সরিয়ে তাদেৱত অভিশপ্ত আৰ ধৰ্মসপ্রাণ কৰে ছাড়ান।  
তাই আলাহ বলেছেন—

وَنَنْ يَنْجُوزُ الشَّيْطَانُ وَلِمَا مَنْ دُونَ الْأَرْضِ فَقَدْ خَسِرَ حُسْنَارًا مُبِينًا

আৰ আলাহকে বাদ দিয়ে যে শয়তানকে বন্ধু হিশ্বেৰে গ্ৰহণ কৰে, সে  
স্পষ্ট কৃতিগ্রস্ত।

শয়তান আমাদেৱ শত্ৰু, প্ৰকাশ্য শত্ৰু। সে আমাদেৱ সাথে এক মহাযুদ্ধে অবৰ্তৰ্ভু  
আৰ যুদ্ধ মানেই হলো শত্ৰু-শত্ৰু খেলা। সেই খেলায় আমাদেৱ হিততে হবে  
হারাতে হবে শত্ৰুকে। পৰ্যুদ্ধত কৰতে হবে শয়তানেৰ সমন্বয় চক্ৰস্ত। আমাদেৱ  
বাচানোৱ জন্য আলাহ সুবহানাতু ওয়া তাআলা শত্ৰুৰ পৰিকল্পনা আমাদেৱ সমান  
মেলে ধৰেছেন। বলে দিয়েছেন কোন কোন উপায়ে, কোন কোন কৌশলে, কোন  
কোন রঙে, চাঁচে শত্ৰু আমাদেৱ সামনে আসতে পাৰে। এবাৰ আমাদেৱ পালা!! শত্ৰু  
হাত থেকে বাঁচতে আমাদেৱ হতে হবে সংকল্পবৰ্ধ। সৰ্বেতত্ত্বাবে পৰাজিত কৰাত  
হবে তাকে। নয়তো আমৰা হারিয়ে যাব, এক নিক্ষয়কালো অন্ধকারেৰ মাৰে।



## মেঘেৰ ওপোৱ বাঢ়ি

[ক]

নাগৰিক জীবনেৰ ব্যৰ্ততাকে ফাঁকি দিয়ে একান্ত এক টুকুৱো অবসৱে যাওয়া দেহ  
আৰ মনেৰ জন্য খুব দৱকৰি হয়ে উঠেছিল। কোলাহলময় ঢাকাৰ দেয়াল তেল  
কৰে একট নিৰ্বাঙ্গী পৰিৱেশ, নিৰ্মল হাওয়া আৰ সুবৰ্জ প্ৰকৃতিৰ কোলে হারিয়ে  
হৈতে ইচ্ছ কৰিছিল খুব কৰে। কত দিন হয় অৱশ্যে হারাই না। শিখিৱে ভিজাই  
না পা। ফড়িয়োৱ পেছনে ছুটতে ছুটতে টিকানা হারাই না অনেক দিন। দুৱল  
কৈশোৱেৰ আৰুচা সৃতিগুলো মনে পড়লেই কেমন যেন স্থিতিকৃতৰে হয়ে পড়ি।  
আমাদেৱ ঘৃতি উৎসব, লাটিম আৰ কানমাছি খেলোৱ দিনগুলো সময়েৰ সাথে সাথে  
খেঘায়াৰ দেন হারিয়ে গোল।

গাজীপুৰ সাফারী পাৰ্কে যাওয়াৰ জন্য মনস্থিত কৰা হলো। সেখান থেকে হুমানু  
আহমেদেৱ সৃতিবিজড়িত নুহাখপঞ্জী। আমৰা চার বন্ধু মিলে রওনা কৰলাম।  
নাগৰিক কোলাহলকে পেছনে রেখে এক টুকুৱো অবসৱ পালে ছুটে চলল আমাদেৱ  
মেহগুলো। পেছনে রেখে যাইছি একবৰ্ষী বান্দতা, ছুটোছুটি, নিৰানন্দ, নিষ্প্রাণ  
সহজা। আজ আমাদেৱ ছুটি।

দিনেৰ বেশিৱৰতাগ সময়ই কৈটে গোল সাফারী পাৰ্কেৰ হাতি, ঘোড়া, বায়, সিংহ,  
মুঘু, কুমিৰ, মাছ, প্ৰজাপতি আৰ ধনেশ পাবিৰ সাথে। আসবৱে আগে আগে  
পাৰ্ক ছেড়ে বেৰিয়ে আসি। সাতপঞ্চ না তেবে একটা সিএনজিতে চেপে সোজা

## বেলা ঝুরাবার আগে

চলে এলাম নুহাশপল্লীতে। নুহাশপল্লীর গেইটের ক্ষেত্রে থাকা ছোট ফস্তিলীয়ার চুকে আসরের জামাআতে দাঢ়িয়ে গেলাম। সালাত খেয়ে করে সবার আগে নেখেতে গেলাম হুমায়ুন আহমেদের কবর।

শ্রেষ্ঠ পাথরে আছাদিত কবরটাতে শুয়ে আছেন বাংলা সাহিত্যের একজন বিদ্বন্দ্বিত নুহাশপল্লীর লিচু তলাতেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তিনটে শিশু অভিভিতে লিচু গাছ তার কবরটাকে ঘিরে আছে। এই লিচুতলা হিল হুমায়ুন আহমেদের পিয়াজাগুলোর একটি। তার কিছু কিছু রচনায় সেটার উপরে পাওয়া যায়। কবরটার দিকে অগলক তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। একটা মানুষ। যশ-খাতি পেয়েছে। বইমেলায় তার বই কেনার জন্যে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ত। এজন মানুষের একজীবনে যা যা পাওয়ার থাকে, সম্ভবত তার সবচাই হুমায়ুন আহমেদ আকাশসমান যশ-খাতি-কীর্তি রেখে তাকে চলে যেতে হলো। পাকা ইয়ারত, দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টি—সবকিছু হেঢেছুড়ে মাটির বিছানাকে সজীব করতে হলো। মিথে হেলো মাটির সাথে। মাটির সাথে মানুষের সে কী এক গভীর মতান্তি!

আজও নুহাশপল্লীতে জোছনা নামে। আজও নুহাশপল্লীর ঘাস শিশিরে ডিজে ওঠে। আজও ‘বৃষ্টিবিলাস’ থেকে শোনা যায় বৃষ্টির রিমনিম রিমনিম শব্দ। কিছু, এই জোছনা, এই শিশির, শান-বাঁধানো পুরুর ঘাট, ঝুম বৃষ্টির আওয়াজ—সবকিছু থাকলেও হুমায়ুন নেই। হুমায়ুন এখন অন্য জগতের বাসিন্দা। জগতের সকল খ্যাত-অখ্যাত জনে এটই ঝুঁ সত্য যে, প্রথৰীতে আগমন আর বিদয়ের পথতি সবার জন্যে একই বকম।

হুমায়ুন আহমেদের কবর দর্শন শেষে চলে এলাম তার বৃষ্টিবিলাসে। টিনের চালা ভেদ করে বৃষ্টির শব্দ ভেতরে চুক্তে পারে না। তাই এই ব্যবস্থা। জয়গায় জয়গায় গাছ, গাছের মগডালে টোচালা গাছের দেখে অনুমান করা যায় মানুষ হিশেবে কটো তখন সৃষ্টি তুবে গেছে। চারদিক থেকে ঝেকে আসতে শুরু করেছে অর্থকার। শ্রেষ্ঠ পাথর দিয়ে বাঁধানো এই দিঘির ঘাটের অয়স্ত আর অবহেলার ছাপ থেকেই হুমায়ুন

## মেছের ওপার বাঢ়ি

হালের অনুপস্থিতি টের পাওয়া যায়। দিঘির মাঝখানে দীপের মতো একটা জল। গাঢ় থেকে সাকে পার হয়ে যেতে হয় ওখানে। আমরা সেখানে গেলাম। এই কবর যেটি চিঠিতের ঘাসে বসে পড়লাম আনমনে। সবাই চুপচাপ। চারদিকে এক গাছ হুমায়ুন নীরবতা। তার আর ভাবনার জন্যে এ রকম নীরবতা খুব উপকারী।

দিঘির দ্রশ্য আরও দুটি দেলাম। সম্ভবত বাচ্চাদের জন্মেই বানানো। ওদিকে গাজীরা জন্মে আরও দুটি দেলাম। তার আগে একজন চু মারলাম ‘ভূতের বাড়িতে’। গাজীরা জন্মে আমরা সবাই খুব চমকে উঠলাম। উঁই, ওটা আসলে ভূত হ্যাতেই ভূত দেখে আমরা সবাই খুব চমকে উঠলাম। উঁই, ওটা আসলে ভূত দেখে বিনা একজন দেখারটোকার। অর্থকার ঘরে ঘাপটি মেরে ছিল। আমাদের দেখে মহাসেই বলল, ‘কী খুঁজছেন?’

‘খুঁজ না। আসলে, এটা নাকি ভূতের বাড়ি, তাই একটু কৌতুহল থেকে চু মারলাম।

ওজা, এখানে কি আসলেই ভূত আছে?’

গাজীরা বেশ চুরিত উত্তর দিল। বলল, ‘নাহ। এটা আসলে আমাদের সারের কলন হিসেবে হুমায়ুন আহমেদের কবর। তার আসলে আমাদের সারের কলন হিসেবে হুমায়ুন আহমেদের কবর। কথাগুলো

হুমায়ুন আহমেদের কবরের ওপরে শ্রেষ্ঠ পাথরে কিছু কথা লেখা ছিল। কথাগুলো তার ‘কঠপেশিল’ বই থেকে নেওয়া।

‘কঠপেশিল’ বই থেকে নেওয়া।

‘কঠপেশিল’ বই থেকে নেওয়া।

গাজীরা দেখেছি নুহাশপল্লীর সন্তুষ্যের মধ্যে ধৰ্মবে শ্রেষ্ঠ পাথরের কবর। তার গায়ে লেখা—চৰণ ধৰিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না নিয়ো না সরায়ো।’

সত্যি সত্যিই হুমায়ুন আহমেদ নুহাশপল্লীর সন্তুষ্য প্রকৃতির মাঝে, শ্রেষ্ঠ পাথরে আছাদিত কবরে চিরনিম্নায় শায়িত হতে পেরেছেন। সুনিধার অনেক সাধ-আহমেদের মধ্যে তার শেষ আঙুষ্ঠাটা পূরণ হয়েছে। একটি আয়তে পড়েছিলাম সম্ভবত,

[৪]

## বেলা ঝুরাবার আগে

দুনিয়ার জীবনে কেউ যদি কোনো জিনিস চায়, কখনো কখনো তাকে সেই জিনিস কানায় কানায় পূর্ণ করে দেওয়া হয়। ইমামুন আহমেদ সম্ভবত সেই পূর্ণতা পাওয়া লোকদের একজন।

[গ]

নৃহশপলীতে শিয়ে আমার দুটো উপলব্ধি হয়েছে। প্রথমত, ইমামুন আহমেদের কথাটা আমাকে খুব ভাবিয়েছে। একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় একজন লেখক এখন মাঝি সাথে মিশে আছেন—এই খুব সতীটা বারবার আমাকে আমার শেষ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। নাম, যশ, খাতি কোনো কিছুই আমাদের মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে না। মৃত্যুই আমাদের জীবনের নির্মাণ নিয়ন্ত। ‘জন্মলে মরিতে হবে’—এটাই জীবনের সবচেয়ে কঠিন সত্য। কবরের পাশে দাঁড়ালে অস্ত্র নরম হয়। আধিগ্রামের কথা মনে পড়ে। নিজের শেষ গন্তব্যস্থলের ভাবনায় আচ্ছা হয়ে পড়ে মন। এজনেই কানুন সামাজাহু আলাইহি ওয়া সালাম আমাদের কবরস্থান জিয়ারাত করতে বলেছেন।<sup>[১]</sup>

নৃহশপলীর বিত্তীয় যে ব্যাপারটা আমাকে খুব বিস্মিত করেছে তা হলো—দুনিয়ার জীবনকে আপন আর উপভোগ করার জন্য ইমামুন আহমেদের একান্তিক চেষ্টা-তাবিরা ছোট আয়তনের নৃহশপলীকে তিনি বানাতে চেয়েছিলেন এক টুকরো সূর্য। সেই সূর্যে কৃতি হন আছে, নিষি আছে। মানুষের বানানো বরণ, কৃতিম অরণ্য-সহ জীবন উপভোগের নামান উপাদান তাতে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই উপাদানগুলোতে তিনি সূর্য খুঁজতে এবং পূর্ণিমার অপর্যুপ জোছনা—সবকিছু নিয়েই তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

সাধারণ যে-কেউ প্রথম দেখাতেই তার এই ইচ্ছেটার প্রেমে পড়ে যাবে। মনে হবে, ইশ! আমার যদি ইমামুন আহমেদের মতো অনেক অনেক টাকা হতো, আমিও দূরে কোথাও, নির্জন অরণ্যের পাশে দিয়ে এ রকম একটা নৃহশপলী বানাতাম। সেখানে থাকত কেবল সুখ আর সুখ! সেখানে একটা ‘নিষি সীলাবতী’ হবে, একটা

[১] এটি একটি আধাতের অংশবিশেষ। আমাতেই হলো—

যারা দুনিয়ার জীবন ও চারিকা চায়, আমি মুমিয়াতেই আমের কৃতকর্ম পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দিই, কোনো কৃতি করা হ্য না। [সুরা হুদ, আয়ত: ১৫]

[২] সুলানু অবি সাউদ: ৩২৩৭, হাইকোষ প্রদর্শনোল

## মেঘের ওপার বাঢ়ি

‘পূর্ণিমা’ আর একটা ‘ভূতের বাঢ়ি’ হবে। পূর্ণিমার জোছনাতে হৈ হৈ করাবে সেই নৃহশপলীর মাঝেটা। বর্ষার বুম বৃক্ষিতে ভেজা কাবের মতন হয়ে উঠবে চারপাশ।

এ কুম একটা নৃহশপলী বানাতে হলে কী পরিমাণ টাকা লাগবে? নিশ্চয় অনেক জনক টাকা, তাই না? আছে, যদি আপনাকে বলা হয় একদিন আপনি সত্ত্ব পার্তি নৃহশপলীর চেয়েও হাজার কোটি গুণ সুন্দর, অপরূপ, অকল্পনীয়, অভাবনীয় হ্রাসের মালিক হবেন, বিশ্বাস করবেন? হঠা আর পাথর দিয়ে নয়, সেই প্রাসাদ হ্রাসের মালিক হৈবে। দৃষ্টিসূচ যতদূর বিস্তৃত হবে, ততদূর আলোকিত হবে হয়ে মৃণ-মৃণের বালকনিতে। প্রাসাদের নিচে থাকবে ঘরনা। সেই ঘরনার পরে সেই মধি-মন্ত্রের বালকনিতে। প্রাসাদের নিচে থাকবে অনিল্য সুন্দর ফুলের বাগান। কলকল ধনি আপনি শুনতে পাবেন। সামনে থাকবে অনিল্য সুন্দর ফুলের বাগান। সেই ফুলগুলো এর আগে আপনি আর কথনো দেখেননি। ফুলের গন্ধে ম-ম করবে আপনার চারিপাশ। আপনি চাইলেই সেখানে জোছনা নামবে। বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেবে আপনাকে। চাইলেই কেকিলের গান, নদীর কলতান আর অরাণ্যের সবুজ—সবকিছুই আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। অনন্তকালের জন্য আপনি হয়ে যাবেন এই অপূর্ব সুন্দর প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের অস্ত্রে লালিত সুপ্ত। এ রকম একটি অনিল্য সুন্দর প্রাসাদের সৃপ্ত দেখেছিলেন ফিরাউনের স্ত্রী আসিরা আলাইহাস সালাম। তিনি আমাহর কাছে দুআ করে বলেছিলেন—

رَبِّ ابْنِي لَبِ عَنْدَكَ لَبِّنَا فِي الْجَنَّةِ

হে আমার প্রতিপালক, জামাতে আপনার সরিকটে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।<sup>[৩]</sup>

[৩] সুরা তাহরিম, আয়ত: ১১

কত অপূর্ব সুন্দর এই দুআ! এই দুআতে তিনি বলেননি, ‘হে আমার মালিক! ফিরাউনের প্রাসাদে এটা-ওটা আছে, জামাতেও আমার জন্য সেগুলোর বকল করে দিন। ফিরাউনের প্রাসাদ দামি পাথর দিয়ে বানানো জামাতেও এই পাথর দিয়ে তৈরি একটি প্রাসাদ আমি চাই।’ তিনি সে রকম কিছুই চাননি। কিন্তু কেবল আজ্ঞাহর কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। তাই তো বলেছেন, ‘মালিক! আপনার সমিকটে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।’ আজ্ঞাহর কাছাকাছি থাকতে পারে সৌভাগ্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। কিছু না।

জামাতে বাড়ি বানাতে হলে কিন্তু লাখ লাখ টাকার দরকার নেই। মৌলিক ধরণে  
জোগাড় করা রাজউকের সার্টিফিকেটও আপনার লাগবে না। এই বাড়ি নির্মাণের জন্ম  
আপনাকে নিতে হবে না মিথ্যার আশ্বয়। অনেক হক নষ্ট করে, অনেকে খোল  
দিয়ে নিজের ইমারত তৈরির যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের চাইপাশে, আপনাকে  
সেই প্রতিযোগিতাতেও নামতে হবে না। কেবল দরকার একটুখানি চাই। এছু  
সদিছু আর একটু আঙ্গুরিকতা। জামাতে বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে তো রাসূল সানামের  
আলাইহি ওয়া সালাম আমাদের শিরিয়ে দিয়েছেন। সেই ক্ষেত্রে অবসর করে  
আমরা চাইলেই অনায়েশে জামাতের অনিন্দ্য সম্পর্ক প্রাসাদের মাঝে হচ্ছে পরি।

আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াকুত সালাত ফরয় করা হয়েছে। ফজর, মোহর, আসর, মাঝিবি  
এবং ইশা। এই ওয়াকুতগুলোতে ফরয় সালাতের বাইরে সাধারণত আমরা আরও কিছি  
সালাত পড়ে থাকি। সেগুলোকে বলা হয় সুন্নাত এবং নফল সালাত। আজাহর রাসূল  
সালামাতু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১২ রাকাতে সুন্নাত  
আদায় করবে, আরাহত তাওলা জামাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন। সেই  
১২ রাকাতে সুন্না�তগুলো হলো—ফজর সালাতের পূর্বে দুই রাকাতে, যোহরের  
আগে চার রাকাতে এবং পরে দুই রাকাতে, মাগিবিরের পরে দুই রাকাতে এবং  
ইশার পরে দুই রাকাত। আমরা যদি নিয়মিত এবং যতক্ষের সাথে এই সালাতগুলো  
আদায় করি, তাহলে জামাতে একটি বাড়ি পাওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন সুয়ে আলাহুর  
রাসূল সালামাতু আলাইহি ওয়া সালাম। কত সহজ, তাই না? লাখ লাখ টকা লাগে  
কি? লাগছে কেনো পরিশীলন কিংবা নিতে হচ্ছে কেনো অসম্ভব ক্ষমতা?

ফরম সালাতের বাইরের এই ১২ রাকআত শুল্ক সালাত আদায় করে জমাতে মনোরম একটি বাড়ি নিশ্চিত করার এই প্রতিযোগিতা আমাদের সালাফে-সালিহিনের মধ্যে খুব দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। এই ১২ রাকআত আদায় করার প্রয়োজন কী

‘বেগুনি গাঢ়ি পাওয়া যাবে, এই হাদিস নববির সামাজিক আলাইহি ওয়া সামামের  
কথাক সম্পর্কে শুনেন ত্বৰ্য হাবিবা রায়িয়াজ্জুল্লাহু আনহা। এরপর, তিনি বলেন,  
‘আম থেকে আমি এই হাদিস শুনেছি, সেদিন থেকে জীবনে আর  
সালাত ছেড়ে দিবিনি।’

‘ଯେତେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଥେବେ  
କେବଳିରେ ଜୀବ ଆମି ଏହି ୧୨ ରାଜକାତ ସାଲାତ ହେବେ  
ଯେତେ ଶିଖିଲା ମୁଁ ଥେବେ ରାଜ୍ୟାଧ୍ୟାମ୍ଭ ଆନନ୍ଦାର କାହା ଥେକେ ଶୁଣେହେନ ତାର ଭାଇ ଆନନ୍ଦାଶ  
ନିବାଲେନ, ‘ଯେଦିନ ଉଚ୍ଚ ଶାକିବାର ମୁଁ ଥେବେ ଏହି ହାଦିସ ଆମି ଶୁଣେଛି,  
ଏହି ହାଦିସ ଆମି ଶୁଣେଛି’

ପରିମାଣକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିନି ସବେଳେ, ଯେତେ ଦେଲିନ ଥାଏ ଜୀବନ ଆର କଥନେହି ଆମି ଏହି ୧୨ ରାକ୍ତାତ୍ମତ ସାଲାତ ହେବେ ।  
ଯଦିମାତ୍ର ବୀରିଆଜ୍ଞାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁ ଥେବେ ଏହି ହାଦିସ ଶୁନେଛିଲେନ ଆମର ଇବନ୍ ଆଉସ୍‌ଟାର୍କିଯାଇ ତିନି ସବେଳେ, ‘ଯେଦିନ ଆମି ଆମି ଅନବସାର ମୁହଁ ଏହି ହାଦିସ ଶୁନେଛି, ସେଦିନ  
ଏହି ପରିମାଣକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥନେହି ଆମି ଏହି ୧୨ ରାକ୍ତାତ୍ମତ ସାଲାତ ହେବେ ନହିଁ’।

ଯାହିମାଝାହ ତେଣୁ ଥିଲା  
ଥେକେ ଜୀବନ ଆର କୋନେଦିନ ଅମି ଏହି ୧୨ ରାଜାତ ପାଇଁ  
ଆମର ଇବନ ଆଉଟ୍ ରାହିମାଝାହ ଥେକେ ଏହି ହାଦିସ ଶୁଣେନ ନୁମାନ ଇବନୁ ସାଲିମ  
ରାହିମାଝାହ । ତିନି ବେଳେ, ‘ମେଦିନ ଆମର ଇବନୁ ଆଉଟ୍ ରାହିମାଝାହର ମୁଖ ଥେକେ  
ଆମ ଏହି ହାଦିସ ଶୁଣେଇ, ସେମନ ଥେକେ ଆର କଥନୋଇ ଅମି ଏହି ୧୨ ରାଜାତ  
ମାତ୍ର ଛାଡ଼େ ନିହିନ୍ତି’ ।

একবার গভীরভাবে ভাবা যাক তারা কতটা নিষ্ঠাবান ছিলেন। কতটা তহবিল  
ছিলেন নিজেদের পুরো পাঞ্চ ভারি করার প্রতিযোগিতায়। নবজির মুখ থেকে  
উম্ম হাবিবা রাহিমাজ্জাহ আনন্দ এই হাসিস শোনার পর থেকে আস্তৃত তার ওপর  
আমল করেছেন। তার কাছ থেকে যিনি শুনেছেন তিনি এবং তার কাছ থেকে  
যিনি শুনেছেন তিনি, এভাবে পরম্পরায় যাদের পর্যন্তই এই হাসিস পৌছেছে, তারা  
সকলেই সেটাকে দৃঢ় অ্যাত্মে, গভীর অনুরূপ এবং জান্মাতের অন্তর্মাণ প্রাপ্তির অশ্বায়  
নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। জান্মাতে একটি বাত্তি লাভের এই সুবর্ণ  
সূযোগ তারা হেলায় নষ্ট করেননি। কখনো অল্পতায়, বস্তুতর অভ্যাসে হ্যাতে  
অবহেলার দরুন এই আমল থেকে তারা বিরত হোননি। আমাদের অনেকেই হ্যাতে  
এই হাসিসটি আগে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু কখনো কি একটিভাবে তৎপর হয়েছি  
উম্ম হাবিবুর মতো? কিবলি আনন্দসা রাহিমাজ্জাহ আনন্দের মতো? অথবা, আমর  
ইবনু আউস রাহিমাজ্জাহ আর নুমান ইবনু সালিম রাহিমাজ্জাহের মতো? হ্যাতে

[v] সঞ্চিত মসলিন : ৭৫৮

আমরা হইনি কিংবা হতে পারিনি। তবে, দুঃখের কোনো কারণ নেই। এইজনের হয়তো পারিনি, কিন্তু আজ তো আমরা আবার নতুন করে শুভাম এই হলিঙ্গ নতুন করে জানলাম এর মাহাজ্ঞা। আজ থেকে কি তবে নতুন করে শুভ করা যাবে না? একেবারে শুভ থেকে? টলটলে জলের, বলকল বারগর সৃষ্টি, শুভ, সময় সেই অনস্ত তাসীম জানাতে একটি বাড়ির জন্য আজ থেকে আমরা কি এই হাসিমখানের জীবনের সাথে জড়িয়ে নিতে পারি না?

আবার ধরুন, কোনো এক বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। কথা কাটাকাটি, বাড়িবাড়ি শুভ হলো। আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, আপনি যা বলছেন বা বলতে চাইছেন তা একদম ঠিক ও নির্ভুল। আপনদিকে আপনার বন্ধু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া? নাহ। নবিজি সালালাই আলাইহি ওয়া সালাম এভাবে বলেননি। এমন মুহূর্তে তিনি আপনাকে থেমে যেতে বলেছেন। তাই, থেমে যান। চূপ করে এবং ভাতৃত নষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। এই যে আপনি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও চূপ করে গেলেন, এর বিপরীতে আপনার জন্য কী পুরস্কার অপেক্ষা করছে জানেন? রাসূল সালালাই আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, ‘আমি সেই বাস্তির জন্য জানাতের পাস্তে একটি বাড়ির প্রতিশ্রুতি দিছি, যে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তর্কে লিপ্ত হয় না।’<sup>১)</sup>

জানাতে আস্ত একটি বাড়ি লাভের কর্ত সহজ উপায়, তাই না? কেবল নিজে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তর্কে লিপ্ত না হলেই জানাতে আমরা পেয়ে যাব আস্ত একটা বাড়ি। সেই বাড়িটা হবে সুর্ধ-রোপ্য দিয়ে তৈরি। মণি-মুক্তো খচিত সেই বাড়িতে থাকবে না বিন্দু পরিমাণ খুঁত।

এ ছাড়াও নবিজি সালালাই আলাইহি ওয়া সালামের হাসিম থেকে আমরা জানতে পারি—যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে কেবল আজ্ঞাহর সত্ত্বিতির জন্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করবে, যেক সেটা চড়ুই পাথির বাসার সমান, আজ্ঞাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা তার জন্য জানাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন।<sup>২)</sup> আমাদের আশপাশে

মেঘের ওপার বাঢ়ি

বেল কর্ত প্রাণ আছে যেখানে হয়তো একটা মসজিদ নেই। মসজিদের অভাবে কত মুসলিম জনাবাত সকারে সালাত আদায় করতে পারে না। দেশের উত্তরাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি জাগাগামুলোতে এ রকম প্রচুর প্রাম আছে। আমরা উদ্যোগ নিয়ে এমন জাগাগামুলোতে মসজিদ নির্মাণ করতে পারি। একা যদি না পারি, তাহলে জরুরতে মিল করাতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য হবে কেবল আজ্ঞাহর সন্তুষ্টি। বাস। বিনিয়োগ জানাতে একটি সুউচ্চ, মনেরম সুন্দর অট্টালিকা!

পুরোয় একটা নৃহাশপুরী বানানোর জন্য আমাদের কর্ত কাঠখড়ই-না পোড়াতে হয়। সেই টাকার জন্য বিসর্জন দিতে হয় নিজেদের লাখ লাখ টাকা উপর্যুক্ত করতে হয়। সেই টাকার জন্য বিসর্জন দিতে হয় নৃহাশপুরী তৈরি হয়, চুপ করেই আমরা জীবন-চীবন। এবপর ধীরে ধীরে যখন সেই নৃহাশপুরীর মাঠে শুয়ে জোছনা উপভোগ করা হয় না। নাম হাই। খুব দেশিদিন সেই নৃহাশপুরীর মাঠে শুয়ে জোছনা উপভোগ করা হয় না। কাটো শ্রাবণ বর্ষার জন্মেই-বা আর গা ভেজাতে পারি আমরা? সেই দিনি লীলাবতী, হৈরি বৃষ্টিবিহুস আর সেই ভূতের বাড়ি। সবকিছু পেছনে ফেলে আমাদের পাড়ি জমাতে হয় অনন্তের পথে। যে অনন্ত জীবনের পথে আমরা পা বাড়াই। সেই জীবনের জন মেঘের ওপারে অধীম একটা বাড়ি বুকিং দিয়ে রাখতে ক্ষতি কী, বলুন?

—৩৩৩—

আমি হব সকাল বেলার পাখি



## আমি হব সকাল বেলার পাখি

[ক]

আমাদের শৈশবের সাথে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কাজী নজরুল ইসলামের 'আমি হব সকাল বেলার পাখি' কবিতাটি। 'সূর্য মামা জাগার আগে উঠে আমি জাগার আগে জেগে ওঠার সাথে যে একটা নৈসর্গিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে, সেটা বুঝে সাদিকের সময়। পৃথিবীর প্রতিতম মুহূর্ত। শাস্তি-সঙ্গীব, নির্ভর-নির্বল্পুষ্ম মুহূর্তেই আমরা ক'জন হতে পারি সুবহে সাদিকের প্রমর? আমাদের রাতগুলো কেটে যাব চেতনাহীনতায় সকাল পার হয়ে দুপুর গড়ায়। আমরা না হতে পারি নজরুলের সকাল বেলার পাখি, না হয়ে উঠতে পারি সুবহে সাদিকের গুঞ্জরিত প্রমর।

মুসলিম হিশেবে আমাদের নিতাদিনকার ব্যর্থতা শুরু হয় ফজর থেকে। ফজরের সালাতে শামিল হতে না পারার অর্থই হলো দিনের শুরুটা হয় শয়তানের কাছে পরাজিতের মধ্য দিয়ে। 'পরাজয়' শব্দটা আমাদের কাছে অতীব অপছন্দের! আমরা কোনো উপলক্ষ্যেই আমরা পরাজিত হতে পাই নাই। বহমান জীবনের স্তোত্রে কোথাও কোনো ছন্দপতন হোক—ব্যাপারটাই আমাদের কাছে অপ্রত্যাশার। কিন্তু

দিনের পর দিন আমরা যে শয়তানের কাছে পরাজিত হচ্ছি, হেরে যাচ্ছি, হেরে লক্ষ্যান্তর হচ্ছি তা নিয়ে আমাদের কোনো ভাবান্তর নেই। নেই কোনো চিন্তার সময়। যেন আমরা শয়তানের কাছে পরাজিত হওয়ার জন্যই দুনিয়ায় এসেছি। অর্থে শয়তান অভিশঙ্গ হওয়ার অন্তর্ম কারণ—মানুষ হিশেবে আমাদের যোগাতাকে জীবনের ব্যাবা, আর আমরা আশৰাহুল মাখলুকাত! সৃষ্টির সেরা জীব। তথাপি জীবনের পদে পদে শয়তানের কাছে আমাদের নির্লজ্জ পরাজয় বরণ করতে হয়।

আরবিতে খুব চমৎকার একটি কথা আছে। বলা হয়, 'ফজর হলো শয়তানের বিষ্ণুর মুমিনের প্রথম বিজয়।' সত্যিই তা-ই। ফজরের সালাতের জন্যে আরামের বিজ্ঞা হচ্ছে যে আসলেই যুবেজয়ের সমান। কট্টের একটা কাজ। তবে কট্টা মুনাফিকদের জন্য। নবিজি সালামাই আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর এবং ইশার সালাতের চেয়ে কট্টকর আর কিছুই নেই।'<sup>[১]</sup>

নবিজির দেওয়া মুনাফিক তকমা যার গায়ে লেগে যায়, তার আথিরাতে কেমন দৈনন্দিন হতে পারে? আথিরাতে সে কট্টা সেউলিয়া হবে সেটা কি অন্যের নয়? শাহীখ বদর বিন নাদের আল-মিশারি বলেছেন, 'আপনি যদি ফজরের সালাতের জন্য যুব কেকে জাগতে না পারেন, তাহলে নিজের জীবনের দিকে তাকান এবং জন্ম যুব কেকে জাগতে না পারেন, তাহলে নিজের জীবনাত্মক ওয়া তাআলা ফজর জন্ম নিজেকে সংশোধন করুন, কেবল আলাই সুবহনাই ওয়া তাআলা ফজর সালাতের জন্য কেবল তার পিয় বান্দাদেরকেই জাগ্রত করান। ঠিক এজনেই মুনাফিকদের জন্য ফজরের সালাত এত কঠিন!'

আমরা ফজরে জাগতে পারি না। কিন্তু কথনে কি একবার নিজের জীবনের দিকে আকিয়েছি গভীরভাবে? কখনো কি তেমেরি কেন আমি ফজরে উঠতে পারি না? আলাইহ যে কেন ফজরে মুাজিনের সুমধুর সুর আমার কানে এমন লাগে না? আলাইহ যে প্রিয় বান্দাৰা সুবহে সাদিকের প্রায়ান্বকার ভেদ করে মুনাফিকদের দিকে হৈট যাব, আমি কেন তাদের দলভুক্ত হতে পারি না? আমার কেন সে পাপ যা আমাকে হতে দেয় না ফজরের পাখি?

ফজরের সালাতের গুরুত্ব আমাদের মুমিন-জীবনে অপরিসীম। নবিজির আরেকটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি—তিনি বলেছেন, 'মানুষেরা যদি ফজর এবং

[১] সহিত বুখারি: ৬৫৬; সহিত মু

ইশার সালাতের গুরুত্ব বুবাতে পারত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলোও ফজল  
আর ইশার সালাতে উপস্থিত হতো।’<sup>১)</sup>

আচ্ছা, যদি বলা হয় যে, আপনাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হবে, বিনিয়ো  
হবেন? আমার ধারণা আপনি রাজি হবেন না। অথচ নিষিদ্ধ বলছেন, যদি আমরা  
ফজর সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারতাম, যদি বুবাতে পারতাম যে কষ্টটা  
চলে আসতাম মসজিদে। ফজর আর ইশার সালাত কষ্টটা গুরুত্ব বহন করবেন নিরিষ্টি  
এমন উপমা ব্যবহার করতে পারেন, তাবুন তো!

আজাহ সুবহানাল্লো তাআলা যখন কোনো কিছু নিয়ে শপথ করেন, তখন কুবতে  
হবে সেই জিনিসটা সাধারণ কোনো জিনিস নয়। আপনি কি জানেন ফজরের সব নিয়ে  
আজাহ সুবহানাল্লো তাআলা কুরআনে শপথ করেছেন? এমনকি ‘ফজর’ নামে  
কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সুরা পর্যন্ত বিদ্যমান। আজাহ বলছেন, ‘শপথ সুবহে সাদিকের।’<sup>২)</sup>  
সেই সুবহে সাদিক যখন ফজরের ওয়াক্ত হয়। সেই সময়ের শপথ আজাহ সুবহানাল্লো তা  
তাআলা করছেন, যখন আপনি-আমি কহলের নিচে আরামের ঘুমে বিভোর।

অফিসের কাজের জন্য আমরা ভোরে জাগতে পারি। ইন্টিভিউস্টির পরীক্ষার জন্য  
আমরা সকাল সকাল জেগে উঠতে পারি। বাস যাতে মিস না হয়, ট্রেন যাতে  
আমাদের রেখে চলে না যায়, সেজন্মে আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘুম থেকে  
জেগে প্রস্তুত হতে পারি। কিন্তু হায়! যে অন্ত সময়ের পানে আমাদের যাতা করতে  
হবে, সেই যাত্রার প্রস্তুতির জন্য সুবহে সাদিকের সময়ে জেগে উঠে পনেরোটা  
মিনিট খরচ করতে আমাদের শরীর কুলোয় না। মন সায় দেয় না। আমরা চাকুরির  
প্রয়োগে চাই, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল চাই, জীবনে সফল হতে চাই। কিন্তু যিনি  
এসব দানের মালিক, যার কাছে পুরিবীর সমস্ত সম্মান, প্রচুর আর সফলতার  
ভাভার, তার কাছে চাওয়ার জন্য আমরা বিহুনা ছাড়তে রাজি নই।

[১] সহিত বৃক্ষারি: ৫৯০; সহিত মুসলিম: ৪৩৭

[২] সুরা ফাজর, আয়াত: ১

ফজেলুল্লাহ তোতাপাখির মতন পড়েছি, ‘Early to bed and early to rise,  
makes a man healthy, wealthy and wise’. এই কবিতার সাথে বহু আগে  
কো দর্বিজিল এই হাদিসের কোনো মিল পান কি না দেখুন তো। তিনি বলেছেন,  
‘বে যত্তি ফজর সালাত পড়ল, সে আজাহর জিন্মায় চলে গেল।’<sup>৩)</sup> আজাহর জিন্মায়  
বাস্তবে ফজর সালাত পড়ল, সে আজাহর জিন্মায় চলে গেল থেকে শুরু করে সবকিছুর  
বাস্তব মানে সুবৃত্ত পারছেন? আপনার ঈমান-আমল থেকে শুরু করে সবকিছুর  
যে তা, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের সবচেয়ে টোকশ বাহিনী দিয়ে আমাদের  
নিরাপত্তা দেওয়া হবে, ব্যাপারটা কেমন দেখাবে বলুন তো? নিচয় খুব চমৎকার,  
চাই না? আপনি তখন নিজেকে দুবিয়ার অন্যতম সেরা সেলিব্রিটি ভাববেন।  
আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে টোকশ সৈন্যের দল—এটা ভাবতেই  
আপনি আনন্দে আজাহার হয়ে যাবেন। তাহলে একবার ভাবুন, আপনাকে যদি সুয়ে  
আজাহ সুবহানাল্লো তাআলা নিরাপত্তা দেন, আপনার মাথার ওপর সমস্ত দিন  
গুরি আজাহ নিরাপত্তার চাদর টানানো থাকে—কেমন হবে সেই নিরাপত্তা বেট্টো?  
সেই নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে আপনার ক্ষতি করে এমন সাথে আছে কারও?

আজাহ রচাইতে উন্নত নিরাপত্তা আর কে দিতে পারে, বলুন?  
আজ্ঞা, রামাদান মাসের পরে ঠিক কর্ত বাত আপনি তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য ঘুম  
থেকে জেগেছেন? কর্ত বাত আপনি জায়নামাজে দাঁড়িয়ে আজাহার কাছে কল্যাণ  
প্রার্থনা করেছেন? সন্তুষ্ট আমাদের মধ্য থেকে খুব কমসম্মত কোকেকেই পাওয়া  
যাবে যারা রামাদানের পরে তাহাজ্জুদ আদায় করেছে। নিয়মিত না হলেও অনিয়মিত।  
যাবে যারা রামাদানের পরে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য না জাগতে পারলে আমরা রাতভর  
কারণে তাহাজ্জুদ পড়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা জানি কি, রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের  
জন্য না জাগতে পারলেও এমন একটা কাজ আছে যা করতে পারলে আমরা রাতভর  
নমাজ সালাত অর্ধাং তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের সমান সাওয়াব পেতে পারি? এক  
ঘণ্টা কিংবা দুই ঘণ্টা নয়। সারা রাত জায়নামায়ে দাঁড়িয়ে নমাজ সালাত আদায় করলে  
যে পরিমাণ সাওয়াব আপনি পাবেন, এই কাজটি করলে ঠিক একই পরিমাণ সাওয়াব  
আপনার আমলনামাতে ঘুষ্ট হয়ে যাবে। তাহাজ্জুদের জন্য জাগলে আপনি হয়তো  
দুই রাকআত, চার কিংবা হয় রাকআত সালাত পড়েন। সারা রাত তো আর সালাত  
আদায় করেন না। কিন্তু এমন একটা কাজ আছে যা করলে আপনি সারা রাত নফল

সালাত আদায়ের সাওয়ার পেয়ে যাবেন। চমৎকার না ব্যাপারটা! নিশ্চ জন্মে বলেছেন, ‘যে বাস্তি ইশার সালাত জামাআতে আদায় করল, সে যেন আর্থ রাত জেগে সালাত আদায় করল। আর যে বাস্তি ফজরের সালাত মসজিদে জামাআতে সাথে আদায় করল, সে যেন পুরো রাত জেগে সালাত আদায় করল’।[১]

খুব সহজ আমল, কিন্তু বিনিময়টা কত বিশাল দেখুন! ইশার সালাতের সময় আপনির নিন। হাতের কাজ রেখে ওয়ে করে মসজিদ পালে বেরিয়ে যান। একজাতের সাথে যদি সালাতে কাটিয়ে দিতেন, তাহলে যে পরিমাণ সাওয়ার আপনি পেতেন, কেবল মসজিদে এসে ইশার সালাত পড়ার কারণে আপনি সে পরিমাণ সাওয়ারের মালিক হয়ে গেলেন। এরপর সুবহে সাদিকের সময় যুম থেকে জেগে উঠে আপনি যখন মসজিদে এসে জামাআতের সাথে ফজর সালাত আদায় করেন, তখন পুরো রাত ইবাদত তথ্য আদায়ের সাওয়ার আপনার আমলনামায় উঠে যায়। কী বিরাট এক সুযোগ!

একটি দশা কঁজনা করা যাক এবার। আপনার সবচেয়ে প্রিয় সেলিব্রিটি কে? যারা কিংকেটপ্রেমীরা বলবেন শচীন, রিকি পশ্চিং, সাজাকারা কিংবা এবি ডি ভিসিয়ার্সের নাম। যাদের গান পছন্দ তারা সুরের জগতের কোনো রঞ্জী-মহারাষ্ট্রের নাম তুলে আনবেন। এখন আপনাকে যদি বলা যায়, যে সেলিব্রিটির কাছে পৌছানো আপনার কাছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো ব্যাপার—তার সামনে রোজ দুর্দার করে আপনার নাম উচ্চারিত হচ্ছে, তিনি আপনার ব্যাপারে নিজ থেকে জানতে চাচ্ছেন, আপনার ব্যাপারে আগ্রাহ দেখাচ্ছেন, ব্যাপারটা কেমন হবে? আপনি হাতে তাবছেন, আরেহ! এটা তো দারুণ একটি ব্যাপার। কিন্তু এটা কি সম্ভব?

[১] কেউ যদি ইশা ও ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করে, তবে সে সর্ব রাত নফল ইবাদতে সাওয়ার পাবে। পশ্চাপাশি সে যদি শেষরাতে তাহাজ্জনের সালাত পড়ে, তবে তা অতিরিক্ত সাওয়ার হিসেবে তার আমলনামায় যোগ হবে।

[২] সহিত মুসলিম: ৬৫৬

আমি হব সকাল বেলার পাখি

মুন নাম পুনীয়ার কোনো সেলিব্রিটি আপনাকে এতটা মূল্যায়ন কখনোই করবে না। এর সময় আপনার নাম উচ্চারিত হওয়া তো দুরের ব্যাপার, আপনি যে দেশে থাকেন, হে সেবের নামও হাতে সে কোনোদিন শোনেনি। বিশ্বাস করুন। অথচ রাজধানীর পাশে আজাহ তাজালা, যিনি সমস্ত কিছুর একমাত্র অধিপতি, যার শান-মান-শান্তিকরণের মধ্যে এই জল-মহাজ্জলতের সবকিছুই তুচ্ছতুচ্ছ, সেই মহামহিম আজাহ তাজালা নে আজাদের খবর রাখেন। আমরা যখন ফজরের সালাতে দাঁড়াই, তখন একদল মেলেশা পুরুষী হতে আসমানের দিকে যাও করে আজাহ কাছে পৌছায়। তখন যাই হৈবেশতান্তের কাছে জানতে চান, ‘তোমরা আমার অনুক বান্দদের কেন অবস্থা রেখে এলে?’ তখন হৈবেশতারা বলে, ‘রাবুল আলামিন! আমরা আমার অনুক অনুক বান্দদকে সালাতের অবস্থায় রেখে এসেছি।’[২]

যিই করুন, সুবহে সাদিকের সময়ে আরামের বিছানা ছেড়ে আমরা যখন মসজিদে এসে যাবার জন্মে আরামে দাঁড়াই, আমাদের র্মান, আমাদের কথা, আমাদের অবস্থানের কথারে জামাআতে দাঁড়াই, আমাদের র্মান, আমাদের কথা, আমাদের অবস্থানের কথারে জামাআতে দাঁড়াই, আমাদের র্মান ভেদ করে আজাহের আরশে আবামে পৌছে যায়। আমরা কান তখন সত আসমান ভেদ করে আজাহের আরশে আবামে পৌছে যাক? আমরা কি তাই না, আমাদের নাম রোজ রোজ আরশে আবামে উচ্চারিত হোক? আমরা কি তাই না, আমাদের নাম রোজ রোজ হৈবেশতারা আজাহের কাছে বর্ণনা করুক? দুনিয়ার সেলিব্রিটির কাছে পৌছাতে হলে আমাদের কত কসরত, কত আয়োজন, কত সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়। অথচ এই আসমান-জমিনে যিনি রাজাদের রাজা, কত সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়। আজাহ কেবল সুবহে সাদিকে যিনি মলিকদের মলিক, তার কাছে পৌছানো কতই-না সহজ! কেবল সুবহে সাদিকে ইন্দু। নিজেকে পরিত্ব করুন। মসজিদে আসুন। একগাঁচিতে সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ঘৃণা! এমন সহজতর সুযোগ আমরা যারা হেলোয় মিস করি, কতই-না অভ্যাস আমরা!

হেট বাচ্চারা যখন মায়েদের কাছে কিছু চায়, তখন মায়েরা বলেন, ‘আগে ওটা করো, তাহলেই এনে দেবো।’ ছেটো মায়ের আদেশে পালন করে। মায়ের আদেশে পালন করা ব্যর্থানি না বড় ব্যাপার, তারচেয়ে বড় ব্যাপার হলো সেই কঙ্কিনত জিনিসটি করা ব্যর্থানি না বড় ব্যাপার, তারচেয়ে বড় ব্যাপার হলো। কেবল সুবহে সাদিকে করা ব্যর্থানি না বড় ব্যাপার, তারচেয়ে বড় ব্যাপার হলো। সেই কঙ্কিনত জিনিসটি করা ব্যর্থানি না বড় ব্যাপার, তারচেয়ে বড় ব্যাপার হলো। তাই না? পাওয়ার সোভ। জীবনে তো কত কিছু পাওয়ার সাধ আছে আজাদের, তাই না? আমরা জামাতে যেতে চাই। নবিজি আমাদের জানচ্ছেন, আমরা যেন দুই শান্ত যী, আমরা জামাতে যেতে চাই।

সময়ের সালাত আদায় করি। তাহলে আমরা সহজেই জানাতে পেতে পারিব।) শাস্তি সময়ের সালাত কোনগুলো? সেগুলো হলো ফজর এবং আসর। এই দুই ঘোষণা প্রকৃতি থাকে শাস্তি, সঙ্গীব, নির্মল। আমরা যদি ফজর এবং আসর। এই দুই ঘোষণা হই, আমাদের জানাতে যাওয়ার পথ মসুগ হবে। জানাতে তো আমাদের জীবনের পথের আরাধ্য। সুমধুর কলকল ধনির নহর, চিরসবুজ উদ্যান, নয়নত্ত্বামো ঐশ্বর্যমিতি এমন বাগানের বাসিন্দা হওয়ার জন্য আমাদের হতে হবে সুবহে সানিকের পাখি। যে পাখি বরের স্মরণে জেগে ওঠে। যার কঠ বেয়ে কারে পড়ে বরের মহিমা।

ফজর ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেদের জীবন থেকে দূরে ঠেলে দিই আয়াহের বারাকাহ। একবার একলোক ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহকে বলল, ‘বারাকাহ বলতে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।’

লোকটার কথা শুনে হাসলেন ইবরাহিম ইবনু আদহাম। বললেন, ‘কুকুর এবং ভেড়া চেনো?’

‘হ্যাঁ।’

‘কোনটার প্রজনন ক্ষমতা কেমন?’

‘একটা কুকুর সাতটা পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে। অন্যদিকে, একটা ভেড়া বাচ্চা দিতে পারে বড়জের তিনটি।’

‘তোমার চারপাশে তাকালে, দুটির ভেতরে কোন প্রাণিটিকে তুমি সবচেয়ে বেশি দেখতে পাও?’

‘ভেড়াই বেশি দেখি।’

‘কিছু ভেড়া তো এমন এক প্রাণী যাকে নিয়মিত জবাই করা হয় এবং যার মাংস মানুষ খায়, তাই না?’

‘জি।’

‘কুকুর কি জবাই করা হয়? কুকুরের মাংস কেউ খায়?’

‘না।’

‘তারপরও কুকুরের চাইতে ভেড়ার সংখ্যা দুনিয়ায় বেশি।’

‘কুকুর?’  
‘ও কুকুর হলো বারাকাহ। ভেড়া রাতে দুট ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঠিক ফজরের আগে আমে তাম লাভ ওঠে। ফলে ফজরের সময়ে আজ্ঞাহ যে বারাকাহ দুনিয়ায় পাঠান, কিছু ফজরের সময়ে তাম লাভ করে। অন্যদিকে কুকুর সারা বাত জেগে থাকে, কিছু ফজরের সময়ে আজ্ঞাহ পড়ে। ফলে ফজরের আজ্ঞাহ যে বারাকাহ প্রদান করেন তা হলো কুকুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে। এজনেই ভেড়া কম বাচ্চা প্রসব করা সত্ত্বেও এবং তারা একটা কুকুর বশিত হয়। এজনেই ভেড়া কম বাচ্চা প্রসব করা সত্ত্বেও এবং তারা একটা কুকুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে। এজনেই হওয়ার পরেও দুনিয়ায় কুকুরের সংখ্যা পুনৰাবৃত্ত হচ্ছে। এটাই হলো বারাকাহ।’

যা ফজরে আগে আর বারাকাহ লাভ করে। জীবনে, সময়ে, কাজে। আর যারা জাগতে গেরে না, তার বিজিত হয় এই বারাকাহ থেকে। তাদের কাজে বারাকাহ থাকে না, সময়ে বারাকাহ থাকে না। সর্বেশ্঵রির জীবন থেকেও তাদের বারাকাহ হারিয়ে যায়। যারাকাহ মে কত বড় একটি নিয়মত, তা যে লাভ করে, কেবল সে-ই উপলব্ধি করতে পারে। জীবনে বারাকাহ লাভের জন্য আমরা কি হয়ে উঠতে পারি না সকল বেলার পথি। সুবহে সানিকের মিথ্য শীতল হাওয়ায় মেলে দিতে পারি না নিজেদের ডানা!

[৪]

আমা অনেকেই ফজরের জন্য জাগতে পারি না। একজন মুমিনের জন্য এটা একটা বিশাল ব্যর্থতা। দিনের প্রথম প্রারজয়। একজন মুমিন তার দিন শুরু করবে প্রারজয় হিসাল ব্যর্থতা। একজন মুমিনের জন্য লজ্জাজনক! বিয়ে, তা-ও আবার আলাইহোসৈই শরতান্ত্বের হাতে—ব্যাপারটাই তো লজ্জাজনক! এ রকম লজ্জার জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা একজন মুমিনের জন্য কখনেই শোভনীয় না। তাই আমাদের সবার উচিত ফজরে জাগার জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করা। এটাকে জীবনের পুরুত্বের একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়া। ফজরে জাগার জন্য বেশ কিছু কার্যকরী উপায় আছে। সেই উপায়গুলো অবলম্বন করলে, আশা করা যায়, আমরা নিয়মিত ফজরে জাগতে পারব, ইন শা আজ্ঞাহ।

ফজরে জাগতে হলে সর্বপ্রথম যা দরকার তা হলো নিয়ত করা। আমি যে ফজরে সত্তি সত্তিই জাগতে চাই, ফজর সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করতে চাই—এর জন্য ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগে নিয়ত করে নেলো। নিয়তের ব্যাপারটি আসতে হবে একেবারে হৃদয়ের গভীর থেকে। কেবল মুখে যদি কেউ বলে,

## বেলা শুরাবার আগে

‘আমি ফজরে উঠব’—তাহলে সেটা সঠিক নিয়ম হবে না। নিয়ম তো মেটাপ্লাটে  
অঙ্গের ব্যাপার। তাই দেখতে হবে ফজরে জাগার তাঢ়নটা আমার দৃশ্য মেঝে  
উৎসারিত হচ্ছে কি না।

বাস্তিত অভিজ্ঞতা থেকে বলি, যেদিন আমি খুব তাড়াড়ে করে, ফজরের সালাত  
পঢ়ার ব্যাপারে কোনো রকম মনস্থির করা ব্যাটাতই ঘূমিয়ে পড়ি, তিক সেবিনেই  
ফজরে জাগতে প্রচুর সমস্যা অনুভব করি। নিয়ম ব্যাটাত রাতে শীঘ্ৰই বিষ্ণু ধৰণেও  
ফজরে জাগতে সমস্যা হয়। আবার যেদিন আমি সঠিকভাবে ফজরের সালাত পঢ়ার  
ব্যাপারে দৃঢ় সংকলন নিয়ে ঘূমাতে যাই, সেদিন ফজরের জন্য নিষিট সময়ের মধ্যেই  
জাগতে পারি। বরং সেদিন যদি মাবরাতে কোনোভাবে ঘূম ও ভাঙে, আমি প্রশ্নের  
হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাই আর সময় দেখি। তবু লাগে, আমার ফজরটা আবার দৃঢ়  
ধরণেও ফজরে জাগতে কখনো সমস্যা অনুভব করে না। এই যে দুটো অবস্থায় ঘূমে  
ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি, এটা কেবল নিয়মের ফলাফল। প্রথম অবস্থায় ঘূমে  
থাকলেও তা ছিল খুব সাদামাটা। তাতে দৃঢ় কোনো সংকলন ছিল না। ‘জাগতে পারাজে  
পড়ব’ ধরণের একটা গা ছাড়া ভাবে ছিল। ফলে ওই অবস্থায় ফজর পড়তে আমাকে  
বেশ ইমশিম খেতে হয়েছে। আবার দ্বিতীয় অবস্থায় আমি দৃঢ় সংকলনের যে, ‘আমি  
কোনোভাবেই ফজর ছাড়ব না’ ফলে দেখা যায়, আমি ঠিক ঠিক ফজরের জন্য  
জাগতে পারাই কোনো সমস্যা ছাড়াই। নিয়মের অশ্চর্ষ ফর্মতা এটাই।

ফজরে ঠিক সময়ে জাগার জন্য আমাদের যে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে তা হলো  
রাতে দ্রুত ঘূমিয়ে পড়া। দৃঢ় সংকলন নিয়ে রাত করে ঘূমিয়েও চাইলে যে-কেউ  
ফজরের জন্য জাগতে পারে, তবে সবসময় যে এমন হবে—তার নিশ্চয়তা নেই।  
খুব বেশ ঈমানি শক্তিতে বলায়ীন না হলে এই পরীক্ষায় অকৃতক্রম হওয়ার অশঙ্কা  
থেকেই যায়। কিন্তু ফজরে তো আমাদের নিয়মিত হতেই হবে। আর নিয়মিত হতে  
হলে দরকার নিয়ম করে রাতে দ্রুত ঘূমিয়ে পড়া। এটি নবিজি সঞ্চালনাকু আলাইই  
ওয়া সঞ্চালনেও সুন্নাহ। তিনি ইশার সালাতের পর অহেতুক কথা, কাজ এভিয়ে  
চলতেন। ঘুমের প্রস্তুতি নিতেন এবং দ্রুত ঘূমিয়ে পড়তেন।<sup>(১)</sup> কিন্তু দৃঢ়ের ব্যাপার  
হলো, আজকে আমরা নবিজির এই সুন্নাহ ভুলতে বসেছি। চমৎকার এই সুন্নাহ

## আমি হব সকাল বেলার পাখি

এবং আমা আজ মোজন মোজন দূরে। প্রাণ্তির উৎকর্ষতা আজ কেড়ে নিয়েছে  
মানব চৃষ্টক দূর। যে রাতকে আলাই সুবহানু ওয়া তাআলা আমাদের শরীর,  
জীব জীবের জন্য ‘বিশ্রাম’—এর উপলক্ষ্য বানিয়েছেন, আজ সেই রাত কেটে যায়  
সকালে মিজালুল্লাহের যাওয়ার জ্ঞাত। কি যুক্ত, কি কিশোর, কিংবা বৃক্ষ, আমরা  
সকালে এসে রাতের ফেস্টবুকির করি, ইচ্চাইট প্রাউজ করি। রাতগুলো খখন শেষ  
হয়ে যাবে, তখন আমরা কাথা-কহল মুড়িয়ে ঘূমেতে যাই। মাঝখানে ছুটে  
যাবে আমাদের ফজরের সালাত। শুধু তাই নয়, রাতভর সোশ্যাল মিডিয়াতে সময়  
কাটের ফজরের সালাতে আর্দ্ধেকাহি আমরা ঘূমিয়ে কাটিয়ে দিই। এতে করে আমাদের  
কাটের ফজরের সালাত শুধু তাই সবকিছু করে যায়। আমরা হারিয়ে ফেলি জীবনের  
স্বপ্ন তাই, জীবনকে ছন্দে ফেরাতে, জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া বারাকাহ পুরুষের  
গতে হয়ে অবশ্যই রাতে দ্রুত ঘূমিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ফজরে ঘূমনের আগের বেশ কিছু আমলের কথা বলা আছে। যেমন—ঘূমাতে যাওয়ার  
চাহ ও করে নেওয়া, বিতর বাদ থাকলে আদায় করে ফেলা এক সাথে দুয়া করা  
নে ফজরে টিক সময়ে আলাই সুবহানু ওয়া তাআলা ঘূম তাঙ্গিয়ে দেন। এরপর  
ফজর কুরআন তিলাওত করা, বিশেষ করে সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, আয়াতুল  
কুনি এবং সুরা মুলক। নবিজি সঞ্চালনাকু আলাইই ওয়া সালাম ঘূমাতে যাওয়ার আগে  
ই আমলগুলো করতেন এবং ঘূম আসার আগ অবধি মনে মনে টোঁটি নেতৃত্বে নিবিল  
করতেন। সুন্নাহে বর্ণিত এই আমলগুলো ফজরে জাগাতে অবশ্যই কর্যকরী।

ফজরে জাগায় অন্যতম আরেকটি উপায়, যেটা আমি বাস্তিতভাবে মনে চলার  
চোট করি তা হলো ঘূমনোর সময় ফজরের সালাতের গুরুত্বগুলো একে একে মনে  
করা। যেমন—মূলাফিকদের জন্য ফজরের সালাত আদায় কষ্টসাধ্য। ফজরের সালাত  
ঠেকে দিয়ে নিজের তেতুরে মুলাফিকদের বৈশিষ্ট্য ধরণ করা কোনোভাবেই সম্ভব  
না। তাড়া যাবা ফজর সালাত পড়ে আলাই সুবহানু ওয়া তাআলা তাদের কথা  
না। তাড়া যাবা ফজর সালাত পড়ে আলাই সুবহানু ওয়া তাআলা তাদের কথা  
ফজর সালাত আদায়ে উদ্বৃত্ত করে খুব। যেদিন থেকে আমি ফজরের দুই রাতকাত  
সুন্নাত আদায়ের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসটি শুনেছি, সেদিন থেকে ফজরের সুন্নাত  
আদায়ে আমি এক অন্য রকম তাড়া অনুভব করি তেতুর থেকে। নবিজি সঞ্চালনাকু  
আদায়েই ওয়া সঞ্চালন বলেছেন, ফজরের দুই রাতকাত সুন্নাত হলো পুরুষী এবং

## বেলা যুবরাজের আগে

এর মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম।<sup>[১]</sup> এই হাসিস্টির ওপর গভীর মনযোগ দেওয়া গেলে ফজরের দুই রাকআত সুন্মাত সালাত ছুটে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। একটু ভালো থাকার জন্যই তো দুনিয়ার আমাদের এত কসরত। তো ফজরের দুই রাকআত সুন্মাত যখন দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে ভালো, সবকিছুর চাইতে উত্তম, তাহলে এই উত্তম জিনিসটা হেতে দেওয়ার কোনো মানে হ্যাত?

ফজর ছুটে না যাওয়ার আরেকটা সুন্দর উপায় সুন্মাহর মধ্যে পাওয়া যাব। নিবিড় সাক্ষাত্কার আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন, তোমরা যখন ঘূর্ণ তখন শুরু হবেন তোমাদের মাথার পেছনে তিনটি শিট দেয় এবং এই কথা বলতে থাকে যে, ‘বাত আরও অনেক বাকি। ঘূর্ণও! ঘূর্ণও! যখন কোনো ব্যক্তি ফজরের আগে জেনে যাব এবং আলাহর প্রশংসা করে, তখন প্রথম শিট খুলে যাব। যখন সে ঘূর করে, তখন দ্বিতীয় শিট খুলে যাব এবং যখন সে সালাতে দুড়ায়, তখন তৃতীয় শিটও খুলে যাব।’

খেয়াল করলে দেখবেন, আমাদের ফজর সালাত ছুটে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো অলসতা। আলসেমির কারণে আমরা জামাআতে ফজরের সালাত আদায় করতে পারি না। এর কারণ, শয়তানের বৈধে দেওয়া শিটগুলো খুলতে না পারা। আলসেমি কান্দিয়ে মুয়াজ্জিনের আয়ন অপনার কানে এসে লাগবে, ঠিক তখনই ‘আলাই আকবার’ হলে উঠে বসে পড়ুন। এরপর নবিজির শেখানো দুআটা পাঠ করুন—

اللَّهُمَّ يَلْبِدُ الْيَقْنَى أَحْيِنَا بَعْدَ مَا مَاتَنَا وَأَيْهِ النُّشُورُ

আল-হামদু লিল্লাহ হিজ্জারী আহইয়ানা বা’দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন মুশূর।<sup>[২]</sup>

এরপর সোজা বিছানা থেকে নেমে ওয়ু করতে চলে যান। ওয়ু করে নিতাদিনের মতন কালোমা শাহাদাত পাঠ করুন। এরপর জায়নামায বিছিয়ে ফজরের দুই রাকআত সুন্মাত সালাতটুকু পড়ে ফেলুন। হাতে অতিরিক্ত সময় থাকলে ফজরের সুন্মাতের আগে দুই রাকআত তাহিয়াতুল ওয়ুর সালাত পড়তে পারেন। বাস, আপনি অভিশপ্ত শয়তানের

[১] সহিহ মুসলিম: ৭২৫

[২] সহিহ বুখারি: ৩০৯৬; সহিহ মুসলিম: ৭৭৬

[৩] সহিহ বুখারি: ৬৩১২

## আমি হব সকাল বেলার পাখি

সে দুই মুস্তকের মসজিদে চলে যাতে পারেন, কিংবা আরও সময় হাতে থাকলে ফজরের যিকিরাতের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক।

কাব্য নিয়মিত হওয়ার জন্য একটা ‘চালেলু’ নেওয়া যাতে পারে। বিশ দিনের পাশে একটা পাওয়া যাতে পারে।

ব্যবহৃত হওয়ার জন্য একটা ‘জের’ করেই ফজরে জেগে উঠুন। এই দশ দিনে একপ্রকার ‘জের’ হোক আলার্ম দিয়ো। হোক অন্যকে বলে রেখে। লক্ষ্য

যাবে হোক হেঁসে উঠুন। হোক আলার্ম দিয়ো। হোক অন্যকে বলে রেখে। লক্ষ্য মুকুর দশ দিন: প্রথম দশ দিন টানা জামাআতে ফজর আদায় করতে পারলে, যের দশ দিনে আপনি এমনিয়েই ফজরে জাগতে পারবেন। কারণ, আপনি একটি শুনে মাথা চল এসেছে ইতোমধ্যে। এই দশ দিন ফজরে জাগার জন্য আপনাকে পূর্ণ দেশ পেতে হবে না। দেখা যাবে, ফজরে জাগার জন্য আপনি রাতে যাবে আমে ঘুমেতে চলে যাচ্ছেন। ঘুমের পূর্বের দুআগুলো পাঠ করছেন। ‘ফজরে জাগাবেন মহো নিয়ত নিয়ে ঘুমেতে যাচ্ছেন যাব ফলে ফজরে জাগা এখন আপনার জন্য অভিজ্ঞত সহজ।

শেষের দশ দিন: এই দশ দিনে আপনি অন্য রকম একটা অভিজ্ঞতার ‘মুখ্যমুখি হবেন ফজরের জন্য আপনি তো এখন জাগবেনই, অবিকৃত, আপনি এখন ফজরের জন্যে ২০ থেকে ২৫ মিনিট আগে উঠে যাতে পারবেন। এই সময়গুলোতে আপনি তাহাজ্জুদের জন্য আপনার মন বাকুল হয়ে থাকবে। আপনার হয়ে যেতে পেরে এখন তাহাজ্জুদের জন্য আপনার মন বাকুল হয়ে থাকবে। আপনার মন হবে, ‘ফজরের বিশ মিনিট আগে জেগে যদি তাহাজ্জুদটা পড়া যায়, অস্ত দুই রাকআত, তা-ই বা কম কীসে? জাগন্তু যখন, আরেকবু আগেই না হয় জাগলাম।’

এই ‘৩০ দিনের চালেলু’ টা একবার নিয়ে দেখুন। আমি বিশ্বাস করি, আপনার ছীরনকে পরিষ্কৰ্ত্ত করে দিতে এই পথতি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে, ইন শা আলাই। ফজরে জাগার জন্য শবার আগে যা দরকার তা হলো ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে বাকি আয়োজন আলাই সুবহান্নু ওয়া তাঅলা ব্যবস্থা করে দেন। আর যদি ইচ্ছাই না থাকে, তাহলে শয়তানের শিকল-বন্দি হয়ে দিন পার করা হাড় আর গতি কী? ফজর হেতু

দিলেন তো হেরে গেলেন। হেরে যেতে কে চায় বলুন দুনিয়ায়? আজাহর চায়ে মাঝে  
হেরে যায়, তাৰা তো দুনিয়া এবং আখিৱাত দুই জাগোতোই হতভাগ। আমৰা কি সেই  
হতভাগদেৱ অস্তৰ্ভূষ্ট হতে চাই? যদি না চাই, তাহলে চলুন দৃঢ় সংকৰ কৰি—‘ইন  
শা আজাহ, আগামীকাল থেকে আৱ কথনোই আমি ফজৰ সালাত কায়া কৰিব না।’



## তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

[ক]

পৰ্ণিমা তৰে উঠছে হতশাপ্ত মানুষ দ্বাৰা। জীবনেৰ সৰ্বপদে আমৰা হতাশ।  
ক'ত তালো চাকৰিৰ জন্য হতাশ, কেউ ক্যারিয়াৱ, পড়াশোনা আৱ তালো  
ইঞ্জিনীৰিকৰ জন্য। যদি জিঞ্জেস কৰা হয়, ‘দিনে কতবাৰ আমি তালো চাকৰিৰ  
জন্য আজাহৰ কাছে দুআ কৰি? পৰীক্ষায় তালো রেজাল্ট, তালো একটি ক্যারিয়াৱ,  
তালো জীবন-জীৱিকাৰ জন্যে দিমে কতবাৰ আমি আজাহৰ কাছে হাত পাতি?’ এমন  
জীবনেৰ ব্লকেজলও হৰে হতশাজনক। আমাদেৱ জীবন থেকে নবিজি সালামাহ  
দাইছি ওয়া সালামেৰ সবচেয়ে বড় যে সুমাহাটা বিলুপ্ত সেটা হালো দুআ। আমৰা  
তাৰাই ওয়া কৰতে ভুলে গেছি। অথচ নবি-জীবনেৰ দিকে তাকালে আমৰা দেখব, তাৰ  
পুৱা জীবনটাই ছিল আগামোড়া দুআৰ সমষ্টি। তিনি দুম থেকে উঠে দুআ কৰেছেন।  
ও কৰাৰ আগে দুআ কৰেছেন, ওযু শ্ৰেষ্ঠ কৰে দুআ কৰেছেন। ঘৰ থেকে  
গায়ে দিতে গিয়ে দুআ কৰেছেন। জুতো পৰতে গিয়েও দুআ কৰেছেন। আকাশে নতুন চাঁদ  
বেৰ হবেন, দুআ কৰেছেন। ঘৰে চুকবেন, দুআ কৰেছেন। তিনি সুসংবাদ শুনে দুআ  
দেখে দুআ কৰেছেন, মোৱগেৱে ডাক শুনে দুআ কৰেছেন। তিনি সুসংবাদ শুনে দুআ  
কৰেছেন, দুঃসংবাদ শুনে দুআ কৰেছেন। জীবনেৰ প্রতিটি পথায়ে, প্রতিটি ধাপে,  
প্রতিটি কদমে তিনি দুআ কৰতেন। তাৰ জীবনটাই ছিল একটা ‘দুআৰ ভান্ডাৰ’।  
আৱ আমৰা? মনে পড়ে আমৰা শ্ৰেষ্ঠ কৰে দুআ কৰেছি? অস্তত নিজেৰ জনা?

বেলা ফুরাবার আগে

কুরআনে বর্ণিত নবি-রাসূলদের জীবনের দিকে তাকালেও আমরা দেখি যে, তাদের জীবনেও দুআর ছিল এক আশ্চর্যরকম প্রভাব। ক্ষম থেকে নিশাল সমবিচ্ছুল্টে তার আজ্ঞাহর কাছে দুআ করতেন। আজ্ঞাহর কাছেই সাহায্য ঢাইতেন। মরণবাসিতে আক্রম হয়েও নবি আব্যুক্ত আলাইহিস সালাম আলাহর ওপর থেকে নিরাশ হননি। দুআ করা হাড়েলনি। মাছের পেটে বসি হওয়ার পরেও ইউনুস আলাইহিস সালাম দ্রুতে যাননি দুআ করার কথা। মুসা আলাইহিস সালামের মুখে ছিল জড়ত। সেই জড়তে দুর করান জন্মেও মুসা আলাইহিস সালাম আলাহর কাছে দুআ করেছেন যা আমরা কুরআনে দেখতে পাই। জীবনের কঠিন-সহজ সকল সময়ে আজ্ঞাহ নবি-রাসূলদের সঙ্গী ছিল দুআ। তারা তাদের জীবনের সমস্ত কিছুকে আজ্ঞাহর দিকে সেৰ্পুর্ব করে দিয়ে দু করতেন। দুআই ছিল তাদের প্রধান বর্ষ, প্রধান হাতিয়ার।

「四」

কেন আমরা দুআ করিনা? কারণ, আল্লাহর ওপর থেকে আমাদের তাওয়াকুল তথ্য ভরসা করে গেছে। অথবা, হতে পারে, দুআর যে আশ্চর্যকরম একটা শক্তি আছে, সেটা উপলব্ধি করতে আমরা বার্ষ। নবি-রাসূলদের অঙ্গের তাওয়াকুলে ইটিখুর ছিল বলেই তারা হরহামেশা দুআ করতেন। তাদের কাজকর্মের সবকিছুতে থাকত দুআর আবরণ। আর আমাদের অঙ্গের পড়ে আছে যিন্মতির প্রগাঢ় প্রলেপ। মরে আছে আমাদের অঙ্গরায়। তাই আমরা দুআ করতে পারি না। মাথা নেয়াতে পারি না। আল্লাহর কাছে হাত তুলতে পারি না।

ଆମରା ଭୁଲେ ଯାଇ, କେବଳ ଆଜ୍ଞାଇ ଶୁଦ୍ଧହାନାଟୁ ଓୟା ତାଆଲାଇ ଅସଂଗ୍ରହକେ ସମ୍ଭବ କରାଯନ୍ତି ରାଖେନାମୀ। ସ୍କାରିଯା ଆଲାଇହିସ ସାଲାମ ସଥିମ ମାରଇଯାଇଥାମ ଆଲାଇହିସ ସାଲାମେ ଦାର୍ଶିତେ ନିୟକ୍ତ ଛିଲେନ, ତଥବ ତିନି ପ୍ରାୟଇ ଦେଖନେ ମାରଇଯାଇଥାମ ଆଲାଇହିସ ସାଲାମେ କାହେ ନିତ୍ୟନୂନ ଫଳଫଳାଦି ଅସତ। ଶ୍ରୀମେର ଫଳ ଶୀତକାଳେ, ଶୀତକାଳେର ଫଳ ଶ୍ରୀମେ। ଫଳଗୁଲୋ କୋଥେକେ ଆସି ସେଠା ଯାକାରିଯା ଆଲାଇହିସ ସାଲାମ ଜାନନେନ ନାହିଁ କୌତୁଳସରଣ ଏକଦିନ ତିନି ମାରଇଯାଇଥାମ ଆଲାଇହିସ ସାଲାମକେ ଜିଙ୍ଗେଜ କରେ ବସନେନ, ‘ହେ ମାରଇଯାମ! ତୋମର ମେହାବେ ଆମି ଛାଡ଼ା ଆର କାରଣ ପ୍ରବେଶ୍ୟକାର ନେଇ ଆମି ଛାଡ଼ା ଆର ଦିତୀୟ କୋନେ ବାଟି ଏଖାନେ ଆସେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବଜ୍ଦ ଜାନନେ ମନ ଚାଷ, ତୋମାର କାହେ ସେ ନିତ୍ୟନୂନ ଫଳଫଳାଦି ଦେଖି, ସେଗୁଲୋ କମି କାମାଯାଇଥାମାରିବାକୁ ଆମର କାହେ ନାହିଁ’

তুলি দৃষ্টি হাত করি মোনজাত  
'সেগলো আমার আলাই পাঠাই' (১)

‘তুলি মুই হত-৷’  
‘সেগুলো আমার আলাহ পঠন।’<sup>(১)</sup>  
বল্লভপুর বন্দীকালৈ ফল শ্রীমকালে দেওয়ার ক্ষমতা যে একমাত্ৰ  
বন্দীর সুবৃহৎ তা তাদালী রাখেন, এই বিষাস যাকৱিয়া আলাইহিস সালামের  
বন্দীর বন্দুৰ্বল ছিল। মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আলাহ সুবৃহানুহ ওয়া তা আলা  
হিস মুহাম্মদ মান কৰেন সেথে যাকৱিয়া আলাইহিস সালামের মনে একটি আশাৰ  
বন্দী বেলু দান। তিনি ভাৰতেন, আলাহ যদি মারইয়ামের ওপৰ এমন অপৰ দয়া  
বোঝ পারেন, আমাকেও তিনি অবশ্যই একটি সন্তুষ্ণ নিতে পারবেন। এৰপৰ তিনি  
বিনি চিঠি আলাহৰ কাছে দুআ কৰাবেন। বল্লেন, ‘হে পুরুষারবিগুর! আমাৰ  
বন্দুৰ্বল দুর্ল হয়ে গৈছে। সাদ হয়ে গৈছে আমাৰ মাথাৰ চুল। আপনাকে ডেকে  
কৰি কখনো বাধ্য হইনি। আৰ আমাৰ পৰে আমাৰ সুগোৱাইদেৱ ব্যাপারে আমি  
যাবলৈ কৰছি পুৰুষারবেগোৱাৰ! আমাৰ স্তৰী বধ্যা। (ত্ৰুতি আৰি আপনার কাছে  
চৌকি আপনি আমাকে আপনাৰ পক্ষ থেকে একজন উত্তৰাধিকাৰী দান কৰুন।’<sup>(২)</sup>

ବ୍ୟାକ, ଆୟାତ : ୩୭

(S) সুরা আলে ইন্দুন : ৪-৭

বেলা ফুরাবার আগে

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

[গ]

যে যুবকের এখন বিয়ের বয়স, কিন্তু নামান প্রতিক্রিয়ায় তার বিদের বদলা ঘোনা, সে কি কখনো হাত তুলে আজ্ঞার কাছে বলেছে, ‘ইয়া আজ্ঞাই, আমার শীর্ষে এখন যৌবনের উদ্ঘাত উচ্চাদন।’ আমার সামনে-পেছে, ডানে-বামে, ওপর-নিচে সবখানে ফিতনা আয় ফিতনা। ফিতনার এই মায়াজল ভেদ করে নিজের শুধু রাখা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। দৃঃস্থায় হয়ে উঠেছে। ইয়া রং, যদি আমার কোনো ভালো চাকরি না হয়, যদি আমার আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে বিয়ে করাটা আমার জন্য একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ব। আবু, আমি ফিতনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাই। আমি চাই একটি হালুল সম্পর্ক যেখানে আমার চোখ শীতল হবে, আমার হৃদয় তৃপ্ত হবে আমার অস্তর শশাঙ্ক হবে। আপনি তো সমস্ত ঐশ্বরের মালিক। আপনিই পথের ভিত্তিকে রাজা বানান, আবু রাজকে বানান পথের ভিত্তি। মানুদ, আপনার অভেই, আকুরস্ত ঐশ্বর থেকে আমার জন্য কিছু রিয়িক নির্ধারণ করুন। আমার জন্য বিদেওটাকে সহজ করে দিন।’

যে লোকটার শরীরে বাসা বৈধেছে দুরারোগা ব্যাধি, জীবনপ্রদীপ নিতে যাওয়ার কতগুলো বসন্ত পার করে এসেছি। কত ভালো ভালো সময়ে তোমার যথে থেকে বড় হলেও কখনো তোমার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞান করিনি। আজ আমাৰ জীবনেৰ হয়েছে। তোমার দেওয়া আলো-বাতাস, তোমার দেওয়া রিয়িক ভঙ্গ করে ক্রান্তিলগ্ন! দুনিয়াৰ সমস্ত আয়োজন আমার শরীরেৰ বসন্ত ফিরিয়ে আনতে বাধ কোথাও আৱ কোনো আশা নেই। কিন্তু তাৰা হাততো জনে না, তাৰে আশা যেখানে শৈব হয়, তোমার ভৱসার বুদ্বুদ সেখান থেকে যাগ্রা কৰে। মানু, আমি তো জানি, তুমিই সকল সমস্যাৰ একমত সমাধানদাতা। তুমি তো আশ-শাহী। আরোহাদতা। আমি তোমার দিকে মুখ ফেরালাম। আমি অসহায়, দুর্বল, ঝিলঝিৎ এক। তাৰা বলছে আমার সকল আশা ফুরিয়ে গেছে, অঢঢ আমার সামনে আশীর এক জ্বলজ্বলে প্রদীপ। তুমিই কি আইয়ুব আলাইহিস সালামকে দুরারোগ ব্যাধি থেকে আরোগ্য দাওনি? তুমিই কি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামেৰ জন্য আগুনকে শাস্ত-শীতল কৰে দাওনি? তোমার নির্দেশেই কি দৱিয়া ঝুঁড়ে পথ তৈৰি হয়নি নবি মুসা আলাইহিস সালামেৰ জন্য? তুমি যার বয়, তাৰ কি হতাশ হওয়াৰ কাৰণ থাকতে পাৰে? আমিও হতাশ হচ্ছি না ইয়া বয়, আমার শরীরে তুমি আরোগ্য দান কৰো। আমাকে নতুন কৰে তোমায় ভাকতে দাও, চিনতে দাও।’

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত  
কারণ হলো আমাদেৱ  
জ্ঞান বৈ দুষ্ট কৰি না তাৰ পেছলে অনাতম আৰেকটি কাৰণ হলো আমাদেৱ  
জ্ঞান বৈ দুষ্ট আমাৰ নগদে বিশ্বাস। তৎক্ষণাত যা পাই তাতেই আমাদেৱ  
জ্ঞান সুবহানু গো তাত্ত্বালি একটা পথতি। তিনি ‘কুন’ বললেই সবকিছু সৃষ্টি  
হয় যা, তাপালি তিনি পৃথিবী এবং আসমান-জনিন সৃষ্টি কৰতে আট দিন সময়  
দিয়েছিল। তিনি ‘কুন’ বললেই যেকোনো কিছু অনন্তত থেকে অনিত্ততে আসতে  
হৈ আজ মাড়াৰ্জে তিনি আমাদেৱ দীৰ্ঘ একটি প্ৰক্ৰিয়াৰ ভেতৰ দিয়ে বড় কৰে  
হৈ আজ সুবহানু গো তাত্ত্বালি পথতি। নিয়ম। কিন্তু আমাৰ এই  
জ্ঞান কৰুল হৈক যখন দেবি, আমাদেৱ দুআগুলো আমাদেৱ প্ৰত্যাক্ষিত সময়েৰ  
হৈ কৰুল হচ্ছে না, দুআৰ আপাত কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমাৰ  
হৈ কৰুল হচ্ছে পঢ়ি। আত্মে আস্তে দুআ কৰা হচ্ছে দিই। এই যে আমাদেৱ মজাগত  
সূচনাৰ বলেহেন, ‘মানু বড়ই তাড়াড়োপ্বৰণ।’[১]

আজ্ঞাহ কাছে আমাৰ যে দুআ কৰি, সেই দুআ কৰুলৰ বাপাৰ নিয়ে ড. বিলাল  
বিপ্রীদেৱ খুব চমৎকাৰ একটি কথা আহে তিনি বলছেন, ‘আপনি যখন দুআ  
বলেন, তখন আজ্ঞাহ সুবহানু গো তাত্ত্বালি তিনভাৱে আপনাৰ দুআৰ উভৰ দেন।  
এক, আপনাৰ দুআৰ বিপৰীতে তিনি বলেন, ‘হাঁ’ অৰ্থাৎ, তৎক্ষণাত আপনাৰ  
দুআ তিনি কৰুল কৰে নেন।

দুই, আপনাৰ দুআৰ বিপৰীতে তিনি বলেন, ‘হাঁ, কিন্তু এখনই নয়।’ অৰ্থাৎ  
আপনাৰ দুআ তিনি কৰুল কৰবেন, তবে সেটা তৎক্ষণাত নয়। আপনাৰ দুআ  
পূৰণেৰ জন্য উপস্থিত সময় কোনটি সেটা আপনি জানেন না। কোন সময়ে কৰুল  
কৰলে তা আপনাৰ জন্য বেশীই উপকৰী, সেই জন্য আপনাৰ নেই, আজ্ঞাহৰ  
আহে। তাই তিনি আপনাৰ পছন্দমাকিক সময়ে দুআটা কৰুল কৰেন না। উপস্থিত  
সময়েৰ জন্য আপনাকে অপেক্ষা কৰান।

[১] সুবা বনি ইসলাম, আজাত : >

তিনি, ‘তোমাকে নিয়ে আমার আরও উভয় পরিকল্পনা আছে।’ অর্থাৎ দুটার মাধ্যমে আপনি আজ্ঞাহর কাছে যা চাইছেন, তা হচ্ছে আপনার জন্য অকল্পনিক হতে পারে। অথবা আপনি যা চাইছেন তাতে আপনার জন্য যে কল্যাণ, অন্যের অধিক কল্যাণকর কিছু আজ্ঞাহ সুবহানান্ন ওয়া তাআলা আপনার জন্য নির্দল করে রেখেছেন। তাই আপনি দুটা করে যা চান, ঠিক তা-ই অনেক সহজ আজ্ঞাহ আপনাকে দেন না। আপনাকে আরও কল্যাণকর, আরও উপকারী বিষয়ের দিকে আজ্ঞাহ সুবহানান্ন ওয়া তাআলা ধাবিত করান।

অন্যথির চিন্তা না হয়ে, আজ্ঞাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো রকম অবিশ্বাস, সন্দেহ কিংবা সংশয় পোষণ না করে তাঁর কাছে চান। আপনার মেট্রুকু দায়িত্ব সেটুকু পারান করে বাকি ফলাফলের জন্য তাঁর উপর ভরসা করুন, ঠিক যে রকম আমাদের নবি মুসা আলাইহিস সালাম করেছিলেন। ফিরাউনের রাজ থেকে পালিয়ে তিনি মানবিয়ানে এসেছিলেন। ছিমুল অবস্থায় সেখানে দুটো অসহায় রমণীর হত্যার করিয়ে বলেছিলেন, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার জন্য যে অনুগ্রহ প্রেরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমি তারই মুখ্যপাক্ষী।’<sup>(১)</sup> নবি মুসা আলাইহিস সালাম নির্দিষ্ট করে আজ্ঞাহর কাছে বলেছিলেন, ‘আপনি আমাকে যা দেবেন তাতেই আমি খুশি।’ আমাদের দুআগুলোও হতে হবে এমন। দুটার মধ্যে থাকতে হবে আজ্ঞাহর উপর পরম নির্ভরতার ছাপ।

বনি ইসরাইল যুগের তিন লোক, যারা আটকা পড়েছিল গুহার মধ্যে, তারাও দুটার তখন তারা আজ্ঞাহর কাছে আকৃত চিন্তে দুটা করেছিল। সেই দুআগুলো আজ্ঞাহ কাহাফের সেই ঘৃনকেরা, তারা চারপাশের ফিতনা থেকে বাঁচতে আজ্ঞাহর কাছে অশ্রয় চেয়ে দুটা করেছিল, আজ্ঞাহ তাদের দুটাও করুল করেছেন। সুনীর্ধ একটা সময়ের জন্য তাদের তিনি ঘূর্ম পাড়িয়ে দিলেন। হিফায়ত করলেন তাদের ঈমানের।

এই কথাটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, আজ্ঞাহ আমাদের দুআগুলো শোনেন। শুধু আমাদের নয়, যদি কোনো কাফিরও হৃদয়ের গভীর থেকে আকৃতিতে কোনো

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

বলি চায়, দুমিলাবি কোনো কষ্ট, আজ্ঞাহ সুবহানান্ন ওয়া তাআলা তার দুআও পূর্ণ থানে। একজন কাফির, যে আজ্ঞাহকে অঙ্গীকার করেছে কিংবা একজন পুরুষ, যে এই ইস্লামে বিশ্বাস করে বসে আছে, গভীর বিপদের সময় কিংবা গভীর প্রয়াজনের তাপিদে সে যখন হৃদয়ের গভীর বন্দর থেকে আজ্ঞাহর কাছে আজ্ঞাহর জন্য ডাক হাকে, আজ্ঞাহ তার ডাকটি শোনেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ হবে। আজ্ঞাহ যদি একজন কাফিরের, একজন মুশরিকের দুটা করুল করেন, আপনার-আমার দুটা কেন তিনি করুল করবেন না? আমরা তো আজ্ঞাহতে ঈমান রাখি তার ইবাদত করি তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আপনার-আমার চাইতে বেশি করুন তো একজন কাফির কিংবা একজন মুশরিক হতে পারে না। তাদের দুটা যদি করুন তো আমাদের দুআও করুল হবে।।।। তবে কোনো কিছু হওয়ার শর্ত হলো সোটা শুরু করা। আমরা যদি দুআই না করি, আজ্ঞাহর কাছে হওয়ার আশের শর্ত হলো যাওয়া। কসল পেতে হলে তো মাটে বীজ ন-ই চাই, তাহলে কবলের আশা করব কীভাবে? কসল পেতে হলে তো মাটে বীজ বুনতে হবে বীজ না বুনলে খেতে থেকে যেমন আগাছা বাঁচাত কিছু পাওয়া যাবে না, দুটা না করলে জীবনে হতাশা বাঢ়াত আর কিছু লাভ করা সম্ভব না ও হতে পারে।

আমাদের উচিত নয় দুটা করা যাবিয়ে দেওয়া। আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ‘আজ্ঞাহ সুবহানান্ন ওয়া তাআলা অবশ্যই আমার দুটা করুল করবেন। আজ, নয়তো কল। আমার দুটা করুল হতে হ্যাতো একটু সময় লেগে যেতে পারে, তবে এই ‘সময় লেগে যাওয়া’ যেন কোনোভাবেই আমাকে অধৈর্য, অন্যথির এবং আমার দুটা যাওয়া করে দেলে। আমার দুটা আজ্ঞাহ কেন করুল করবেন না যেখানে দুটা বিমুখ না করে দেলে। আমার দুটা আজ্ঞাহ করেছেন? ইবলিস আজ্ঞাহকে তিনি অভিশপ্ত ইবলিস শয়তানের দুটা পর্যন্ত করুল করেছেন? ইবলিস আজ্ঞাহকে বলেছে, ‘আর যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তাহলে অতি অল্পস্থাক ছাড়া তার (আদমের) বংশধরদের অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।’

তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো।<sup>(২)</sup>

[১] কাফিরদের দুটা কর্ম কি ন-। তা নিয়ে মতগৰ্ভিক রয়েছে। তবে অধিকাশে আলিমের মতে

...তবে রক্ষ লাভের দুটা করুল হবে।

আজাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা ইবলিসকেও ফিরিয়ে দেননি। আমরা কেন ক্ষমতা

যে, তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন? নিরাশ করবেন?

[৪] ‘আজাহ দুআ করুল করেন’—এই আশার আনন্দে আমাদের মন হয়তো এখন দূলে  
যে বিশেষ কিছু মুহূর্ত আছে, তা কি আমরা জানি? এমন কিছু মুহূর্ত আমরা হেলে  
পার করে দিই যেগুলো দুআ করুলের কার্যকরী সময়। নবিজি সাজাইয়া আলাই  
ওয়া সাজাম এই সময়গুলোতে আমাদের দেশি বেশি দুআ করতে বলেছে। এই  
সময়ের দুআগুলো আজাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা দ্রুত করুল করে নেন। আমরা কি  
জন্ম না সেই মুহূর্তগুলোর কথা? চুন তবে জেনে নেওয়া যাক—

আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়টুকু : মসজিদ থেকে আযান শেনার পরেও  
আমরা ফোন-কম্পিউটার ছেড়ে উঠি না। ভাবি, ফরয সালাত তো আরও আধা ঘণ্টা  
পরে। আরও কিছুক্ষণ ফেইসবুকিং করি। অথচ আযানের পর থেকে ইকামাতের  
মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে এমন একটি মুহূর্ত বিদ্যমান, যে মুহূর্তে কোনো বৃষ্টি দুআ  
করলে, আজাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা তার দুআ করুল করে নেন।<sup>(১)</sup>

বৃষ্টি হলে : কবি জসীম উদ্দীন লিখেছিলেন—বৃষ্টি হলে তার প্রিয় মানবের কথা  
মনে পড়ে। আমাদের কাছে সবচাইতে প্রিয় কে? আজাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা।  
তাই বৃষ্টি হলে আজাহকে মনে পড়ুক এটাই কাম। বৃষ্টির সময় যদি কেউ দুআ  
যখনই বৃষ্টি দেখব, দুআ করতে আর ভুল করব না।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে : সুবহে সাদিকের ঠিক আগের মুহূর্তটাই রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।  
নবিজি সাজাইয়া আলাইয়ি ওয়া সাজামের হাসিস থেকে আমরা জানতে পারি, আজাহ  
সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পুঁথীর নিকটতম আসমানে এসে  
বলতে থাকেন, ‘কে আছ এখন আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে

[১] সুনানু আবি সাউদ : ৫২১; জামি তিরমিয়ি : ২১২, যাবিসটি সহিত

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

১৭১

লেয়ে কে আজ আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দিয়ে দেবো...<sup>(১)</sup> ফজরের  
তৃতীয় গ্রন্থ মিলিং আগেও দুম থেকে জেগে উঠে আমরা যদি তাহাঙ্গুদ সালাতে আজাহের  
হাত কিছু ইট, নবিজি বললেন আজাহ তা আমাদের অবশ্যই দেবেন।

কেনো সফরে থাকলে : জীবনের অধিকাংশ সফর তথা প্রমাণ করেছেন গান শুনতে  
শুনত, তাই না? অথচ দুআ করুলের জন্য সফর সময়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি  
অবস্থা<sup>(২)</sup> এমন একটি সুযোগ আমরা গান শুনে, অহেতুক কথা বলে, মোবাইলে  
মুভি-নাটিক কিংবা ফেইসবুক স্ক্রল করতে করতে কাটিয়ে দিই।

কেন অনুসূক্ষে দেখতে পেলে : অনুসূক্ষকে দেখতে যাওয়াটা আমাদের নবিজি  
সাজাইয়া আলাইয়ি ওয়া সাজামের একটি হারিয়ে যাওয়া সুযোগ। এতে করে মানবের  
সাথে আমাদের হস্তান্ত বাড়ে। সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। সাথে, এই সময়টা দুআ  
করুলের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কেনো দুਆ করলে তা আজাহ সুবহানাল্ল ওয়া  
তাআলা করুল করে নেন।<sup>(৩)</sup>

[৩]

আমার পুর প্রিয় একটি দুআ আছে। দুআটি খুব ছোট, কিছু তার বিস্তৃতি বিশাল।  
আমার সাক্ষিষ্প এই দুআ ধারণ করে দুনিয়া ও আবিসাতের অনেক বিষয়। আমাদের  
সাক্ষিষ্প এই দুআ ধারণ করে দুনিয়া ও আবিসাতের দরকার, সবকিছুই যেন এই ছোট দুআতেই চেয়ে  
দুনিয়ার চাইসিল। আবিসাতের দরকার, সবকিছুই যেন এই ছোট দুআতেই চেয়ে  
কেনো যায়। তাই দুআটি আমি সর্বদা আওড়াই। যখনই আমার দুআ করার কথা মনে  
আসে, আমার মনে পড়ে যায় এই দুআর কথা। সালাতে, সিজদায়, হাঁটতে, চলতে  
এই দুআ যেন আমার নিত্যসঙ্গীর মতো।

আবাস রায়িয়াজাহু আনহু একবার নবিজি সাজাইয়া আলাইয়ি ওয়া সাজামের কাছে

এসে বললেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন।’

নবিজি বললেন, ‘চাচা, বলুন— আজাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা ইনি আস  
আলকাল আবিয়াহ।

[১] সাহিহ বুখারি : ১২১৭

[২] সাহিহ বুখারি : ১৫৪৮; জামি তিরমিয়ি : ১৯০৫, যাবিসটি সহিত

[৩] সুনানু আবি সাউদ : ১৫২৮; জামি তিরমিয়ি : ১৯০৫

বেলা ফুরাবার আগে

প্রশ্ন হলো, 'ও আজ্ঞাহ! আমি আপনার কাছে আফিয়াহ চাইছি!'

তখন আপনি শুলত আফিয়াহ পেয়ে গেলেন। রোগমুষ্টি এবং স্বাদের উপরি থেকে বেঁচে থাকে, তাহলে আপনি আফিয়াহের কাছে বারাকাহ আসছে? আপনি আফিয়াহ পাচ্ছেন। বারাকাহ আসছে? আয়-উপার্জনে বারাকাহ আসছে? আপনি আফিয়াহ পাচ্ছেন। আপনার সন্তানদের ওপর থেকে বিপদ সরে যাচ্ছে? আপনি আফিয়াহ পাচ্ছেন। এমনকি, আবিরাতে আপনাকে ক্ষমা করা হলে, সেটা ও আসলে আফিয়াহ।

এত ছোট দুর্ভাতে আবাস রাখিয়াছালু আনন্দের মন ভরল না। তিনি ভাবলেন, 'এই দুআ তো খুবই ছোট! আমার তো অনেক বড় দুআ চাই।' অনেক কিছু মেরামে একসাথে চাওয়া যাবে!' তিনি নবিজির কাছে ফিরে এসে বললেন, 'ইয়া বাস্তবায় এটা তো খুব ছোট দুআ! আসলে আমি আরও বড় দুআ চাচ্ছিলাম।'

তার কথা শুনে নবিজি হাসলেন। বললেন, 'গোয়াচা! আপনি আজ্ঞাহের কাছে আফিয়াহ চান। আজ্ঞাহের শপথ! এরচেয়ে ভালো আপনার জন্য আর কিছুই হতে পারে না!'

'আজ্ঞাহুম্মা ইমি আস আলুকাল আফিয়াহ'—খুব ছোট দুআ। অর্থে ধারণ করে আছে আমরা যারা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচতে চাই, আমরা আজ্ঞাহের কাছে আজ্ঞাহুম্মা ইমি আস আলুকাল আফিয়াহ।' সন্তানসন্তির ভালো চেয়ে আজ্ঞাহের কাছে বলতে পারি, 'আজ্ঞাহুম্মা ইমি আস আলুকাল আফিয়াহ।' রোগ থেকে মুক্তি পেতে আজ্ঞাহেকে বলতে পারি, 'আজ্ঞাহুম্মা ইমি আস আলুকাল আফিয়াহ।' আয়-উপার্জনে বারাকাহ পেতে আজ্ঞাহেকে বলতে পারি, 'আজ্ঞাহুম্মা ইমি আস আলুকাল আফিয়াহ।' জাহানামের আগন থেকে বাঁচতে, অনিন্দ্য সুন্দর, মনোরম মনোহর জাহানাতলারে জন্য বলতে পারি, 'আজ্ঞাহুম্মা ইমি আস আলুকাল আফিয়াহ।'

[৮]

এখন আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটার অনুপস্থিতি তা হলো দুআ। দুআ হলো সকল নবি-রাসূলের সুন্মতি। দুআ মানে আজ্ঞাহের কাছে চাওয়া। হাত

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

১৭৩

তুল নিজের অয়েজন আজ্ঞাহেকে খুলে বলা। জীবনে, নিছতে গন্ধুন করে আজ্ঞাহের পাই নিজের সকল চাহিদা, আশা, আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা। জীবনের সকল মুহূর্তে আজ্ঞাহের কাছে দুআ করতে হবে। এমনকি, জীবন যখন অচেল সুখে ভরে উঠবে, তাতে যখন আবকাহে না কোনো দুঃখ-দুর্বলা, হতশা-ঝানি, তখনো আজ্ঞাহের কাছে দুজ করতে হবে, 'ইয়া আজ্ঞাহ, আমার এই সুখকে আপনি দীর্ঘমিত বাস করতে হবে।' বলতে হবে, 'ইয়া আজ্ঞাহ, আমার এই সুখকে আপনি দীর্ঘমিত বাস করতে হবে।' এটাকে আমার জন্য পরীক্ষা বানাবেন না। নিষ্ঠা, আমি খুব দুর্বল এক বল্দা। অপনার পরীক্ষায় উচ্চীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

দুনিয়া আমাদের অনেকে কিছু দরকার। চুলুন সেই দরকারগুলোর একটি তালিকা হবে ফেলি। আজ্ঞাহের কাছে দুনিয়ার কী কী চাই, আবিরাতে কী কী চাই, আমার বাব-মায়ের জন্য কী চাই, আমার ভাই-বেন, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য কী চাই তার একটি পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করি। তালিকা ধরে ধরে আজ্ঞাহের কাছে চাই। আজ্ঞাহেকে পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করি। আজ্ঞাহের কাছে আপনারই ইবাদত করি আর আপনার ধরি, 'ইয়াকা না' বুন্দু ওয়া ইয়াকা নাস্তাজিন, আপনারই ইবাদত করে নেই। কেউ নেই কাছে সাহায্য চাই। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো গুরুত্ব নেই। কেউ নেই যার কাছে কিছু চাওয়া যাব। কেউ নেই যে আমাদের কিছু দিতে পারে। তাই আপনার কাছেই হাত পেতেছি, মালিক। আপনি আমাদের চাওয়াধুলো পূরণ করুন।

—  
—  
—



## চলো বদলাই

[ক]

মকার চারদিকে তখন মৃত্তিপূজার ঘনঘটা। লাত-উয়া আর মানাতের মতো অসংখ্য, অগণিত দেব-দেবীর পূজো-অর্চনা নিয়ে ব্যতিবাস্ত মকার অধিবাসীরা। এই অঙ্গভূটেই তাওহিদের গোড়াপতন করে নিয়েছিলেন পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। স্তৰী হাজেরা আর পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একত্বাদের ইমারত। দীপ্তিকষ্টে ঘোষণা করেছিলেন, ‘আল্লাহ এবং তাঁর কোনো শরিক নেই।’

কিন্তু সময়ের পালাবদলের সাথে সাথে তাওহিদের শোভামণ্ডিত এই ভূমিতে নেমে এলো ধূটঘৃটে অর্ধকাঠ। তাওহিদের মশালে উত্তুসিত এই উর্বর ভূমিতে উদ্দিত হওয়া সূর্যী আস্তে আস্তে মধ্যের আড়ালে চলে গেল। এক সত্য ইলাহকে ছেড়ে মানুষ খুঁজে নিল বহু ইলাহ আর বহু মানুষ। মানুষ ভুলে গেল তার সত্যিকার রবাকে। সেই একত্বাদের বলয় থেকে যখনই মানুষের বিচ্ছিন্ন ঘটেছে, তখনই মানুষ ভুলে বসেছে পৃথিবীতে তার আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য। কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটলেই যেভাবে পতন হয় সুবিশাল নক্ষত্রের, ঠিক সেভাবেই তাওহিদ থেকে দূরে সরে যাওয়াতে মানুষও হয়ে পড়েছে দিশাহীন।

শেকড় ভুলে গেলেও শেকড়ের কিছু চিহ্ন মানুষ অজান্তে বুকের ভেতরে ধারণ করে রাখে। মকার মুশরিকদের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। তারা ভুলে নিয়েছিল একত্বাদের

কিছু নেই একত্বাদের নিশান বয়ে চলা মানুষগুলোর কিছু শৃঙ্খি তাদের অন্তর থেকে বিস্তৃত হয়নি কখনোই। এমন একটা শৃঙ্খি হলো সাফা-মারওয়া পাহাড়ে গোনো। এটা আমাদের একেবারে শেকড়ের কাহিনি।

এর উপত্থক্য তখন কোনো জনবসতি গড়ে ওঠেন। চারদিকে কেবল ধূ-ধূ শুনুন। বালির এই বিশাল প্রস্তরে কোথাও কোনো জনমানুষের চিহ্ন নেই। এন্তে এক সময়ে পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার স্তৰী হাজেরা এবং পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নেথে যান এই উপত্থক্যায়। মাথার ওপর প্রকাণ ধূ, পায়ের নিচে তপ্ত বালু শুধু আর তুরায় শিশু ইসমাইলের প্রাণ তখন ওঠাগত হয়ে আরো সামনে শিশুপুত্রের এমন আর্তনাদ আর আহাজারি নেথে যেন মাতা হাজেরা আলাইহিস সালামের বুক ফেঁটে যায়। ইসমাইলের তুরা নিবারণের জন্য এক পেটা জলের আশায় তিনি দিগ্বিন্দিক ছুটতে থাকেন। এক্ষেত্রে জলের জন্য তিনি মাঝ পর্বত থেকে মারওয়া পর্বতে, মারওয়া পর্বত থেকে সাফা পর্বতে ছুটাছুটি বরাহিলেন সেবিন। যদি মিলে যায় একটো জল! মাতা হাজেরা আলাইহিস সালামের সেবিনকার সেই শৃঙ্খিতে ধরে রাখতে পৰবর্তীতে সাফা-মারওয়া পর্বতে নেভানোকে হজের একটি পৰিব্রীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। এরপর, মকার নেভানোকে হজের একটি পৰিব্রীতিতে সৌজানোত্তীর্ণ হয়ে পড়েন এবং তার উপত্থক্য থেকে তাওহিদ বিলুপ্ত হলো এই রীতিগুলো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে আসে। তারা এক আজ্ঞাহকে ভুলে গেছে ঠিক, কিন্তু বশপরম্পরায় চলে আসা এই রীতিগুলোকে তারা ঠিকই বুকের ভেতরে জায়া নিয়েছিল।

এরকম এক জাহিন্দারাতের মধ্যে নিজেদের জীবন অভিবহিত করেছিল মকার এবং তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষগুলো। জন্মের পর থেকেই তারা উপসন্ধন করে এসেছে নিয়ে ইলাহ, মিথ্যে রাবের। নিজেদের পূর্ণপূর্যদের দেখাদেবি সেই মিথ্যে ইলাহদের বানিয়ে নিয়েছিল জীবনের স্বরক্ষিত। তবে, একত্বাদের বল থেকে বিছাত হয়ে পড়েন এবং তারা আগের মতো যথরীতি সাফা-মারওয়াতে সৌজানোত্তীর্ণ করত। এটাকে তারা মনে করত ইবাদত-বন্দেশির অর্থ। তারা শেকড় ভুলে গেছে, কিন্তু ভুলতে পারেনি শেকড়ের চিহ্নকে। মনের অজ্ঞতে সেটাকে বুকে বয়ে বেড়াছিল মুঢ়ের পর যুগ।

এরপর, মহান রূবের বদলাতামা যখন স্বাক্ষনে আবার তাওহিদের পুনরুখান হলো, যখন তাওহিদ-সহ অবির্ভুব ঘটল মহামানব রাসূল সালামারু আলাইহি প্রয়ো সালামের তখন আবার আস্তে আস্তে মধ্যে প্রাণ কিরে পেতে শুরু করল মৃত মকার নগরী। শকিয়ে যাওয়া প্রতিপন্থের আবার স্বৰূপ হয়ে উঠতে লাগল। যেন মৃত গাণ্ডে কিরে এলো প্রাণের

জোয়ার। সেই ডাক, সেই শুর আর সেই আঙ্গুলে সাড়া দিয়ে চারদিক থেকে দলে দলে দশ মানুষ আবার প্রবেশ করতে লাগল একত্ববাদের বলয়ে। এ যেন দিশেছারা পথিকের দিশা। পথহারা পথিকের পথ আর কৃত্তিহারা নাবিকের কৃত্তি। এই তাজাটে মেন এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে গেল। গতকালকের ডাকাত লোকটা আজকে হয়ে উল্ল সম্পদের আমানতদার। গতকাল যে মানুষটা যিনি আর ব্যভিচারে মজে ছিল, কোনো এক অনন্য স্পর্শে আজ সে আগামোড়া অন্য রকম। তাওবা করে বলেছে সে আর কোনোদিন ও-যুবী হবে না। সে তার কৃতকর্মের জন্য লজিষ্ট। গতকাল রাতে যে লোকটা তার সদাজ্ঞাত কর্ন্যা সন্তানকে জীবন্ত করব দেওয়ার চিন্তা করছিল, কোনো এক বিচিত্র কারণে আজ সে তার কর্ন্যা গলা জড়িয়ে ধরে কান্না করছে। যে পিতার গতকাল হ্বার কথা ছিল হত্যাকারী, আজ সেই পিতা হয়ে গেছে কর্ন্যা পরম অভিভাবক। কেনন সে জিয়নকাঠি, যার অনুপম স্পর্শে রাতারাতি বদলে গেল তারা? সেটা হলো ইসলাম।

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক রায়িয়াজ্জু আনহুর জাহিলিয়াতের এই নিয়মের সাথে পরিচিত ছিলেন। মুক্তি এবং মদিনার মুশরিকরা যে সাফা-মারওয়াতে দোঁড়াড়ি করত এবং এই কাজকে তারা যে ইবাদতের অংশ মনে করত; তা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তিনি। একবার তাকে জিজেস করা হলো, ‘আচ্ছা, আপনি কি সাঁজ করতে ঘৃণা করতেন?’

হজের সময়ে সাফা-মারওয়া পর্বতে দোঁড়াড়ি করাকে সাঁজ বলা হয়। মাতা হাজেরা আলাইহাস সালামের স্থৃতি রক্ষার্থে এই রীতিকে হজকেন্দ্রিক রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আনাস ইবনু মালিক রায়িয়াজ্জু আনহুরকে যখন বলা হলো যে তিনি এই রীতিকে, অর্ধাং সাফা-মারওয়ায় দোঁড়াড়ি করত এবং এই কাজের সাথে সাফা-মারওয়ায় দোঁড়াড়ি করত এবং এই কাজকে তারা যে ইবাদতের অংশ মনে করত; তা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তিনি। একবার তাকে জিজেস করা হলো, ‘আচ্ছা, আপনি কি সাঁজ করতে ঘৃণা করতেন?’—

অবশ্যই সাফা এবং মারওয়া পর্বত দুটো আলাহর নির্দশন সমূহের অন্যাতম। অতএব, তোমাদের কেউ যদি হজ কিংবা উমরা করার ইচ্ছা করে, তাহলে তার জন্য এ দুটোতে (সাফা-মারওয়াতে) তাওয়াফ করাতে দেখের কিছু নেই।।।।

বেলা কুরাবার আনহুর এই কথা থেকে আমরা কয়েকটা বিনামূল ইবনু মালিক রায়িয়াজ্জু আনহুর এই কথা থেকে আমরা নতুন ভোরের পরবর্তী মোস রায়িয়েছেন জীবন, যারা এতদিনকার যাপিতজীবনের সকল পাঠ এবং সুন্দর করেছেন জীবনের নতুন অধ্যাত্মে, তাদের কাছে সাঁজ অর্ধাং সাফা এবং মারওয়া পর্বতে দোঁড়ানোকে বেশ অস্তুত ঠেকল। আজীবনের পরিচিত এবং এই স্থানের পর্যটক তার ঘৃণা করতেন। ভবতেন, ‘আরে! এটা তো জাহিলদের জীবন জাহিলিয়াতের রীতি। আমরা এখন মুসলিম। চিন্তায় আর বিশ্বাসে বিশুল্ব হয়ে আমা কেন জাহিলিয়াতের রীতিনীতি পছন্দ করব?’

বেলা আনাস সাথে সাথে তারা ভুলে গেলেন বাপ-দাদাদের সব রীতিনীতি। ফ্রান্সের অনীতি, পালিত সকল বিবিধানকে রাতারাতি বুড়ো আঙুল ধ্বনিতের অনীতি, পালিত সকল বিবিধানকে রাতারাতি বুরদ কত ভুঁতে তা দেখানোর সাহস যারা দেখাতে পারেন, তাদের দ্বিমানের পারদ কত ভুঁতে তা করাও করা যাব না। এরপর, যখন আলাহ সুবহানাল্ল ওয়া তাআলা কুরআনে জাতাং করে সাফা-মারওয়ায় দোঁড়ানোকে সত্যাগ্রিত করে দিলেন, যখন আলাহ তাআলা বললেন সাফা মারওয়াতে তাওয়াফে দেবের বিছু নেই, তখনই আলাহ তাআলা বললেন সাফা মারওয়াতে শুরু করলেন। এতদিন এই রীতির অবর তারা এই রীতিকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন, আলাহর বিধান বিশুল্বে মধ্যে যে ঘৃণার পাহাড় তারা তৈরি করেছিলেন। এটাই তো প্রেম! এটাই শৈনামারাই সেই ঘৃণার পাহাড় ধূলিসাং হয়ে গেলো। এটাই তো প্রেম! এটাই অনুপম ভালোবাসা!! আলাহর জন্যই ভালোবাসা আর আলাহর জন্যই ঘৃণা করা!

[খ]

ফ্রান্সের ইবনু ইয়ায়। একজন বিশ্বাত তবিয়ি। তার সুনিয়াবিমুহূর্তা এবং পরাহেয়গারি ফ্রান্সের ইবনু ইয়ায়। একজন বিশ্বাত তবিয়ি। তার সুনিয়াবিমুহূর্তা এবং পরাহেয়গারি ফ্রান্সের মুখে মুখে। কিন্তু, একেবারে শুরু জীবনে তিনি মোটেও ধৰ্মত্ব ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাংঘাতিক রকমের একজন ভাকাত। এলাকাবাসী তার ভায়ে সর্বদা তটস্থ থাকত। তাকে সেকজন এটাই ভয় পেত যে, রাতের বেলা মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পর্যন্ত যেতে চাইত না। সকাল হবার জন্য অপেক্ষা করত। ভাবত, রাতে বের হলে নির্ধাত যুদ্ধাইলের খঙ্গে পড়ে সর্বস্ব হ্যাতে হবে।

সেই ফ্রান্সের ইবনু ইয়ায়ের প্রথম জীবনের ঘটনা। তিনি পড়শির একটি সুদৰ্শন মেয়েকে ভালোবাসতেন। একবার তে এই মেয়ের বাড়িতে হানা দেন তিনি। মেয়ের প্রাককাল জন্য দেওয়াল টপকাতে যাবেন, এমন সময় কেখা থেকে মেন তার

কানে একটি সুমধুর শুরু ভেসে আসে। সেই শুরু, সেই যাংকারণ্থনি পাশগলপাৰা  
কৰে দেয় ফুয়াইলেৰ মনকে। তাৰ জীবনে এনে দেয় এক বৈষ্ণবিক পৰিবৰ্তন।  
দুনিয়াৰ মোহে ভুবে থাকা ফুয়াইলেৰ অন্তৰে শুৰু হয় এক মহাসাইফোন। সেই  
সাইফোনে হৃদয়ৰে অলিদে জনে থাকা ধূলোৱালি, মৰাচে পঢ়া বিষ্টিৰ আস্তৰণ  
মুহূৰ্তেই উড়ে চলে যায়। কোন সেই শুরু, যা তছনছ কৰে দিয়েছিল ফুয়াইলেৰ  
পৰিব্ৰজা কুৱানেৰ শুৰু আল হান্দীদেৱ একটি আয়ত যেখনে আজাহ শুবহানাতু ওয়া  
তাআলা বলছেন—

أَنْ يَأْنِ الَّذِينَ آتَيْنَا أَنْ لَخْشَعُ لِوَقْتِهِمْ لِيَكْرِرُ اللَّهُ وَمَا كَنَّا  
بِهِ مُحِلِّيْنَ

যারা ঈমান এনেছে তাৰেৰ হৃদয়ে কি আজাহৰ ঘৰণে এবং যে সত্য নথিল  
হয়েছে তাতে বিগলিত হওয়াৰ সময় হয়নি! [১]

এই আয়ত শোনাৰ সাথে ফুয়াইল বলে উঠলেন, ‘অবশ্যই, হে আমাৰ বৰ,  
মেই সময় উপস্থিত’।

ব্যস, এই একটি আয়ত বদলে দিল ফুয়াইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহৰ জীবন।  
এৰপৰ বাকি জীবনে তিনি আৱ কোনোদিন পাপ কাজেৰ নিকটবৰ্তী হৰনি। পৱেৱ  
জীবনটাকে তিনি সাজিৱে নিয়েছেন মহান আজাহ তাআলার বিধান অনুসৰে।  
আজাহৰ রঙে রাঙ্গিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। তাৰ পৰহেয়াৱি এবং দুনিয়াবিমুখ  
জীবন্যাপনেৰ জন্য তিনি পৰবৰ্তী মানবদেৱ জন্য আদৰ্শে বৃপ্তান্তিত হন। [২]

পাপে ভৱা জীবনে আমৱা যখন মিথ্যাৰ দিকে ধাবিত হই, জোক ঠকাই, তখন  
কি আমাদেৱ একবাৰও মনে পড়ে না যে, এই কাঞ্জগুলো আজাহ শুবহানাতু ওয়া  
তাআলা পঞ্চন কৰেন কি না? একবাৰও মনে হয় না যে, নবিজি সাজালাতু আলাহী  
ওয়া সাজামেৰ অনীত দীনেৰ সাথে আমৱা তামাশা কৰছি? যখন কোনো পাপেৰ  
নিকটবৰ্তী হই, তখন বি মনেৰ মধ্যে একবাৰও আধিৱাতেৰ ভয় এসে দৌঢ়ায়  
না? একটি আয়ত বদলে দিয়েছে ফুয়াইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহৰ গোতা জীবন;

[১] শুরু ধানিদ, আয়ত: ১৬

[২] খন্দটি বৰ্ণিত হয়েছে, তাৰিখ নিম্নলিখিত ধন্ত: ৪৮; পৃষ্ঠা: ৩৮৪; তাৰিখ ধন্মদাস, ধন্ত: ৬, পৃষ্ঠা: ১৪১

এই আমাদেৱ সামনে গোতা কুৱানাটাই বিদ্যমান। নিত্য আমাদেৱ কানে আসে  
হৃদয়দেৱ সুৰ-সুৰি। তথাপি কথনো কি ভোবেছি, এই কুৱান আমাদেৱ হৃদয়ে  
হোলতে পৱাহে না? কেন এই কুৱান আমাদেৱ হৃদয়ে সেভাৰে দাগ  
কৰ্ত না, মেভাৰে দাগ কেচেছিল ফুয়াইল রাহিমাহুল্লাহৰ মনে?

[৩]

পৱেৱে যুৰেৰ সময়। মদিনাৰ ইহুদি গোত্রে বন কুৱাইজা মুসলিমদেৱ সাথে কৃত  
গুৰি ভৱা কৰেছে। মদিনা শহৱৰকে বৰিহাত শত্ৰুৰ হাত থেকে বঢ়া কৰাৰ নিমিত্তে  
মুসলিমদেৱ সাথে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়াই কৰাৰ যে চুক্তি তাৰা কৰেছিল, তা  
থেকে সৱে এসে নিজেদেৱ দুৰ্গ বসে আছে। এই ঘটনা মুসলিম শিবিৰে ব্যাপক  
ক্ষেত্ৰে জন্ম দেয়। নবিজি সাজালাতু আলাহী ওয়া সাজামেৰ নিৰ্দেশে সাহৰি আৰু  
বুৰাবা বনু কুৱাইজা গোত্রেৰ কাছে দেলেন। বনু কুৱাইজা গোত্র চৰিত্বজা এবং  
তাৰ ফলে আসন্ন শাস্তি নিয়ে বেশ ভৱতসুস্কৃত। তাৰা বারবাৰ আৰু শুবহানৰ কাছে  
জানতে চাচ্ছে, ‘হে আৰু লুবাবা! আমৱা যদি দুৰ্গ থেকে বেৰ হই, তুমি কি জানো  
আমাদেৱ কী শাস্তি হতে পাৱে?’

বাববাৰ তাৰেৰ এমন জিজ্ঞাসাৰ মুখ্যামুখি হয়ে আৰু লুবাবা শেষ পৰ্যন্ত ইশাৱৰ  
কিছু একটা বলে বসেলেন। তিনি তাৰ হাত দিয়ে গলায় ছুৱি চালানোৰ ভঙ্গি কৰে  
বেৰাতে চাইলেন যে, ‘শাস্তি হিসেবে তোমাদেৱ হচ্ছা কৰা হবে। তাই তোমোৱা  
দুৰ্গৰ বাহিৰে এসো না।’ এই কাজটা কৰে আৰু লুবাবা শুৰূত্বে আল্লাহৰ হয়ে পঢ়ালেন।  
তিনি বুঝাতে পারলেন, তিনি আজাহ ও তাৰ রাসূলৰ বিবৃত্তচৰণ কৰে দেলেছেন।  
তাৰেৰ আমানত নষ্ট কৰেছেন। মুসলিমদেৱ পক্ষ থেকে এসে মুসলিমদেৱ ব্যাপকে  
তিনি বনু কুৱাইজা গোত্রকে সাবধান কৰছিলেন; অখ্য এটা আজাহ ও তাৰ রাসূলৰ  
আমানতেৰ বিজ্ঞানত। তিনি ভাবলেন, নিজ থেকে এই কথা বলে তিনি বৰ ধৰনেৰ  
পাপ কৰে দেলেছেন, যে পাপেৰ কোনো ক্ষমা নাই। তিনি সৌভে বনু কুৱাইজাৰ দুৰ্গ  
থেকে বেৰ হয়ে মহিজিদে নৰাবিতে এসে থামলেন। মহিজিদে নৰাবিৰ একটা খুঁটিকে  
জড়িয়ে ধৰে কৰাতে শুৰু কৰলেন আৰু বলতে লাগলেন, ‘আমি গুৰুত্বৰ পাপ কৰে  
কৰলে আমি এই অবশ্য থেকে নিজেকে কোনোভাৱেই মুক্ত কৰিব না।’

এভাবে সাত দিন তিনি এই খুঁটি জড়িয়ে কেঁদেছিলেন। কেবল যাওয়া আর সালাতের সময়গুলো বাস্তীত যাকি স্বচ্ছ সময় তিনি এই খুঁটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন আর বলতেন, ‘আমি পাপ করে ফেলেছি। আমি মহাপাপ করে ফেলেছি। আলাহ আমাকে ক্ষমা না করলে আমি এই অবস্থা থেকে নিজেকে কোনোভাবেই মুক্ত করব না।’ পরে আলাহ সুবাহান্তু ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করেন এবং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি কুরআনের আয়াতও নাফিল করেন।<sup>[১]</sup>

কেবল একটা ইশারা। এই ইশারা করেই সাহাবি আবু লুবাবা রাযিয়াজ্জু আনন্দুর মনে হলো যে, তিনি বিরাট কোনো পাপ করে ফেলেছেন। এরপর সেই পাপ থেকে বাঁচতে সাত সাতটা দিন নিজেকে খুঁটির সাথে জড়িয়ে রেখেছেন আর ক্ষমাপ্রার্থনা করে কেঁদেছিলেন। সাহাবি আবু লুবাবা মতন এমন সতর্ক হন্দন কি আমাদের আছে? আমরা কি আলাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার পরে এভাবে তায়ে শিউরে উঠি? অথির হয়ে যাই? নত হই? ফিরে আসি? একটা পাপের গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাহাবি আবু লুবাবা রাযিয়াজ্জু আনন্দুর মধ্যে যে আকৃততা, সেই আকৃততা কি আমাদের মাঝে আছে আন্দোলনে?

## [৪]

এতিহাসিক তৃষ্ণাতর যুদ্ধের কথা। পারসিকদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের লড়াই। প্রতিটা মুহূর্ত কঠিতে চরম নাভিকাণ্ডের সাথে। জ্য-পরাজয় আর মৃত্যুর হাতছানি বারবার উঁকি দিচ্ছে পারসিক আর মুসলিম উভয় শিবিরে। রাতভর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধের ফলাফল এলো। সুর্যোদয়ের ঠিক একটু পরেই। অবশেষে মুসলিমরা পারসিকদের ওপর বিজয়ী হলো। তবে, সেনাদের ফজরের সালাত ছুটে গেল সকল মুসলিম সেনাদের। যুদ্ধের প্রচণ্ড দামামার মাঝে কারও একটু ফুরসত মেলেনি ফজর আদায়ের।

অন্য অনেকের মতো আনাস রাযিয়াজ্জু আনন্দুরও সেদিন ফজরের সালাত কায় হয়ে যায়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে তিনি পাণী সাব্যস্ত হবেন না। গুনাহগার হবেন না। যুদ্ধকালীন অবস্থার অপারাগতার জন্য তাদের ছাড় দেয় ইসলামি শরিয়ত। তবু সেনাদের ফজর সালাত ছুটে যাওয়ার বাথা সারা জীবনেও আর ভুলতে পারেননি সাহাবি আনাস রাযিয়াজ্জু আনন্দু। যখনই তার তৃষ্ণাতর যুদ্ধের কথা মনে পড়ত,

প্রাইতি তিনি অবোরে কাঁদতে শুরু করতেন। তার মুখে প্রাইতি শোনা যেত, ‘তোমরা গুরুত্ব দৃষ্টির বিজয়ের কথা বলছ? এ তো নস্য! আমার যে সেদিন ফজরের সালাতটু ছুটে গিয়েছিল। এই সালাতের বিনিময়ে যদি উপহার হিশেবে পুরো পুরীটি আমর সামনে উপস্থিত করা হয়, তবু আমি তা পছন্দ করব না।’<sup>[২]</sup>

কেবল এক ওয়াক্ত সালাত কায় হয়েছিল! তা-ও শরিয়তের দৃষ্টিতে সেই ছাড় জন্য ব্যবহৃত হলো। তারপরও এক ওয়াক্ত সালাত কায় হয়ে যাওয়ায় আনাস রাযিয়াজ্জু আনন্দুর মনের যে অবস্থা, হয়ে যে হাতাকার, ছুটে যাওয়া এক ওয়াক্ত সালাতের বিনিময়ে তিনি যে পুরো দুনিয়াটিকেও তুচ্ছ ভাবছেন, তার এমন ভাব হেবে আমরা কী খিতে পারি? আমরা শিখতে পারি, দীনের বুনিয়াদি বিকাশের বাধারে কীভাবে তৎপর হতে হয়। দীনের প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের জন্য আনাস রাযিয়াজ্জু আনন্দুর মনের গুরুত্বে যে ব্যকুলতা, সেই ব্যকুলতা আমাদের আনাস রাযিয়াজ্জু আনন্দুর মনের গুরুত্বে দিয়েছি তার বি কেনো আছে কি? জীবনে কৃত হাজার ওয়াক্ত সালাত আমরা ছেড়ে দিয়েছি তার বি কেনো হিশেবে আছে? এই যে হিসেবেইনভাবে সালাত কায় করেই যাইছি রোজ, এর জন্মে আমাদের অস্তরের কোথাও কি একটু অনুশোচনা জাগে? কখনো কি একবার আমরা সাহাবি আনাস রাযিয়াজ্জু আনন্দুর মতো করে ভাবতে পেরেছি? আনাস রাযিয়াজ্জু আনন্দু কেবল এক বুরতে পেরেছি? ছুট করে কাঁদতে পেরেছি? নেওয়া আনন্দু দুনিয়ার জন্য উপস্থিত সালাতের জন্য দুনিয়াটিকেই তুচ্ছ ভোবেছিলেন, আর আমরা দুনিয়ার জন্য নিতানিকার সালাতগুলোকে তুচ্ছ ভোবে দিন কঠাই।

## [৫]

মুহাবিরা রাযিয়াজ্জু আনন্দু, এবং রোমকদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। একগৰ্য্যে উভয় দলের মধ্যে একটি সৰ্ব হয় যে, তারা আপাতত যুদ্ধ বিরতিতে যাবে। সব্দিলও একটা নির্বিট সময়সীমা নির্ধারণ করা হলো। তবে মুহাবিরা রাযিয়াজ্জু আনন্দু সব্দিলে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রোমক সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। উদেশ্য ছিল, সব্দির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বসূর্য নেওয়া আনন্দু তাদের পরামর্শ পঢ়া। এতে করে রোমকরা পুনরাবৃত্ত পূর্বসূর্য নেওয়া আনন্দু তাদের পরামর্শ করে ফেলা যাবে। তারা কলনাও করতে পারবে না যে, মুসলিম সৈন্যরা রোমক সীমান্তে পর এত দুর আক্রমণ করে বসবে। তা-ই হলো। মুসলিম সৈন্যরা রোমক সীমান্তে

পুরো খত: ৭; পৃষ্ঠা: ১০৯; আর অন্যান্যের ক্ষেত্রে হিন্দু সম., খত: ৫; পৃষ্ঠা: ৩৩৩

গিয়ে অবস্থান নিল এবং সধির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ামাত্রাই তারা অপ্রস্তুত রোমকদের পিছু হটতে শুরু করল। মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু আনহু বিজয়ের আশা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন।

মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু আনহুকে সামনে অগ্রসর হতে দেখে পেছন থেকে একজন সেক ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে তার সামনে চলে এলো। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘আলাই আকবার! আজ্জাহু আকবার! মুসলিমদের আদর্শ হলো অঙ্গীকার রক্ষা করা, অঙ্গীকার ভজ্জ করা নয়।’

নিকটবর্তী হওয়ার পর দেখা গেল ইনি হলেন সাহাবি আমর ইবনু আবাসা রায়িয়াজ্জাহু আনহু। তাকে কথাগুলো বলতে দেখে মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু আনহু বললেন, ‘আমরা তো অঙ্গীকার ভজ্জ করিনি। নিদিন সময়সীমা পার হওয়ার পরে আক্রমণ করেছি।’ তখন আমর ইবনু আবাসা রায়িয়াজ্জাহু আনহু বললেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করে, তাহলে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিংবা স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া পর্যন্ত সে অঙ্গীকার ওই ব্যক্তি খুলবেও না, বাধবেও না। অর্থাৎ অঙ্গীকারবিবোধী কোনো কাজ সে করবে না।’<sup>[১]</sup>

আমর ইবনু আবাসা রায়িয়াজ্জাহু আনহু এই হাদিস দ্বারা মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু আনহুকে অবরুণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, কোনো জাতির সাথে কৃত অঙ্গীকার স্পষ্টভূপে বাতিলের ঘোষণা দেওয়া ব্যক্তিক উচ্চ জাতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া যাবে না। সুরু তো আরও অনেক পরের ব্যাপার। মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু আনহু যেভাবে রোমকদের অতর্কিত আক্রমণ করে বসেছেন তা শরিয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়।

মুসলিম বাহিনী একেবারে বিজয়ের দোরগোড়ায়। বিশাল শক্তিবহরের রোমক বাহিনীকে তারা প্রায় পরাস্ত করেই ফেলেছে। এমন সময় সেখানে একজন সাহাবি এসে জানালেন ভিন্ন কথা। ফিরে যেতে হবে মুসলিমদের, কারণ শেষোক্ত এই আক্রমণ শরিয়ত মোতাবেক বৈধ নয়। দলিল হিশেবে তিনি উপস্থিত করেছেন কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটিমাত্র হাদিস।

[১] তাফসিলে ইবনু কাসিম, সুরা নাহলের ৯২ম আয়াতের তাফসিল জার্টিবা

বিজয়ে রায়িয়াজ্জাহু আনহুর সামনে দুটো পথ। হয় তিনি আমর ইবনু আবাসা নিম্নের কথাকে অঙ্গীয় করে যুক্ত চালিয়ে যাবেন এবং বিজয় লাভ করে নিম্ন করবল রোমকদের দুর্গ। নয়ত তিনি একেবারে বিজয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে প্রবেশ করে আসবেন। তার ঝুলিতে থাকবে না কোনো প্রাপ্তি। বিজয়ের সকল প্রয়োজন তেজে দিয়ে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে বিফল মনোরথে। এবিং আমরা মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু আনহুর জয়গায় যদি প্রবেশ কর্তৃতোক্ত থেকে চিন্তা করি, মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু আনহুর জয়গায় কেলে প্রবেশ করতে হতেন, কেন পথে অগ্রসর হতেন তিনি? যুক্তির অবশ্যাঙ্গীয় বিজয় কেলে প্রবেশ করতে হতেন কেন? কিন্তু মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু যেখানে হোক নিম্ন প্রাপ্তির মালা? কথনেই নয়। কিন্তু মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু যেখানে হোক নিম্ন প্রাপ্তির মালা? কথনেই নয়। কিন্তু মুয়াবিয়া রায়িয়াজ্জাহু আনহু আলিম থেকে তিনি সকল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আন্তু যাই করলেন। বিজয়ের অলিম্প থেকে তিনি সকল সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য করে। এলে ধূল কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে। একে যুক্তে জয়লাভের পৌরব, বিজয়ের ফলে অর্জিত হতে যাওয়া সকল সংজ্ঞা প্রক্রিয়া কর্তৃক তিনি বিসর্জন দিয়ে দেন কেবল আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করবেন বলে।

কেল একটি হাদিস, একটি বাণী তাদের যুক্তজয়ের এ রকম চরম মহুর্ত থেকেও ফিরিয়ে আন্ত প্রেরণে। আমদের সামনে তো গোটা কুরআন, হাদিস পড়ে আছে। আমরা জানি, কুরআন আমদের বিনার কাছে মেঘতে নিষেধ করে, সূন-সূন থেকে নিষেধ করে। সুন, কুরআন আমদের বিনার কাছে মেঘতে নিষেধ করে। সে হিশেবে বাঁচতে বলে। সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে বলে, যাকাত আদায় করাতে বলে। সে হিশেবে বাঁচতে পারি। তবু কি নবিজি স্মার্থতে আমরা আমদের জীবন পঠনের পুরুনুষ চিত্র দেখতে পারি না। যে ইসলাম, যে আমরা এ সকল পাপ থেকে নিজেদের নিষ্পত্ত করাতে পারি না। যে ইসলাম, একই কুরআন, একই রাসুল তাদের জন্যও তবুও কী বিশাল পর্যবেক্ষণ তাদের আর আমদের দ্বামনের মাঝে!

[৩]

গিয়ে অবস্থান নিল এবং সন্ধির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ামাত্রই তারা অপ্রস্তুত গোমকদের ওপর বাঁপিয়ে পড়ল। গোমকারও আর পেনে টেল না মুসলিমদের সাথে। তারা শিক্ষ হটতে শুরু করল। মুয়াবিয়া রাখিয়াজ্জাহু আনহু বিজয়ের আশা নিয়ে সামনে অঙ্গসর হতে লাগলেন।

মুয়াবিয়া রাখিয়াজ্জাহু আনহুকে সামনে অঙ্গসর হতে দেখে পেছন থেকে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে তার সামনে চলে এলো। সে চিংকার করে বলতে লাগল, ‘আজ্জাহু আকবার! আজ্জাহু আকবার! মুসলিমদের আদর্শ হলো অঙ্গীকার রক্ষা করা, অঙ্গীকার ভজা করা নয়।’

নিকটবর্তী হওয়ার পর দেখা গেল ইনি হলেন সাহাবি আমর ইবনু আবাসা রাখিয়াজ্জাহু আনহু। তাকে কথাগুলো বলতে দেখে মুয়াবিয়া রাখিয়াজ্জাহু আনহু বললেন, ‘আমরা তো অঙ্গীকার ভজা করিনি। নিশ্চিত সময়সীমা পার হওয়ার পরে আক্রমণ করেছি।’ তখন আমর ইবনু আবাসা রাখিয়াজ্জাহু আনহু বললেন, ‘আমি রাখিয়াজ্জাহু সাজামাকে আলাইহি ওয়া সালামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘বে বাস্তি কোনো জাতির সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করে, তাহলে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিংবা প্রটভাবে অঙ্গীকার শেষ হওয়ার সোবায় দেওয়া পর্যন্ত সে অঙ্গীকার ওই বাস্তি খুলবেণো না, বাঁধবেণো না। অর্থাৎ অঙ্গীকারবিবেৰণী কোনো কাজ সে করবে না।’<sup>[১]</sup>

আমর ইবনু আবাসা রাখিয়াজ্জাহু আনহু এই হাদিস দ্বারা মুয়াবিয়া রাখিয়াজ্জাহু আনহুকে শংবর করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, কোনো জাতির সাথে কৃত অঙ্গীকার প্রটভূপে বাতিলের ঘোষণা দেওয়া বাতীত উন্ত জুতির বিবৃত্তে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া যাবে না। যুদ্ধ তো আম ও অনেক পরের ব্যাপার। মুয়াবিয়া রাখিয়াজ্জাহু আনহু যেভাবে গোমকদের অতর্কিত আক্রমণ করে বসেছেন তা শরিয়তের মানদণ্ডে উল্টোর্ণ নয়।

মুসলিম বাহিনী একেবারে বিজয়ের দেরগোড়ায়। বিশাল শক্তিবহনের গোমক বাহিনীকে তারা প্রায় পরাস্ত করেই ফেলেছে। এমন সময় সেখানে একজন সাহাবি এসে জানালেন ভিন্ন কথা। ফিরে যেতে হবে মুসলিমদের, কারণ শেয়োক্ত এই আক্রমণ শরিয়ত মোতাবেক বৈধ নয়। দলিল হিশেবে তিনি উপস্থিত করেছেন কেবল নবিজি সাজামাক আলাইহি ওয়া সালামের একটিমাত্র হাদিস।

[১] তাফসিলে ইবনু কাসিম, সুরা নাহলের ৯২ নং আয়াতের তাফসিল স্বীকৃত।

মুয়াবিয়া রাখিয়াজ্জাহু আনহুর সামনে দুটো পথ। হয় তিনি আমর ইবনু আবাসা রাখিয়াজ্জাহু কথাকে অঙ্গাহ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং বিজয় লাভ করে গুল করবেন গোমকদের দুর্গ। নয়ত তিনি একেবারে বিজয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে বিছুরে ক্ষেত্র অস্বীকৃত আসবেন। তার ঝুলিতে থাকবে না কোনো প্রাণি। বিজয়ের সকল প্রয়োজন ভেঙ্গে দিয়ে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে বিফল মনেরথে। যদি আমরা মুন্তাবি পৃষ্ঠিকোণ থেকে চিত্তা করি, মুয়াবিয়া রাখিয়াজ্জাহু আনহুর জায়গায় যদি গুলকেউ হাতন, কোন পথে অঙ্গসর হাতন তিনি? যুদ্ধের অবশ্যাঙ্গী বিজয় ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হাতন, নিতেন পরাজয়ের মালা? কখনেই নয়। কিন্তু মুয়াবিয়া রাখিয়াজ্জাহু থেকে হেবে নিতেন পরাজয়ের মালা? কখনেই নয়। কিন্তু আনহু তাই করবেন। বিজয়ের অলিন্দ থেকে তিনি সকল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আনহু তাই করবেন। বিজয়ের অলিন্দ থেকে তিনি সকল সৈন্যবাহিনী নিশ্চিত বিজয় নিবিজির কেবল একটি হাদিস তাকে ফিরিয়ে এনেছে সম্মুখ সমারের নিশ্চিত বিজয় নিবিজির কেবল একটি হাদিস তাকে ফিরিয়ে এনেছে সম্মুখ সমারের আনুগত্য করে। যুদ্ধ জয়লাভের পৌরোব, বিজয়ের ফলে অর্জিত হতে যাওয়া সকল সুজ্ঞাবা থেকে। যুদ্ধ জয়লাভের পৌরোব, বিজয়ের ফলে অর্জিত হতে যাওয়া সাজামের আনুগত্য করবেন বলে। অর্জিতে তিনি বিসর্জন দিয়ে দেন কেবল আলাহর রাসুলের আনুগত্য করবেন বলে।

[৩]

বর্তমান সময়টা আহিলিয়াতের সেই সময়ের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। চারদিকে কত রং-বেরাতের ছিতনা। নানান রকম ফাঁদ আর বিচিত্র সব চোরাবলির সমারোহ। একটু পা ফসকালেই ভুলে যেতে হবে অথে ফিতনার অতল গহৰে। পৃথিবী তার সমস্ত আয়োজন নিয়ে বনে আছে আমাদের বিভাস্ত, উদ্ভাস্ত আর গায়িল করার জন্য। আমাদের চিরশত্রু ইবলিস শহতানের বৃপ্তও এসেছে বাহির পরিবর্তন। সে এখন নানান রকম দেশে উপস্থিত হয় আমাদের কাছে। কখনো বৃশ বেশে, কখনো-বা পরামর্শদাতা হিশেবে।

দুনিয়ায় প্রাণ্ড বড় একটি নিআমত হলো মুসলিম হিশেবে জন্মগ্রহণ করা। কিন্তু এই নিআমত তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন আমরা এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারব। অবধাতার লিঙ্গ থাকি? আমার জন্য নামিল হওয়া জীবনবিধান অনুসারে জীবন যদি না-ই সাজাতে পারি, কী মূল্য আছে তবে এই মুসলমানিত্বের? আমি কুরআন পেয়েছি, হাদিস পেয়েছি, কিন্তু আমি কি আনাস ইবনু মালিকের মতো হয়ে উঠতে পেরেছি? আমি কি পেরেছি আমার জাহিলিয়াত থেকে পুরোপুরি উঠে আসতে? আমি কি পেরেছি আমার জাহিলিয়াতের কর্মকাণ্ডে ঘৃণা করতে? আমি মুসলিম, কিন্তু আমার জীবনে কি ফুয়াইল ইবনু ইয়ায় রাহিমান্নাহর মতন কুরআনের প্রভাব আছে কোনো? কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে কি গভীরভাবে ভাবার এবং জীবনে বাস্তবায়ন করার সময় আমার কথনো হয়েছে? প্রতিদিন আমি তিলাওয়াত করি, ইহদিনাস পিরাতাল মুস্তাকীম—আমাদের সরলপথে পরিচালিত করুন। অথচ মসজিদ থেকে বের হলেই আমি আবার পাপের মধ্যে ডুবে যাই। ফিরে যাই আমার চির-পরিচিত সেই নাটক, সিনেমা আর আচ্ছাপ্রবর্ষনার জগতে।

ভাবছেন, এসব আবার জাহিলিয়াত কীভাবে হয়? আদতে আমরা তো পুরোপুরি জাহিলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছি। মোবাইল আর কম্পিউটারের ব্রাউজার হিস্টোরি যেগুলোকে আমরা এক ক্লিকে মুছে ফেলি, সেগুলোই তো আমাদের জাহিলিয়াতের প্রমাণ। কত নিবিধ, অশুধ এবং অজীৱ সাইটেই আমরা ঘোরাফেরা করি রোজ। ঘৃণের আধুনিকতা প্রতিতাপঘাতীকে আমাদের হাতের মুঠোয় পুরে দিয়েছে। সেই নিবিধ পৌরীর নিয়মিত খন্দের আমরা। এই যে ভার্যাল নিলা আর ব্যতিচারের মধ্যে আমাদের দু-চোখ আর দু-হাত ডুবিয়ে রেখেছি, এটা জাহিলিয়াতের চেয়ে কম কীসে?

আমরা জনি, মিথ্যে বলা গুনাহের কাজ। এই নির্জনা সত্ত্বা জ্ঞেনেও আমরা উঠতে-বসতে মিথ্যে কথা বলি। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, জোক ঠকানো, প্রতারণা করা, বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়া, হারাম রিলেশনশিপে জড়িয়ে থাকা—ইত্যাদি নানারকম জাহিলিয়াতে নিমগ্ন আমরা। কখনো কি এই জাহিলিয়াতগুলোকে আমরা মন থেকে ঘৃণা করেছি বা করার চেষ্টা করেছি আনাস ইবনু মালিক রায়িয়ান্নাহ আনহুর মতো?

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারে কতই-না উদাসীন আমরা! অথচ আল্লাহ সুবহানান্ন ওয়া তাআলা এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে আমাদের জন্য ফরয করেছেন। ফরয মানে অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য পালনীয়। বাতাস থেকে অঙ্গীজেন প্রাণ এবং বাতাসে

কৰ্বন-ভাই অঙ্গীজ ছাড়ার মতোই জরুরি। অঙ্গীজেন প্রাণ আর কৰ্বন-ভাই গ্রাহিত ত্যাগ করতে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব যেমন সংকটে পড়ে যায়, প্রতি সেতাবে সালাত আদায় না করলে আমাদের মুসলমানিত্বও সংকটে পড়ে যায়। অঙ্গীজেন সংকটে পড়ে যাওয়া মুসুরু রোগীটা যেভাবে হাসপাতালে ছুটে আসে অঙ্গীজের ঘাঁটি পুরণের জন্য, মুসলমানিত্বের সংকটে পড়ে যাওয়া কোনো ঘাঁটি কি সেতাবে মসজিদে ছুটে আসে? আসে না। কারণ, অঙ্গীজেন সংকটের ঘাঁপারটা দৈহিক আর মুসলমানিত্বের ঘাঁপাটা আঘাত। আমরা আমাদের শপীর নিয়ে ঘট্টা উরিগ আর চিন্তিত, আঢ়া নিয়ে ততটাই ভাবলেশহীন।

এই সংকট আর দুরবস্থা থেকে বাঁচতে হলে আমাদের বদলাতে হবে। বদলাতে হবে ফুয়াইল ইবনু ইয়ায় রাহিমান্নাহর মতন—গাতরতি, মুহূর্তেই। আনাস ইবনু ইয়ায় রাহিমান্নাহ আনহুর মতো জাহিলিয়াতকে ঘৃণা করতে হবে। সবার আগে মালিক রায়িয়ান্নাহ আনহুর মতো জাহিলিয়াতকে ঘৃণা করতে হবে। আমাদের হতে হবে সাহাবি আবু লুবাব রায়িয়ান্নাহ আনহুর মতন। যদি মনে হয় আমার দ্বারা অন্যায় হয়ে গেছে, পাপ কাজ হয়ে গেছে, মুহূর্তকাল না ভোঝেই তাওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে, মুহূর্তকাল না ভোঝেই তাওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে, মুহূর্তকাল না ভোঝেই তাওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে, মুহূর্তকাল না ভোঝেই তাওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে, মুহূর্তকাল না ভোঝেই তাওবা করতে হবে।

আমার কী করার কথা ছিল আর আমি কী করছি—এই ফর্মুলাতে নিজেকে কলনা করে যদি আমরা আমাদের কর্মশক্তি নির্ধারণ করতে পারি, তাহলেই আমরা এই জাহিলিয়াত থেকে আমাদের উন্নত করতে পারি, ইন শা আল্লাহ আমরা যে গান শুনি আর রাতভর মুভি দেখি, এই কাজ কি আল্লাহ সুবহানান্ন ওয়া তাআলা পছন্দ করেন? অনুমোদন করেন? যদি উভয় ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে সেগুলো থাকুক। আর যদি ‘না’ হয়, তাহলে এক্সুনি, এই মুহূর্ত মোবাইল আর কম্পিউটারের প্রতিটি ফোন্টের থাক সবগুলো গান আর মুভি এক ক্লিকে ‘অল ডিলেট’ করে দিই। আমার ফোনের গ্যালারিতে থাকা আমার বাধ্যবৰ্তীর ছবিগুলো দেখার অনুমতি কি আমার ধর্ম আমাকে দিয়েছে? যদি উভয় ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে সমস্যা নেই। আর উভয় যদি ‘না’ হয়, তাহলে আমার কি উচিত নয় এই মুহূর্তেই সেগুলো ডিলেট করে দেওয়া?

রিলেশনশিপের ব্যাপারটা ভাবা যাক। যার সাথে দিনে রাতে আমি ভালোবাসা আদনপ্রদান করছি, রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি, পার্কে হাত ধরাধরি করে দুরছি, বিবাহ-বিহীন একটা সম্পর্কে জড়িয়ে যাকে আমি জানু, মহলা, তিয়া আর সোনাপাখি সঙ্গেধন করে যাচ্ছি রোজ—এই কাজ কি আমার জন্য আদো হালাল? আদো কি আমার ধর্ম এটা সমর্থন করে? আদো কি একজন মুসলিম এভাবে বিবাহ-বিহীন সম্পর্কে জড়িতে পারে? যদি উভর ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে এটা চলমান থাকুক। আব, উভর যদি ‘না’ হয়, তাহলে আমার কি উচিত নয় আজকেই এসব ছেড়ে দেওয়া? তাও করা? আজ্ঞাহর কাছে পূর্বের সকল কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া?

এভাবেই, রাস্তায় যখন কোনো বেগানা নারীর দিকে নজর চলে যাবে, তার দিকে ড্যাবডাব চোখে তাকানোর আগে আমাদের ভাবতে হবে, ‘এই কাজ কি মুসলিম হিশেবে আমার পক্ষে সাজে?’

যখন মুখ দিয়ে মিথো কথা বেরিয়ে আসতে চাইবে, আমাদের ভাবতে হবে, ‘আমি তো মুসলিম। আমি কি মিথো বলতে পারি?’

যখন কোনো রিকশাওয়ালাকে ধমকাতে যাব, তার আগে ভাবা উচিত, ‘এই আচরণ কি আমার সাথে যায়?’

যখন কোনো লোককে ঠকাতে যাব, তখন ভাবব, ‘মুসলিম হয়ে আমি কি এটা করতে পারি?’

প্রতিটি কাজের আগে আমরা যদি নিজেকে একবার প্রশ্ন করতে পারি, তাহলেই অনেক সমস্যা, অনেক সংকট থেকে সহজেই আমরা বেরিয়ে আসতে পারব। আমাদের সংকল্প হতে হবে আমার ইবন মালিক রায়িয়াজ্জুল আনন্দুর মতোই। জাহিলিয়াত যতই সুন্দর, মনোহর আর আকর্ষণীয় হোক না কেন, যদি তা আমার আজ্ঞাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্মোদন না করেন, তাহলে সেটাকে আমরা মনেপ্রাপ্তে ঘৃণা করব। আমাদের জীবন গঠন করাতে হবে ফুয়াইল ইবনু ইয়ায় রাহিমান্দ্বার মতন; আজ্ঞাহর মতন; কেন্দ্র থেকে সামান্যতম বিচ্ছিন্ন ও যেন আমাদের অস্থির করে তোলে। আজ্ঞাহর কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুন্যা যেন তড়পাতে থাকে অবিবাদ।

জ্ঞানজ্ঞনের কথা বলতে গিয়ে সক্রেটিস বলেছিলেন, Know Thyself. মানে জ্ঞানের কাছে আনো। তিনি মানে করতেন, নিজেকে জানতে পারলেই জগৎকে জ্ঞান, সহজ হয়ে যায়। পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। Change Yourself: নিজেকে পরিবর্তন করলেই আশেপাশে পরিবর্তন করা সহজ হয়ে যায়। মৃত্যু, চলো বদলাই।



একুশে প্ৰথমেলা ২০২০ উপলক্ষ্মে

## সম্বৰ্কালীন প্ৰকাশন-এৱে প্ৰকাশিত প্ৰথমমূহৰ

## শ্ৰেষ্ঠ কথা

জীবন ক্ষয়িয়া। বৰফ যেমন গলতে গলতে একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, আমাদেৱ কেঠায় নেমে আসে। আছা, নষ্টৰ এই জীবনটা কি নিছক ভোগ আৱ প্ৰাণিৰ মাঝেই কেটে যাবে? নিজেকে বদলে ফেলাৰ উদাহৰণ আহুন প্ৰতিদিন পাঁচবাৰ করে মিলাবেৰ চূড়া থেকে ভেনে আসে আমাদেৱ কাবে। তবু আমৰা তাৰলেশ্বৰী। যে অনন্ত জীবনেৰ সোপান পানে আমাদেৱ দৃষ্টি, যে অনিঃশেষ সময়েৰ হোৱাতে অৰ্পণাহনেৰ সাথ আমাদেৱ হৃদয়কোণে, তাকে পূৰ্ণমাত্ৰা দিতে আৰমা কি আৱেকৰাৰ ছুটে আসব না সেই আলোৱা ফোয়াৱাৰ দিকে, যে ফোয়াৱা উৎসাহিত হয়েছিল হৈৱা গুহা থেকে? যে আলোতে ভৱে উঠেছিল অৰ্পণকাৰ পৃথিবী, সেই আলোতে জীবন রাঙাতে আমৰা কি আৱ এক পা এগিয়ে যেতে পাৰি না?

জীবনেৰ বেলা ফুৱাৰ আগে, চলুন তবে প্ৰত্যাৰ্থন কৰি। নিজেকে আবিষ্কাৰ কৰি নতুন আৱেক পৃথিবীতে...

ক্রমিক	বইয়েৰ নাম	লেখক/সংকলক
০১	বেলা ফুৱাৰ আগে	আবিষ্কাৰ্জন
০২	ফেৰা-২	বিনতু আদিল
০৩	শিকড়েৰ সৰ্বামে	হামিদা মুবারেকা
০৪	হৃদয় জগাই জন্য	ইয়াদানিৰ মুজাহিদ
০৫	জীবন যদি হতো নাড়ী সাহাবিৰ মতো	ড. হামান লালীন
০৬	বাবেৰ বাবিৰে	শৰীফ আবু হায়াত অপু
০৭	কাজীৰ মাধ্যে বৰেৰ খোজে	আবিষ্কাৰ্জন আবেদীন সাওৰা
০৮	সুখেৰ নাটকি	আকুলোজি হাসান
০৯	ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুমাহ	আবুল হাসানাত
১০	ইমাম শাফীৰি রাহিমাহুমাহ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মাহমুদ
১১	ইমাম মালিক রাহিমাহুমাহ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ
১২	ইমাম আহমদ ইবনু হাবিল রাহিমাহুমাহ	যোৰামেৰ নাজাত
১৩	হাসান আল-বাসিৰি রাহিমাহুমাহ	আব্দুল বারী
১৪	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুমাহ	আবুল হাসানাত

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য (টাকা)
০১	প্যারাডিগ্মিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৩৬
০২	পঢ়ো	ওমর আল জাবির	২২০
০৩	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৪	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩০০
০৫	সবুজ রাতের কোলাজ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৫০
০৬	খুশু-খুয়	ইমাম ইবনুল কাইয়িম	১২৫
০৭	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৩৫
০৮	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
০৯	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
১০	জীবন পথে সফল হতে	শাইখ আব্দুল কারিম বাকার	২৩২
১১	যে জীবন মরীচিকা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	১৭৫
১২	নবীজি	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৯০
১৩	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৭২
১৪	সেইসব দিনরাত্রি	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	২৭৫
১৫	মেঘ রোদুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
১৬	শিশুর মননে ঈমান	ড. আইশা হামদান	১৭৬
১৭	মেঘ কেটে যায়	ড. হুসায়ুদ্দিন হামিদ	২৬৮
১৮	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩১৫
১৯	সন্তান : সুপ্ত দিয়ে বোনা	আকরাম হোসাইন	১৮৫
২০	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়ুম আস-সুহাইবানী	১৪১
২১	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আয়ীয	৩২০
২২	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
২৩	আর্গুমেন্টস অব আরজু	আরিফুল ইসলাম	২৫০
২৪	সবর	ইমাম ইবনুল কাইয়িম	২৬০
২৫	ভালোবাসার রামাদান	ড. আয়িয আল-কারনী	৩০৮

আরিফ আজাদ। জন্মেছেন চট্টগ্রামে। বিশ্ববিদ্যালয়ে  
পড়াশোনা করার সময় থেকেই লেখালেখির  
হাতেখড়ি। ইসলামি সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে  
পছন্দ করেন। ২০১৭ সালের একুশে বইমেলায়  
'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা  
লাভ করেন। বিশ্বাসের কথাগুলোকে শব্দে রূপ  
দিতে তার জুড়ি নেই। ইসলামি ভাবধারাকে কলমের  
তুলিতে তুলে ধরতে লেখকের রয়েছে মুনশিয়ানা।  
২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের পাঠকন্দিত  
বই 'আরজ আলী সমীপে' এবং ২০১৯ সালে তুমুল  
জনপ্রিয় সাজিদ সিরিজের দ্বিতীয় বই  
'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২'। এছাড়াও সম্পাদনা  
করেছেন 'প্রত্যাবর্তন' আর 'মা, মা, মা এবং বাবা'-  
এর মতো জনপ্রিয় বইগুলো। ২০২০ সালের একুশে  
বইমেলায় লেখকের প্রকাশিত চতুর্থ মৌলিক বই  
'বেলা ফুরাবার আগে'।

জীবনের কতগুলো বসন্ত পার হয়ে গেছে, জ্ঞান হয়ে গেছে  
কতশত কাকড়াকা ভোরা আবছা সৃতির মতো, জীবন আন্তে  
আন্তে আচ্ছন্ন হয় ধূসরতায়া সময়ের সরল সংখ্যা কমে আসছে  
ধীরে ধীরো সব পাখি নীড়ে ফেরে সব নদী ফিরে যায় মোহনায়া তবু  
কিছু মানুষ, ভ্রান্তির মায়াজাল ভেদ করে, ফিরে আসতে চায় না।  
মোহ আর মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে তারা ছুটতে পারে না আদিগন্ত  
অনন্তের পথে।

তবু ফিরতে হবো বেলা ফুরাবার আগে, ঠিক ঠিক চিনে নিতে হবে  
পথা সঙ্ক্ষের ঘনঘোর আঁধারের অতলতায় ডুবে যাবার আগে,  
জীবন তরিটিকে ভেড়াতে হবে কুলো রাতেরও শেষ আছে।  
ক্লান্তিরও আছে অবসানা জীবনের জড়তার জোয়ার ছেড়ে, নতুন  
করে একবার, শুধু একবার জুলে উঠতে হবো নিজেকে  
আরেকবার ঝালিয়ে নিতে আজ তবে ডুব দেওয়া যাক...



ISBN



9 789843 445759